বিশ্ব ইতিহাস

শ্রীনিত্যনিরঞ্জন কবিরাজ

ওরিয়েন্ট লংম্যান্স

বিশ্ব ইতিহাস

শ্রীনিত্যনিরঞ্জন কবিরাজ
অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক,
বকুলতলা হাইস্কুল
নবদ্বীপ

[পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর জন্য যে নূতন পাঠক্রম প্রচারিত করিয়াছেন তদনুযায়ী এই পুস্তক রচিত হইল।]

ওরিয়েণ্ট লংম্যান্স্ লিমিটেড্
বোম্বাই • কলিকাতা • মাদ্রাজ • নয়াদিল্লী

ওরিয়েন্ট লংম্যান্‌স্ লিমিটেড্
রেজিস্টার্ড অফিস : ১৭ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-১৩
নিকল রোড, ব্যালার্ড এস্টেট্, বোম্বাই-১
৩৬-এ, মাউন্ট রোড, মাদ্রাজ-২
১।২৪, আসফ আলী রোড্, নয়াদিল্লী-১

প্রথম প্রকাশ, মে—১৯৬৫

দাম : টাকা ৪·৭৫

ছেপেছেন : শ্রীবাণেশ্বর মুখার্জী, কালিকা প্রেস প্রাইভেট লিঃ
২৫, ডি. এল. রায় স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

নিবেদন

১৯৬০ সাল হইতে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষায় **বিশ্ব ইতিহাস** হইতে ছাত্রছাত্রীগণ পঞ্চাশ নম্বরের প্রশ্নের উত্তর দিয়া আসিয়াছে ; কিন্তু ১৯৬৬ সাল হইতে পশ্চিমবংগ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃক রচিত নূতন পাঠক্রম অনুসারে তাহাদিগকে একশত নম্বরের প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে। তদনুসারে এই পুস্তকখানি প্রকাশিত হইল। দীর্ঘকাল ধরিয়া ইতিহাস অধ্যাপনার সুযোগ পাওয়ায় বিষয়বস্তু দুরূহ হইলেও ইহা ছাত্র-ছাত্রীগণের সহজবোধ্য করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। কতদূর কৃতকার্য হইলাম তাহা সুযোগ্য ইতিহাস শিক্ষকগণের বিচার-সাপেক্ষ। গ্রন্থখানির উন্নতিকল্পে তাঁহাদের পরামর্শ কৃতজ্ঞতা সহকারে গৃহীত হইবে। ইতি—

নবদ্বীপ
২০ মার্চ, ১৯৬৫

শ্রীনিত্যনিরঞ্জন কবিরাজ

বিশ্ব ইতিহাস

সূচীপত্র

ভূমিকা

ইতিহাসে প্রধানতঃ তিনটি যুগ—প্রাচীন, মধ্য ও বর্তমান। প্রাচীন যুগের সমাজ, রাজনীতি, সংস্কৃতি সব কিছুর মধ্যেই কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু প্রাচীন যুগের সমাজ, তার রাষ্ট্র, তার সংস্কৃতি চিরন্তন হয়ে ওঠে নাই। কালের বিবর্তনে প্রাচীন যুগের সমাজে ভাঙন দেখা দিল, ভেঙে পড়ল প্রাচীন যুগের রাষ্ট্র, বদলে গেল পুরানো যুগের সংস্কৃতি। এইভাবে পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠল নবতর আর এক সমাজ, আর এক রাষ্ট্র, আর এক সংস্কৃতি। সমাজের এই নবতর বিকাশকে বলা হয়ে থাকে মধ্যযুগ। কিন্তু মধ্যযুগও ইতিহাসে স্থায়ী হয় নাই। ক্রমে ক্রমে মধ্যযুগের সমাজের জায়গায় গড়ে উঠল নতুন আর এক সমাজ, মধ্যযুগের রাষ্ট্রের বদলে গড়ে উঠল নতুন এক রাষ্ট্র, মধ্যযুগের সংস্কৃতির বদলে নতুন এক সংস্কৃতি। এই নতুনের বার্তা বহন করে যে যুগের আবির্ভাব হল, তাকেই আমরা বলে থাকি বর্তমান যুগ।

ইতিহাসের তিনটি যুগ

এই বর্তমান যুগের সূত্রপাত তিনটি প্রধান ঘটনাকে কেন্দ্র করে। এই তিনটি প্রধান ঘটনা হল—

(১) রেনেসাঁস বা নবজাগৃতির আন্দোলন

(২) রিফর্মেশন বা ধর্মসংস্কার আন্দোলন

(৩) ভৌগোলিক আবিষ্কার

রেনেসাঁস (Renaissance)

রেনেসাঁস কথাটার মানে হল—নবজন্ম বা নবজাগৃতি। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে ইউরোপে এক ভাব-বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল। এই ভাব-বিপ্লবের মূল কথা ছিল—মানুষের নবজাগরণ।

রেনেসাঁসের সূত্রপাত

মধ্যযুগের সংকীর্ণ চিন্তাধারার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসাবে এই রেনেসাঁস আন্দোলনের সূত্রপাত। মধ্যযুগে সাময়িকভাবে ইউরোপে জ্ঞান-চর্চার একান্ত অবহেলা দেখা দিয়েছিল। জ্ঞান-চর্চার পক্ষে যা একান্ত অপরিহার্য তা হল মানুষের স্বাধীন চিন্তার অধিকার। কিন্তু সেই যুগে এই স্বাধীন

চিন্তার স্বল্পতম সুযোগটি পর্যন্ত ছিল না। সেই সময়ে শিক্ষাব্যবস্থা ছিল ধর্মযাজকদের দ্বারা কবলিত। তাঁদের শিক্ষাব্যবস্থায় যুক্তির বা স্বাধীন চিন্তার কোন স্থান ছিল না। যাজকদের অত্যাচারী শাসন, শাস্ত্রব্যাখ্যার নামে নিষ্ফল কথার কচকচি এবং কুসংস্কারকে ধর্মের আবরণে সমর্থন জ্ঞাপন—এই ছিল মধ্যযুগের শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য। যাজক ও সামন্তদের কড়া শাসানিতে এই সমাজে জীবনের গতিবেগ আড়ষ্ট হয়ে এসেছিল ; ফলে মানুষ প্রাণহীন মন্ত্রের জপ করে দিন কাটাত। মধ্যযুগের শেষের দিকে এই মৃতকল্প, জ্ঞানালোক-বর্জিত জীবনধারার বিরুদ্ধে আস্তে আস্তে আরম্ভ হল এক প্রতিবাদ।

এই নতুন জাগরণ, এই নতুন উষার আলো প্রথম দেখা গেল ইতালীর মহাকবি দান্তে ও ইংলণ্ডের কবি চ্যসারের কাব্যসাহিত্যে—তাঁরা মৃতকল্প জীবন-ধারার বদলে মানুষের সামনে প্রথম তুলে ধরলেন জ্ঞানের আলো, ইহজগতের সৌন্দর্যময় এক রূপ। ক্রমে ক্রমে চিন্তার স্বাধীনতা, ইহজগতের প্রতি মমত্ববোধ, নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধির জয়ধ্বনি—এই সবকে কেন্দ্র করে ইউরোপে উদ্ভূত হল এক অভিনব ভাব-বিপ্লব। এরই নাম রেনেসাঁস।

ইতালীর রেনেসাঁস আন্দোলন

ইতালী ছিল এই রেনেসাঁস আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল। ইতালীর অন্তর্গত ভেনিস, জেনোয়া প্রভৃতি অঞ্চলে কতকগুলি প্রজাতান্ত্রিক নগররাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল। ভূমধ্যসাগরের উপকূলস্থিত এই নগর-রাজ্যগুলির ঐশ্বর্যের মূলে ছিল তাদের বাণিজ্যের প্রাধান্য। এই নগররাষ্ট্রগুলি এই অঞ্চলে বাণিজ্যিক লেনদেনের যেমন কেন্দ্র ছিল, তেমনি বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে চিন্তার লেনদেনেরও কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠেছিল। এই সব রাষ্ট্রের কর্ণধার মেডিচিবংশীয় রাষ্ট্রনেতারা এই চিন্তার লেনদেনকে যথেষ্ট উৎসাহ দেওয়ায় এই অঞ্চলেই ভাব-বিপ্লবের প্রথম সূত্রপাত হয়েছিল। এ-ছাড়া কয়েকটি বৈজ্ঞানিক ও ভৌগোলিক আবিষ্কারও এই রেনেসাঁস আন্দোলনের অভ্যুদয়ে সাহায্য করেছিল।

চতুর্দশ শতাব্দীতে ইতালীর অধিবাসীরা স্পেনীয় মুরদের কাছ থেকে কাগজ তৈরি করতে শিখেছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে জার্মানীতে প্রথম মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হল। কাগজ ও মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার এই ভাব-

বিপ্লবের অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করে দিল। আগে যেখানে পণ্ডিত-ব্যক্তিরা হাতে-লেখা পাণ্ডুলিপির সাহায্যে নিজেদের বক্তব্য প্রচার করতেন, আজ সেখানে মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে পুস্তক মুদ্রিত করে তাঁরা হাজার হাজার পাঠকের সামনে তাঁদের চিন্তাধারা প্রচার করার সুযোগ পেলেন।

এ-ছাড়া ভৌগোলিক আবিষ্কারও মানুষের জ্ঞানের স্পৃহা উদ্দীপ্ত করল। কলম্বাসের আমেরিকা-আবিষ্কার শুধু মানুষের ভৌগোলিক জ্ঞানের পরিধিই বৃদ্ধি করল না, জগৎ সম্পর্কে নতুন এক ধারণা মানুষের মনে গ্রথিত করল। অনাবিষ্কৃতকে আবিষ্কার করা, অজানাকে জানার এক দুর্দম কামনা মানুষের মনকে জয় করে বসল।

রেনেসাঁস আন্দোলনের ফলে গ্রীক ও রোমান চিন্তার প্রতি ইওরোপের মানুষের নতুন করে কৌতূহল জাগ্রত হয়। প্রাচীন যুগে গ্রীসে ও রোমে মননশীলতা অত্যন্ত উচ্চশীর্ষে আরোহণ করেছিল। গ্রীসে সক্রেটিস, প্লেটো ও এ্যারিষ্টটল এবং রোমে ভার্জিল, সীজার ও কিকোরা—এঁদের চিন্তাধারা ছিল প্রাচীন ইওরোপের এক অমূল্য সম্পদ। এঁদের চিন্তায় যুক্তি, স্বাধীন চিন্তা ও মননশীলতা প্রাধান্য লাভ করেছিল। মধ্যযুগে যাজকদের দ্বারা শিক্ষাব্যবস্থা যখন কবলিত হয়, তখন যুক্তির স্থান দখল করল অন্ধ কুসংস্কার, স্বাধীন চিন্তার জায়গায় যাজকদের অন্ধতা, এবং মননশীলতার জায়গায় শাস্ত্রের অর্থহীন কচকচি। প্রাচীন যুগের বলিষ্ঠ চিন্তাধারা সাময়িক-ভাবে বিস্মৃতির অন্ধকারে ডুবে গেল। মধ্যযুগের শেষে যখন যাজককবলিত মধ্যযুগীয় চিন্তাধারার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সুর ধ্বনিত হল, তখন ইওরোপের বুদ্ধিজীবীরা আবার প্রাচীন সাহিত্যের যুক্তিবাদী চিন্তাধারার প্রতি নতুন করে আকৃষ্ট হলেন। তাঁরা প্রাচীন সাহিত্যের মর্মবস্তুকে পুনরাবিষ্কার করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। গ্রীক ভাষা ও গ্রীক সাহিত্য, ল্যাটিন ভাষা ও ল্যাটিন সাহিত্যের চর্চায় ইওরোপ নতুন করে মেতে উঠল।

ঠিক এই সময়ে কনস্তান্তিনোপলের সুলতান এই শহরে যে সকল গ্রীক পণ্ডিত বাস করতেন তাঁদের উপর উৎপীড়ন শুরু করেন। তাঁদের পাঠাগার, তাঁদের পাণ্ডুলিপি প্রভৃতি পুড়িয়ে দেওয়া হল। দলে দলে গ্রীক পণ্ডিতগণ নিকটবর্তী ইতালীতে এসে বাস করতে লাগলেন। এঁদের সাহায্যে ও উৎসাহে ক্রমে ইতালীতে গ্রীক সাহিত্য অধ্যয়নের জন্য অনেক পাঠচক্র তৈরী হল।

ক্রমে ক্রমে প্রাচীন সাহিত্যের ঐতিহ্য অনুসরণ করে একদল সাহিত্যিক ও শিল্পী নতুন ভাবোন্মাদনায় মেতে উঠলেন। এই কবি ও শিল্পীদের রচনার মূল প্রেরণা হল সাধারণ মানুষের জীবন। 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'—এই হল নবজাগৃতি আন্দোলনের প্রধান ধ্বনি। এঁরা মানুষের মধ্যে আবিষ্কার করলেন শক্তি, সম্পদ ও ঐশ্বর্য। পৃথিবীকে ভালবাসার অংগীকার তাঁরা গ্রহণ করলেন। অতিমানুষকে তাঁরা বিদায় দিয়ে মানুষকে প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন তাঁদের সাহিত্যে; পরকালের বদলে অগ্রাধিকার পেল ইহকাল, শাস্ত্রের অন্ধতার জায়গায় তাঁরা প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন যুক্তির তীক্ষ্ণতা, সন্ন্যাসের বদলে তাঁরা চাইলেন আনন্দ, ঈশ্বরের প্রতি দাসত্বের বদলে তাঁরা চাইলেন মানুষের নিজের উপর ও মানবজাতির উপর বিশ্বাস। তাঁদের সাহিত্যে মহিমান্বিত হয়ে উঠল যা কিছু সহজ, স্বাভাবিক ও মানবীয়।

এই চিন্তাধারায় সঞ্জীবিত হয়ে উঠল ইতালীতে পেত্রার্কের কাব্য-সাহিত্য, বোকাশিয়োর উপন্যাস; মেকিয়াভেলি রাজনীতিশাস্ত্রে এই বাস্তবানুগ মনোভাবের প্রবর্তন করলেন।

শিল্পেও এই মানবতাবাদী চিন্তাধারা প্রতিভাত হল। এযুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পী লিওনার্দো-দা ভিঞ্চি, মাইকেল এঞ্জেলো, র‍্যাফেল প্রভৃতির তুলিতে এই নতুন চিন্তাধারা পেল বলিষ্ঠ রূপ। লিওনার্দো-দা ভিঞ্চির আঁকা মোনালিসা ও লাষ্ট সাপার (Last Supper), মাইকেল এঞ্জেলোর 'কিউপিড', র‍্যাফেলের 'ম্যাডোনা' প্রভৃতি ছবিতে এই নতুন চিন্তার বলিষ্ঠ প্রতিফলন হয়েছিল এবং এই ছবিগুলি হয়ে রইল বিশ্বের বিশিষ্ট সম্পদ।

রেনেসাঁস আন্দোলনের বিস্তার

ক্রমে ইতালী থেকে এই নতুন চিন্তাধারা ইওরোপের অন্যান্য দেশেও পরিব্যাপ্ত হল।

এই চিন্তার প্রতিফলন দেখা গেল ফরাসী সাহিত্যে রাব্যেলা ও মন্‌টেনের লেখায়, স্পেনীয় সাহিত্যে সারভেন্টেজের লেখায় এবং ইংরেজী সাহিত্যে স্পেন্সার, সেক্সপীয়র ও মিলটনের লেখায়।

এইভাবে রেনেসাঁস আন্দোলনের প্রভাবে মানুষের চিন্তাজগৎ যেন নতুন এক শক্তি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করল। ইওরোপের মানসক্ষেত্রে রেনেসাঁস

নিয়ে এল এক অভূতপূর্ব আলোড়ন। এই আন্দোলনের আঘাতে মধ্যযুগের সামন্ততান্ত্রিক অচলায়তনের ভিত্তিভূমিতে চিড় ধরল। সামন্ততান্ত্রিক ক্ষুদ্রতা সম্পর্কে চেতনাবোধ ও জীবনের প্রতি মমত্ববোধ মানুষের সামনে নতুন এক আদর্শ তুলে ধরল। ব্যক্তির স্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতা ও মানবতার জয়ধ্বনি—এই তিনের মধ্যে দিয়ে এই আন্দোলন মানুষের জীবনে বন্ধনমুক্তির প্রথম আস্বাদন এনে দিল।

ধর্ম সংস্কার আন্দোলন
(Reformation Movement)

ষোড়শ শতকে ইওরোপে আরও একটি আন্দোলন দেখা দিয়েছিল। এর নাম ধর্মসংস্কার আন্দোলন বা রিফর্মেশন।

রোমান ক্যাথলিক চার্চে দুর্নীতি

মধ্যযুগে ইওরোপের প্রায় সমস্ত লোকই ছিল খ্রীষ্টধর্মে বিশ্বাসী। খ্রীষ্ট-ধর্মাবলম্বীরা সকলেই একটি চার্চের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এর নাম ছিল রোমান ক্যাথলিক চার্চ। এই রোমান ক্যাথলিক চার্চের প্রধানকে বলা হত "পোপ" (Pope)।

মধ্যযুগের সমাজে যে দুর্নীতি দেখা দিয়েছিল তার পুঞ্জীভূত প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় এই রোমান ক্যাথলিক চার্চের ভিতর। ধর্মযাজকেরা মুখে শপথ নিতেন যে তাঁরা যীশুখ্রীষ্টের মত উৎসর্গীকৃত জীবন যাপন করবেন, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তাঁরা গৃহীর মধ্যে যে অর্থলোভ, নীতিহীনতা এবং চরিত্রহীনতা দেখা যায়, তাকেও ছাড়িয়ে যেতেন। এই যুগের পোপেরা অত্যন্ত বিলাসী ছিলেন। চার্চের জন্য উৎসর্গীকৃত যে সব জমি থাকত তার উপস্বত্ব তাঁরা ভোগ করে রাজাদের অনুকরণে ভোগসুখের উপাসনা করতেন। তাঁদের অর্থলোভ চরিতার্থ করার জন্য তাঁরা শাস্ত্রের অপব্যাখ্যা করতেন; শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে তাঁরা নিরক্ষর কৃষকদের কাছ থেকে অর্থ আদায়ের ফন্দী আঁটতেন। উদাহরণ হিসাবে মুক্তিপত্র বিক্রয়ের ব্যবস্থাটির উল্লেখ করা যায়। পোপেরা এই ধারণা চালু করলেন যে, যারা পাপী তাদের পাপস্খালনের উপায় হল মুক্তিপত্র ক্রয়; অর্থাৎ চার্চকে যদি পাপী ব্যক্তিরা অর্থদান করে, তাহলে চার্চ তাদের পাপমুক্তির সার্টিফিকেট দেবে এবং এই সার্টিফিকেটের জোরে তারা পাপমুক্ত হয়ে স্বর্গে বাস করতে পারবে।

মুক্তিপত্র বিক্রয়ের মত নানা রকমের কুপ্রথা এই সময়ে ক্যাথলিক চার্চের নেতৃত্বে চালু হয়েছিল।

চার্চের পাণ্ডাদের অর্থলোভ, তাদের নীতিহীনতা, তাদের বিলাস-প্রিয়তা ক্রমশ চার্চের ভিতরে একদল বিবেকবান মানুষের চক্ষুঃশূল হয়ে উঠতে লাগল। চার্চের ভিতর থেকে এই কুপ্রথাগুলির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আরম্ভ হল।

ইংলণ্ডে জন উইক্লিফ (John Wycliffe) এবং বোহেমিয়ায় জন হাস্ (John Hus) সর্বপ্রথম এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন।

জার্মানীতে ধর্মসংস্কার আন্দোলন

ধর্মের নামে স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সব চেয়ে জোরের সঙ্গে ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল জার্মানীতে। মার্টিন লুথার নামে জনৈক ধর্মযাজক ছিলেন এই আন্দোলনের নেতা।

মার্টিন লুথার জার্মানীর এক কৃষক পরিবারে ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্যাক্সনীতে উইটেনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে শাস্ত্রতত্ত্ব বিষয়ে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত হন।

শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত হিসাবে তাঁর খ্যাতি শীঘ্রই চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এই শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত রোমান ক্যাথলিক চার্চের মধ্যে যে দুর্নীতি প্রবেশ করেছিল তার সমালোচনায় অগ্রণী হলেন। তাঁর এই সমালোচনা স্বভাবতই রোমান ক্যাথলিক চার্চের কর্ণধারদের মনঃপূত হল না।

ঠিক এই সময়ে পোপ দশম লিও জার্মানীতে মুক্তিপত্র বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে টেটজেল নামক এক ধর্মযাজককে পাঠান (১৫১৭ খ্রীঃ)। মার্টিন লুথার মুক্তি-পত্র বিক্রয়ের ব্যাপারটিকে ধর্মের নামে দুর্নীতির প্রশ্রয় বলে মনে করলেন। তিনি গরীব ও নিরক্ষর কৃষকদের এইভাবে ধর্মের নামে প্রবঞ্চনা করার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেন। ৯৫টি থিসিস্ নামে একটি দলিল তিনি উইটেনবার্গের গীর্জার দরজায় ঝুলিয়ে দিলেন। এই ৯৫টি থিসিসে মুক্তিপত্র বিক্রয়ের ব্যবস্থাটির তিনি নিন্দা করেন এবং তাঁর যুক্তি খণ্ডন করার জন্য প্রতিবাদীদের আহ্বান জানান।

এর পরে নিজের বক্তব্য বিশ্লেষণ করে লুথার কয়েকখানি পুস্তিকা রচনা করেন। তাঁর এই পুস্তিকাগুলির মধ্যে 'An Address to the Nobility of

the German Nation', 'On the Freedom of a Christian Man', 'On the Babylonian Captivity of the Church of God'—প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত পুস্তিকায় তিনি ঘোষণা করেন যে—রোমান ক্যাথলিক চার্চের কোন ঐশ্বরিক শক্তি নাই এবং ধর্মযাজকদের বিশেষ সুবিধা রহিত হওয়া প্রয়োজন। তিনি জার্মান সামন্ত-প্রভুদের বিদেশী পোপের হস্তক্ষেপ থেকে নিজের দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার আহ্বান জানান।

এই সমস্ত কাজকর্মের জন্য পোপ লুথারকে রোমান ক্যাথলিক চার্চ থেকে বহিষ্কার করে দেন। ১৫২১ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ার্মসের ধর্মসভায় পোপের অনুরোধে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট পঞ্চম চার্লস লুথারকে আইন বহির্ভূত বলে ঘোষণা করলেন। কিন্তু লুথার সর্বসমক্ষে পোপের বহিষ্কারপত্র আগুনে পুড়িয়ে দেন।

পোপের এই আদেশ অগ্রাহ্য করে লুথার জার্মান ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ করেন এবং এই গ্রন্থখানি বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ক্রমে লুথার প্রচারিত মতবাদ জনসাধারণের মনকে আকৃষ্ট করতে থাকে। জার্মানীর একদল সামন্তপ্রভু লুথারের সমর্থনে এগিয়ে আসেন। তাঁরা রোমান ক্যাথলিক চার্চের প্রচুর ধনসম্পত্তি আত্মসাৎ করার সুযোগ মিলবে বলেই এই আন্দোলনকে সমর্থন করেন। আবার কৃষকেরাও পোপের প্রবঞ্চনার নীতির বিরুদ্ধে লুথারের প্রতিবাদে আকৃষ্ট হন। তাঁরা দলে দলে সমবেত হয়ে রোমান ক্যথলিক চার্চের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করেন। ক্রমে ক্রমে গ্রামাঞ্চলে সামন্তপ্রভু ও রোমান ক্যাথলিক চার্চের বিরুদ্ধে সশস্ত্র কৃষকবিদ্রোহ আরম্ভ হয়ে যায়। লুথার সামন্তপ্রভুদের সমর্থন হারাবার ভয়ে কৃষক-বিদ্রোহের বিরুদ্ধে তীব্র মত জ্ঞাপন করেন এবং সামন্ত-প্রভুদের কৃষক-বিদ্রোহ দমনে সাহায্য করেন।

লুথারের মতবাদ জার্মাণ সামন্তপ্রভুদের একাংশের সক্রিয় সমর্থন পাওয়ায় দুর্বার হয়ে উঠল। লুথারের সমর্থক সামন্তপ্রভুরা একটি দল গঠন করলেন। লুথারবিরোধী সামন্তপ্রভুরাও প্রস্তুত হলেন। ফলে লুথারের মতকে কেন্দ্র করে জার্মানীতে এক গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল।

শেষ পর্যন্ত লুথারের মতকে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাটকে স্বীকৃতি দান করতে হয়েছিল। ১৫৫৫ খ্রীঃ অ্যাসবার্গের সন্ধিতে স্বীকার করা হল—রাজার ধর্ম হবে প্রজার ধর্ম। অর্থাৎ যে সামন্তরাজ্যে রাজার ধর্ম

ক্যাথলিক, সেখানে প্রজার ধর্মও হবে ক্যাথলিক। আবার যেখানে রাজার ধর্ম হবে লুথারপন্থী সেখানে প্রজার ধর্মও হবে লুথারপন্থী।

ইওরোপে ধর্মসংস্কার আন্দোলনের বিস্তার

জার্মানী ছাড়া ইউরোপের অন্যান্য দেশেও এই ধর্মসংস্কার—আন্দোলন ব্যাপ্তিলাভ করল। বিশেষ করে সুইজারল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, সুইডেন, স্কটল্যাণ্ড ও ইংলণ্ডে এই আন্দোলন প্রভাব বিস্তার করল।

সুইজারল্যাণ্ডে এই ধর্মসংস্কার আন্দোলন প্রবর্তন করলেন জুইংলি (Zwingli), স্কটল্যাণ্ডে জন নক্স্ (John Knox) এবং ফ্রান্সে জন ক্যালভিন্ (John Calvin)। এঁদের মধ্যে ক্যালভিনের প্রভাব ছিল সব চেয়ে বেশী।

জন ক্যালভিন ছিলেন ফ্রান্সের অধিবাসী। ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে মধ্যবিত্ত পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। তিনি লুথারের মতই রোমান ক্যাথলিক চার্চের দুর্নীতি ও প্রবঞ্চনার বিরুদ্ধে জনমত জাগ্রত করেন। ১৫৩৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ফ্রান্স ছেড়ে জেনেভায় যান এবং এই স্থানটিকেই তিনি কর্মক্ষেত্র হিসাবে বেছে নেন। জেনেভাতে তিনি সামন্ততন্ত্রের ও রোমান ক্যাথলিক চার্চের বিরুদ্ধে যুক্ত বিদ্রোহে যোগ দেন এবং বিদ্রোহের সাফল্যের পরে জেনেভাতে তিনি একটি ধর্মীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন।

মার্টিন লুথার ও জন ক্যালভিনের নেতৃত্বে পরিচালিত ধর্মসংস্কার-আন্দোলন ইওরোপে ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় জগতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এনেছিল। ধর্মীয় জগতে যে দুর্নীতি দেখা দিয়েছিল তার মূলোচ্ছেদে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল এই আন্দোলন। পোপের স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জনসাধারণকে জমায়েত করে এই আন্দোলন ইওরোপে গণতান্ত্রিক চেতনা উদ্বুদ্ধ করেছিল। বিদেশী পোপের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে লোক জমায়েত করে এই আন্দোলন প্রত্যেক দেশে স্বাধীনতা-কামনাকেও পরিপুষ্ট করেছিল।

সামন্ততান্ত্রিক অচলায়তনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে রেনেসাঁস ও রিফর্মেশন ছিল সহযোগী শক্তি, একটি অপরটির পরিপূরক।

রেনেসাঁস ও রিফর্মেশন ছাড়া এই নতুন যুগচেতনা আরও একটি ঘটনার মধ্যে দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল। সেটি হল ভৌগোলিক আবিষ্কার।

ভৌগোলিক আবিষ্কার
[Geographical Discoveries]

পৃথিবীটা যে এত বড় এই ধারণা এক সময়ে মানুষের একেবারেই ছিল না। মধ্যযুগে অর্থাৎ পঞ্চদশ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের লোকেরা পৃথিবী বলতে জানত শুধু ইওরোপ, ভূমধ্যসাগরের নিকটবর্তী এশিয়া ও আফ্রিকার অঞ্চলগুলি। এ ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য বিরাট বিরাট অংশ—যেমন দক্ষিণ ও পূর্ব ভারত, চীন, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, আফ্রিকার মধ্য ও দক্ষিণ ভাগ এবং আমেরিকা আর অস্ট্রেলিয়া—এই সমস্তই ছিল তাদের কাছে একেবারেই অজ্ঞাত। পৃথিবীটা যে এত বিরাট, পৃথিবীতে যে এতগুলি মহাদেশ, এতগুলি দেশ, এতগুলি জাতি, এত রকমের বিভিন্ন ভাষাভাষী লোক আছে—তা তাদের ধারণার মধ্যেই ছিল না।

মধ্যযুগে পৃথিবী সম্পর্কে ধারণা

ভৌগোলিক আবিষ্কারের কারণ
[Causes of Geographical Discoveries]

ভূমধ্যসাগরের যে অঞ্চলগুলি ইওরোপের লোকদের কাছে পরিচিত ছিল, শুধু সেই অঞ্চলগুলির সঙ্গে ইওরোপের লেন-দেন, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি চলত। এই সময়ে ভূমধ্যসাগরের কোল ঘেঁষে মার্শাই, জেনোয়া, ভেনিস, কনস্তান্তিনোপোল, আলেকজান্দ্রিয়া প্রভৃতি কতকগুলি বাণিজ্যকেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। এই বাণিজ্যকেন্দ্রগুলি ভারত থেকে প্রচুর পণ্যদ্রব্য আমদানি করত। ভারত থেকে আমদানি করা কতকগুলি দ্রব্য—যেমন সিল্ক, মসলিন, রং, হাতীর দাঁতের জিনিস, হীরের তৈরী জিনিস প্রভৃতি ইওরোপের সৌখিন লোকদের কাছে অতি প্রিয় হয়ে উঠেছিল। তাছাড়া ভারতের মশলা না থাকলে ইওরোপের সৌখিন লোকদের ভোজ-সভাও তেমন জমত না।

ভারতের পণ্যদ্রব্যের যদিও এত চাহিদা, কিন্তু ভারতের পণ্য সংগ্রহ করা খুব শক্ত কাজ ছিল। ভূমধ্যসাগরের মধ্যস্থলে অবস্থিত ভেনিস ভারতজাত পণ্যদ্রব্যের আমদানি একচেটে করে ফেলেছিল। ভারতের বাণিজ্য ভেনিসের একচেটে সম্পত্তি হয়ে ওঠায় সে খুব চড়া হারে এই সমস্ত পণ্য বিক্রি করত।

ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যের ব্যাপারে ভেনিসের এই একাধিপত্য ক্রমশ পশ্চিম ইওরোপের অন্যান্য দেশগুলির ঈর্ষার কারণ হয়ে দাঁড়াল। কি করে সস্তায় ভারতের পণ্য ইওরোপের বাজারে এনে তোলা যায়—এই নিয়ে কয়েকটি দেশ, যেমন পর্তুগাল, স্পেন, হল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও ইংলণ্ড চিন্তা করতে আরম্ভ করল। তারা ভাবল—ভূমধ্যসাগরের যে পথ দিয়ে ভেনিস পণ্য আমদানি করে, সেই পথ ছাড়া অন্য পথ দিয়ে মাল আনতে পারলে ভেনিসের আধিপত্য ভাঙা যাবে। এই রকমের নিতান্ত বৈষয়িক কারণ থেকেই ইওরোপের বণিক ও নাবিকেরা ভারতে যাবার নতুন পথের সন্ধানে বেড়িয়ে পড়েছিল।

অর্থনৈতিক কারণ

তাছাড়া, এই সময়ে মধ্যপ্রাচ্যে তুরস্কের আধিপত্য বিস্তারের ফলে ভূমধ্যসাগরের পথে মাল চলাচল আগের মত নিরাপদ রইল না। বিশেষ করে ভারতজাত পণ্য আমদানি অনিশ্চিত হয়ে উঠল। পশ্চিমের বণিকেরা কাজেকাজেই অন্যপথে ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যসম্পর্ক স্থাপন করার তাগিদ আরও বেশী করে অনুভব করতে লাগল।

ইওরোপের বণিক ও নাবিকেরা যখন নতুন পথে ভারতে পৌঁছবার জন্য আগ্রহশীল, ঠিক সেই সময়েই কয়েকটি বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার তাঁদের কাজের বিশেষ সহায়ক হল। এই সময়ে আবিষ্কার হল—দিক্-নির্ণয় যন্ত্র (Mariners' Compass)। এই যন্ত্রের আবিষ্কারের ফলে নাবিকদের পক্ষে দূরবর্তী দেশেও সমুদ্রপথে পাড়ি দেওয়া সম্ভব হয়ে উঠেছিল। তারপরে টেলিস্কোপ আবিষ্কার হওয়ার পরে আকাশ ও নক্ষত্র সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানলাভ সম্ভব হল। নৌ-বিদ্যার উন্নতির ফলে নাবিকদের ব্যবহারোপযোগী চার্ট, ম্যাপ প্রভৃতির-আবিষ্কার হতে থাকল। নাবিকদের পক্ষে এখন থেকে অজানা পথে দূরদেশে যাত্রার কাজটা সহজতর হয়ে উঠল।

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার

আরও মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই সময়ে মানুষের ভৌগোলিক জ্ঞানও সমধিক বিস্তারলাভ করেছিল। এই সময়ে মার্কো পোলো নামে একজন ইতালী দেশীয় ভূপর্যটক চীনদেশে গমন করেন এবং তিনি তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করে যান। কলম্বাস এই ভ্রমণবৃত্তান্ত পড়ে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন বলে জানা যায়।

মার্কো পোলোর ভ্রমণবৃত্তান্ত

এইভাবে সবদিক থেকে যখন ভৌগোলিক আবিষ্কারের অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, ঠিক সেই সময়ে প্রয়োজন দেখা দিল একদল সাহসী নাবিকের। রেনেসাঁসের কল্যাণে অজানাকে জানার আগ্রহ ইতালীবাসীদের মনকে গভীরভাবে নাড়া দিল। একদল দুঃসাহসিক নাবিক এই কাজে অগ্রণী হলেন। এঁদেরই পথপ্রদর্শক ছিলেন কলম্বাস ও ভাস্কো-ডা-গামা।

নাবিকদের দুঃসাহসিক অভিযান

ভৌগোলিক আবিষ্কারের কাহিনী
[The Story of Geographical Discoveries]

আতলান্তিক মহাসাগরের কোলে অবস্থিত পর্তুগাল আর স্পেন ; এই দুটি দেশই সর্বপ্রথম সমুদ্রপথের অভিযাত্রী হয়ে বেড়িয়ে পড়ল।

পর্তুগাল : পর্তুগালের **প্রিন্স হেনরী** ছিলেন নাবিকদের একজন বড় উৎসাহদাতা। তিনি নাবিকদের পাঠালেন পশ্চিম আফ্রিকায়—রত্নরাজির সন্ধানে। নাবিকেরা সেখান থেকে নিয়ে এল হাতীর দাঁত, স্বর্ণচূর্ণ, আর নিগ্রো ক্রীতদাস।

পর্তুগীজদের দ্বারা ভারতে যাওয়ার নতুন পথের আবিষ্কার

ক্রমশ ধনরত্নের নেশা লাগল পর্তুগালের চোখে। তাই আফ্রিকায় অন্বেষণের কাজ বন্ধ হল না। ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে **বার্থলোমিউ দিয়াজ** নামে জনৈক নাবিক আফ্রিকার দক্ষিণ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছলেন। দিয়াজ যে অন্তরীপ (Cape)-এ গিয়ে পৌঁছলেন তার নাম দিলেন ঝড়ের অন্তরীপ (Cape of Storms)। কিন্তু তিনি যখন পর্তুগালে ফিরে এলেন, তখন পর্তুগালের রাজা বললেন নামটা ভুল হয়েছে। তিনি এর নাম দিলেন—

বার্থ-লোমিউ দিয়াজ


ভাস্কো-ডা-গামা

উত্তমাশা অন্তরীপ(Cape of Good Hope)। ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ভাস্কো-ডা-গামা দিয়াজের কাজের অনুগামী হলেন। তিনি আরও দূরতর স্থানে পৌঁছতে সক্ষম হলেন। এখন আফ্রিকায় নাটাল বলে যে অঞ্চল আছে সেটি আবিষ্কৃত হল। তারপর ভাস্কো-ডা-গামা আরও অগ্রসর হয়ে ভারতের পশ্চিম উপকূলে এসে অবতরণ করলেন। যেখানে তিনি অবতরণ করলেন সেই জায়গাটার নাম কালিকট।

অবশেষে ভারতে যাবার নতুন পথের সন্ধান মিলল। পর্তুগীজরাই এই গৌরব অর্জন করলেন। তাঁরা আফ্রিকা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া আর ভারতবর্ষের রত্নরাজি জাহাজে ভরতি করে ইওরোপে চালান দিতে লাগলেন।

স্পেন : পর্তুগালের পরেই শুরু হল স্পেনের পালা। স্পেন পশ্চিম দিকে সমুদ্রযাত্রা করে আর একটি স্বতন্ত্র পথে ভারতে যাবার জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠল। এই কাজে অগ্রণী হলেন **ক্রিস্টোফার কলম্বাস**। কলম্বাস ছিলেন জেনোয়ার অধিবাসী। তাঁর ধারণা ছিল ভারতে ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যাওয়ার জন্য একটা সোজা পথ (পর্তুগীজদের মত আফ্রিকা প্রদক্ষিণ করে ঘোরা পথ ছাড়া) আবিষ্কার করা সম্ভব। তিনি ইওরোপের এক দেশ থেকে আর এক দেশে গিয়ে রাজাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু কেউই তাঁর কথায় গুরুত্ব দিলেন না। অবশেষে স্পেনের রানী **ইসাবেলা** তাঁর কথাবার্তা শুনে কলম্বাসকে সাহায্য করতে রাজী হলেন। ১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দে কলম্বাস সমুদ্রযাত্রায় বেরিয়ে পড়লেন। কলম্বাস অনেক পথ পার হয়ে অবশেষে একটা দ্বীপে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি ভাবলেন তাঁর কল্পিত-পথে তিনি ভারতে এসে পৌঁছেছেন। কিন্তু ভারতে না এসে তিনি অন্য এক দেশে এসে হাজির হলেন। কলম্বাস



কলম্বাস

আমেরিকা আবিষ্কার

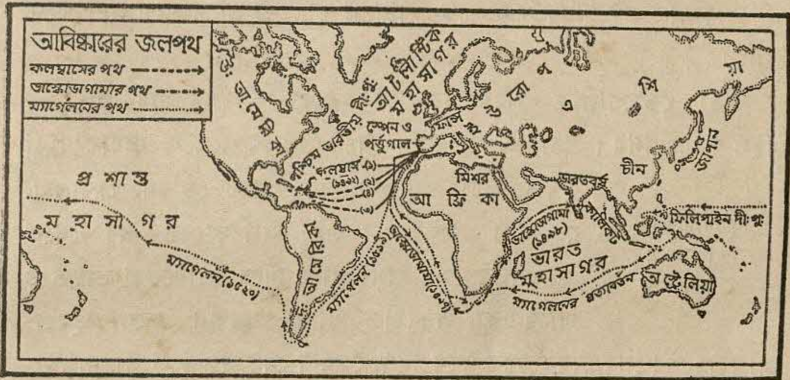
যে অঞ্চলটি আবিষ্কার করলেন সেটি হল বর্তমান আমেরিকা মহাদেশের দক্ষিণ ভাগ।

আমেরিগো ভেসপুচি

কলম্বাসের অনুবর্তী হলেন **আমেরিগো ভেসপুচি**। তিনি মধ্য আমেরিকা আবিষ্কার করলেন এবং তাঁর নাম থেকেই দেশটার নাম হয়েছে আমেরিকা।

ম্যাগেলন

১৫১৯-২১ খ্রীষ্টাব্দে **ম্যাগেলন** নামে আর একজন নাবিক প্রশান্ত মহাসাগর পার হয়ে পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে গিয়ে পৌঁছলেন। পৃথিবী যে গোল এই ধারণাটি পৃথিবীর মানুষ জানতে পারল ম্যাগেলনের সমুদ্রযাত্রা থেকে।



আবিষ্কারের জলপথ

এইভাবে পর্তুগাল ভারতে যাবার ঘোরা পথ আবিষ্কার করল; আর স্পেন সোজা পথ আবিষ্কার করতে গিয়ে আবিষ্কার করল নতুন এক মহাদেশ —আমেরিকা।

বৈষয়িক দিক থেকেও স্পেনের লাভ কম হল না। আমেরিকাতে সোনা, রূপা ও অন্যান্য মূল্যবান ধাতুজ সম্পদের প্রাচুর্য দেখে স্পেন আমেরিকায় নতুন আবিষ্কৃত দেশগুলিতে তার উপনিবেশ স্থাপন করল। আমেরিকার ধনে স্পেন ধনী হয়ে উঠল।

এক দেশের ধনে অন্য দেশের ধনী হওয়ার পথটা পর্তুগাল ও স্পেনই প্রথম দেখাল।

ইংলণ্ড ও ফ্রান্স: ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সও ভৌগোলিক আবিষ্কারের কাজে অগ্রসর হল। ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের ব্রিস্টল শহরের বণিকেরা এই কাজে উৎসাহী হলেন। তাঁদের উদ্যোগে দুজন ভেনিসীয় নাবিক—জন ও সেবেস্টিয়ান ক্যাবট—উত্তর আমেরিকা আবিষ্কার করেন। ফ্রান্স আবিষ্কার করল কানাডা।

জন ও ক্যাবট

ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলাফল
[Effects of Geographical Discoveries]

ভৌগোলিক আবিষ্কার পৃথিবীর অত্যাশ্চর্য ঘটনাবলীর অন্যতম। এই আবিষ্কারের ফলে বিশ্ববাসীর জীবনে কয়েকটি যুগান্তকারী পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। এই পরিবর্তনগুলিকে মোটামুটি কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

(১) ভৌগোলিক আবিষ্কারের পূর্বে ইওরোপীয় বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্র ছিল ভূমধ্যসাগর। তাই এই যুগে ইওরোপের বাণিজ্যক্ষেত্রে প্রধান ছিল ভূমধ্যসাগরীয় রাষ্ট্রগুলি, বিশেষ করে ভেনিস, ফ্লোরেন্স, জেনোয়া প্রভৃতি। এই আবিষ্কারের পর থেকে আতলান্তিক মহাসাগর পাড়ি দিয়ে নাবিকেরা ভারত ও আমেরিকা যাতায়াত আরম্ভ করল। ফলে, ভূমধ্য-সাগরীয় অঞ্চলের যেমন গুরুত্ব কমে গেল, তেমনি সেই অনুপাতে আতলান্তিক মহাসাগরের কোল ঘেঁষে আতলান্তিক বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে কয়েকটি নতুন বাণিজ্যিক রাষ্ট্র প্রাধান্য লাভ করল। এই রাষ্ট্রগুলি হল—পর্তুগাল, স্পেন, হল্যাণ্ড, ফ্রান্স, ইংলণ্ড প্রভৃতি। জেনোয়া, ভেনিস, ফ্লোরেন্স প্রভৃতি ইতালীয় বাণিজ্যিক রাষ্ট্রের পাশাপাশি পর্তুগাল, স্পেন, হল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের আবির্ভাব আধুনিক যুগের অন্যতম প্রধান ঘটনা এবং তা সম্ভব হল এই ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলে।

ভূমধ্যসাগরীয় বাণিজ্যের ক্রম-অবনতি

আতলান্তিক শক্তি-গুলির আবির্ভাব

(২) শুধু যে ইতালীয় বাণিজ্যিক রাষ্ট্রের বদলে আতলান্তিক সাগরীয় অঞ্চলে নতুন নতুন বাণিজ্যিক রাষ্ট্রের আবির্ভাব হল তা নয়। এই নতুন রাষ্ট্রগুলির রীতিনীতি, কাজ-কারবার, বাণিজ্যের কায়দা সবকিছুই ছিল পুরানো রাষ্ট্রগুলি থেকে আলাদা। ভূমধ্যসাগরীয় রাষ্ট্রগুলি এশিয়া ও

আফ্রিকা থেকে মাল লেনদেন করত—এই পর্যন্ত। তারা এশিয়ায় বা আফ্রিকায় উপস্থিত হয়ে এই সব অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন বা সাম্রাজ্য বিস্তার করে নাই। কিন্তু পর্তুগাল, স্পেন, হল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও ইংলণ্ড—এই নতুন বাণিজ্যিক রাষ্ট্রগুলি নতুন নতুন দেশ আবিষ্কার করে সেখানে উপনিবেশ স্থাপন করল এবং সাম্রাজ্য বিস্তারে মন দিল—যেমন, পর্তুগাল ভারতে, স্পেন আমেরিকায়, হল্যাণ্ড ইন্দোনেশিয়ায় ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য গঠন করল। স্পেন আমেরিকায় সোনার খনির সন্ধান পেল; আমেরিকার মাটিতে তামাক, কফি প্রভৃতির চাষ আরম্ভ হল; সস্তায় বেশী লাভ করার উদ্দেশ্যে স্পেন এই সব ক্ষেতে রেড ইণ্ডিয়ানদের ধরে এনে চাষ করাতে আরম্ভ করল। ক্রমশ আফ্রিকা থেকেও তারা দাস আমদানি করল। ক্রমে ক্রমে ইওরোপের বণিকেরা মুনাফার লোভে দাস-ব্যবসা স্বরু করে দিল। এইভাবে ইউরোপের বণিকেরা ভৌগোলিক আবিষ্কারের ঘটনাটিকে নিজেদের মুনাফাশিকারের কাজে লাগাল।

উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা

দাস-ব্যবসা

(৩) ক্রমে ক্রমে বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হল। জাহাজ-নির্মাণ-বিদ্যা, কম্পাস, চার্ট, মানচিত্র নির্মাণ প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে একদল বৈজ্ঞানিকের আবির্ভাব হল। বিজ্ঞান যে মানুষের অর্থ ও সমৃদ্ধি বাড়াবার কাজে ব্যবহৃত হতে পারে—এই ধারণা ক্রমশ ব্যাপ্তি লাভ করল।

বৈজ্ঞানিক জ্ঞানবৃদ্ধি

(৪) এই আবিষ্কারের ফলে মানুষের ভৌগোলিক জ্ঞানও বৃদ্ধি পেল। পৃথিবী সম্পর্কে পুরানো দিনের যে অবৈজ্ঞানিক ধারণা ছিল তা বিদায় নিল। অজানাকে জানবার নেশা মানুষের সামনে জ্ঞানের নতুন নতুন দিগন্ত উন্মুক্ত করে দিল। ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলে শুধু পৃথিবীর সীমানাই বৃদ্ধি পায় নি, মানুষের জ্ঞানের সীমাও বৃদ্ধি পেয়েছিল। এইখানেই ভৌগোলিক আবিষ্কারের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী।

জ্ঞানের পরিধি-বৃদ্ধি

উপনিবেশ বিস্তার ও ঔপনিবেশিক দ্বন্দ্ব
[Colonial Expansion and Colonial Rivalry]

কিভাবে স্পেন ও পর্তুগাল ভৌগোলিক আবিষ্কারে অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিল উপরে মোটামুটি তা আলোচনা করা হয়েছে।

স্পেন ঃ স্পেন দক্ষিণ আমেরিকায় ও মেক্সিকোতে এক বিশাল ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য গড়ে তুলল। এই সাম্রাজ্য থেকে স্পেনে আসত প্রচুর মাল-পত্র, সোনা-রূপা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র। আমেরিকার ধনে স্পেন ধনী হয়ে উঠল। ষোড়শ শতাব্দীতে স্পেন ইওরোপে যে আধিপত্য বিস্তার করেছিল তার মূলে ছিল আমেরিকা থেকে সংগৃহীত এই বিপুল অর্থসম্পদ।

পর্তুগাল ঃ পর্তুগাল দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিলে ও ভারত মহা-সাগরীয় অঞ্চলে নিজ সাম্রাজ্য গঠন করল। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে ভারতে পর্তুগীজেরাই সর্বপ্রথম উপনিবেশ স্থাপন করেছিল।

ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে হল্যাণ্ডের আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা

হল্যাণ্ড ঃ পর্তুগাল আর স্পেনের এই ধনপ্রাচুর্য দেখে হিংসায় জ্বলে উঠল ইওরোপের আর দুটি দেশ—হল্যাণ্ড আর ইংলণ্ড। সমুদ্রের কূলে অবস্থিত থাকায় এই দুটি দেশেরই মনে হল যে সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে তারাও নতুন নতুন উপনিবেশ স্থাপন করতে পারে—যেখানে থেকে আসবে প্রচুর সোনাদানা, রত্নরাজি।

এই সময়ে স্পেনের দাপট ছিল খুব বেশী। ইওরোপেও স্পেন আধিপত্য করত। হল্যাণ্ড স্পেনের এই আধিপত্য পছন্দ করত না। ওলন্দাজ নাবিকেরা স্পেনের সামুদ্রিক আধিপত্য ধ্বংস করতে বদ্ধপরিকর হল।

ওলন্দাজ নাবিকেরা সপ্তদশ শতাব্দীতে স্পেন ও পর্তুগালের অগ্রগতি কিছুটা বন্ধ করতে পেরেছিল। তারা সিংহল, জাভা, সুমাত্রা ও মসলা দ্বীপ থেকে পর্তুগালকে বিতাড়িত করল। ওলন্দাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর উদ্যোগে ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে হল্যাণ্ডের এক প্রতিপত্তিশালী ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য গড়ে উঠল। ক্রমে তারা বাণিজ্যের নেশায় ভারতবর্ষে ও ভারত মহাসাগর অতিক্রম করে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত যাতায়াত আরম্ভ করল।

ইংলণ্ড ঃ এই সময়ে ইংলণ্ডের মনেও স্পেনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জমে উঠেছিল। তার কারণ সমুদ্রের উপর স্পেনের আধিপত্য থাকায় ইংলণ্ড নিজ কর্তৃত্ব স্থাপন করতে পারছিল না। ইংলণ্ডের অগ্রগতির পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল স্পেন।

কাজেই হল্যাণ্ডের মত ইংলণ্ডও স্পেনের শত্রু হয়ে উঠল। এই সময়

ইংলণ্ডের রাণী ছিলেন **এলিজাবেথ**। তিনি সমুদ্রবক্ষে ইংলণ্ডের প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়াবার জন্য অধীর হয়ে উঠলেন। তাঁর আশীর্বাদ বহন করে কয়েকজন দুঃসাহসী ব্যক্তি ইংলণ্ডের উপনিবেশ স্থাপনে উদ্যোগী হলেন। এঁদের মধ্যে **ড্রেক, হকিন্স, র‍্যালে** প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ইংলণ্ডের সমুদ্রপথে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা

ড্রেক জাহাজে করে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে সক্ষম হলেন। এলিজাবেথের প্ররোচনায় ড্রেক, হকিন্স প্রভৃতি ধনসম্ভারে সজ্জিত স্পেনের জাহাজের উপর হামলা শুরু করলেন। স্পেন ইংলণ্ডের নাবিকদের এই আচরণের বিরুদ্ধে এলিজাবেথের কাছে বার বার অভিযোগ জানিয়েও কোন ফল পেল না। কাজেই স্পেন শেষ পর্যন্ত ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। এই যুদ্ধের নাম **আর্মাডার** যুদ্ধ। আর্মাডা ছিল স্পেনের এক বিশাল রণতরী বাহিনীর নাম। এই আর্মাডা ছিল এত বড়, আর এত শক্তিশালী যে একে 'অজেয় আর্মাডা' বলে অভিহিত করা হত। আর্মাডার যুদ্ধে স্পেন হেরে যায়। এর পর থেকে সমুদ্রের উপরে ইংলণ্ডের আধিপত্য ক্রমশ বিস্তৃত হতে থাকে।

ইংলণ্ড ও স্পেনের মধ্যে নৌ-যুদ্ধ—আর্মাডা

এই সময় থেকে ইংলণ্ড সমুদ্র-পথ বেয়ে ধনের সন্ধানে আমেরিকা, ভারত ও পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে আসা-যাওয়া আরম্ভ করল।

১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে, প্রাচ্যখণ্ডের সঙ্গে ব্যবসা করার জন্য ইংলণ্ডে 'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী' নামে একটি বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান গঠিত হল। রাণী এলিজাবেথের অনুমতি নিয়ে এই কোম্পানীটি প্রাচ্যখণ্ডে বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার লাভ করল। ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম ভারতের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত সুরাটে ইংলণ্ড কুঠি স্থাপন করল ; তারপরে মাদ্রাজের ফোর্ট সেণ্ট জর্জে এবং আরও পরে বম্বেতে কুঠী স্থাপিত হল।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির জন্ম

ফ্রান্স ঃ ইংলণ্ডের সাফল্য দেখে ঈর্ষান্বিত হল ইওরোপের আর একটি দেশ—ফ্রান্স। ফ্রান্সও বাণিজ্যসম্পর্ক স্থাপন করতে চাইল এশিয়ার সঙ্গে। এই অঞ্চলে বাণিজ্য করার উদ্দেশ্যে ফ্রান্সও গড়ে তুলল 'ফরাসী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী' ; ক্রমে ভারতে, ইন্দোচীনে ও উত্তর আমেরিকায় ফরাসীরা তাদের শক্ত ঘাঁটি গড়ে তুলতে সচেষ্ট হল।

এইভাবে ধনদৌলতের লোভে প্রাচ্যখণ্ডে ও আমেরিকায় একে একে

পর্তুগাল, হল্যাণ্ড, ইংলণ্ড এবং ফ্রান্স এসে হাজির হল। একই সঙ্গে ইওরোপের চারটি প্রধান দেশ উপনিবেশ বিস্তারে অগ্রণী হওয়ার ফলে তাদের মধ্যে আরম্ভ হল তীব্র প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতায় শেষ পর্যন্ত পর্তুগাল পেরে উঠল না। ভারতে গোয়া, দমন, দিউ—এই তিনটি মাত্র অঞ্চলের ভিতরে পর্তুগালের প্রভাব সীমাবদ্ধ হল।

ইওরোপীয় শক্তিগুলির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা

সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ

হল্যাণ্ডও প্রতিযোগিতায় ইংলণ্ডের সঙ্গে পেরে না ওঠায় পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে, বিশেষ করে ইন্দোনেশিয়ায় আধিপত্য বিস্তারে মন দিল।

ভারত ও আমেরিকা নিয়ে প্রতিযোগিতা এখন সীমাবদ্ধ হল ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে। এই প্রতিযোগিতা থেকে শেষ পর্যন্ত ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে একটি বড় রকমের যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছিল। এইটি সপ্তবর্ষব্যাপি যুদ্ধ বলে বিখ্যাত।

ইংলণ্ডের সেনাপতি উল্‌ফ কুইবেক দখল করার পর থেকে কানাডার উপর ফ্রান্সের প্রভুত্ব বিলুপ্ত হল। ভারতেও ফ্রান্স ইংলণ্ডের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হল। পলাশীর যুদ্ধে ক্লাইভের জয়লাভ ও বন্দীবাসের যুদ্ধে ইংরেজদের হাতে ফরাসীদের পরাজয় ভারতে ফরাসী আধিপত্য বিস্তারের সকল স্বপ্ন ধূলিসাৎ করে দিল। শেষ পর্যন্ত ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের ঔপনিবেশিক দ্বন্দ্বের মীমাংসা হল ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দের প্যারিসের সন্ধিতে।

প্যারিসের সন্ধির মূল শর্তগুলি ছিল নিম্নরূপ :

প্যারিসের সন্ধি

(১) ফ্রান্স ইংলণ্ডকে কানাডা ছেড়ে দিতে বাধ্য হল। তাছাড়া উত্তর আমেরিকায় ফ্রান্সকে ইংলণ্ডের হাতে আরও কয়েকটি জায়গা ছেড়ে দিতে হয়েছিল। এককথায় বলা চলে ফ্রান্সকে আমেরিকার সমগ্র ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য ইংলণ্ডের হাতে তুলে দিতে হয়েছিল।

(২) ভারতবর্ষেও ইংলণ্ডের কাছে ফ্রান্স পরাজয় স্বীকার করল। এই সময় থেকে ভারতে ফ্রান্সের রাজনৈতিক প্রভুত্ব স্থাপনের অধ্যায়ে ছেদ পড়ল।

আমেরিকা ও ভারতে ঔপনিবেশিক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে এই যুদ্ধ একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল ; ফ্রান্স ঔপনিবেশিক প্রতিযোগিতায় ইংলণ্ডের কাছে চূড়ান্তভাবে পরাভব স্বীকার করতে বাধ্য হল এবং ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র হিসাবে এখন ইংলণ্ড শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করল।

নৌশক্তিতে ইংলণ্ড অপ্রতিদ্বন্দ্বী

প্রথম অধ্যায়

[১]

ইওরোপের রাজনৈতিক অবস্থা (১৭৪০-৬৩)

এই যুগে ইওরোপের রাজনীতিতে যে কয়েকটি দেশ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছিল তারা হল : ইংলণ্ড, ফ্রান্স, স্পেন, অষ্ট্রিয়া, প্রাশিয়া ও রাশিয়া।

ইংলণ্ড : ইওরোপের অন্যান্য দেশের মত ইংলণ্ডেও মধ্যযুগে জনসাধারণের অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না। সামন্তপ্রভুরাই ছিল সর্বেসর্বা। তারাই সমাজের সকল সুখের অধিকার ভোগ করত। আর যারা মেহনত করত তারা ছিল সামন্তপ্রভুদের কৃপার উপর নির্ভরশীল ভূমিদাস মাত্র। তাদের না-ছিল ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, না-ছিল রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার।

ইংলণ্ডের জনসাধারণ (কৃষক সমাজ) সর্বপ্রথম এই সামন্ততন্ত্রের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। ১৩৮১ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে একটি বিরাট কৃষক-বিদ্রোহ হয়েছিল। এই বিদ্রোহ সামন্ততন্ত্রের মূলে এমন আঘাত হানল যে তার ধাক্কা সামন্ততন্ত্রের পক্ষে সামলিয়ে ওঠার আর উপায় রইল না। এই বিদ্রোহের পরে ইংলণ্ডে ভূমিদাস-প্রথা লোপ পেয়েছিল।

রাজনৈতিক অধিকার অর্জনের জন্য সংগ্রামও ইওরোপে সর্বপ্রথম ইংলণ্ডেই আরম্ভ হয়েছিল। রাজার স্বেচ্ছাচার বন্ধ করে প্রজার সহযোগিতায় রাষ্ট্র পরিচালনার পদ্ধতিটি ইংলণ্ডেই সর্বপ্রথম প্রবর্তিত হয়।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে প্রজা ও স্বৈরাচারী রাজার মধ্যে ইংলণ্ডে বহু বছর ধরে সংগ্রাম চলেছিল। এই সংগ্রামের চরম পরিণতি হিসাবে ১৬৪২ খ্রীঃ ইংলণ্ডে এক গণবিদ্রোহ ঘটে। এই সংগ্রামে স্বৈরাচারী রাজা প্রথম চার্লসের শিরশ্ছেদ করা হয়। এরপর থেকেই ক্রমে ক্রমে ইংলণ্ডে পার্লামেণ্টের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই প্রজা-বিপ্লবের ফলে ইংলণ্ডে একদিকে যেমন সামন্ততন্ত্রের প্রভাব মন্দীভূত হয়, তেমনি অন্যদিকে রাজকীয় স্বৈরাচারের পথও বন্ধ হয়। দেশে ঐক্য ও সংহতি দেখা দেয়।

সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের সময়কার অবস্থা

সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের সময়ে ইংলণ্ডের রাজা ছিলেন হ্যানোভার বংশীয় তৃতীয় জর্জ (১৭৬০-১৮২০)। তাঁর আমলে প্রসিদ্ধ রাজনীতিবিদ **উইলিয়াম পিটের** সুযোগ্য পরিচালনায় ইংলণ্ড ফ্রান্সকে পরাজিত করতে সমর্থ হয়েছিল।

সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে জয়লাভ করার ফলে কানাডা ইংলণ্ডের হস্তগত হয়। এই সময়েই ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়। ইংলণ্ডের ইতিহাসের এই পর্বেই পর পর কয়েকটি বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সম্ভব হয় এবং ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লবের জয়যাত্রা আরম্ভ হয়।

ফ্রান্স: ইংলণ্ডের অগ্রগতির কারণ যেমন ইংলণ্ডের আভ্যন্তরীণ শক্তি, ফ্রান্সের অধঃপতনের কারণও তেমনি ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা। এই সময়ে ফ্রান্সের সমাজ ও রাজনীতিতে ক্ষয়িষ্ণুতার চিহ্নগুলি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল।

ফরাসী সামন্ততন্ত্র

ফ্রান্সের সমাজ ছিল দ্বিধাবিভক্ত। একই দেশে যেন দুটো 'জাতি' বাস করত—একটা 'ধনী ফরাসী জাতি' আর একটা 'গরীব ফরাসী জাতি'। সামন্তপ্রভুরা ছিল সমাজের নেতা। এই সামন্তপ্রভুদের কৃপার পাত্র ছিল শতকরা ৯০ জন গরীব লোক। গরীবদের কথা দূরে থাক,—এমনকি ধনী বণিকদের এই সমাজে কোন রাজনৈতিক অধিকার ছিল না। রাষ্ট্রটি ছিল বড় বড় সামন্তপ্রভুদের হাতের যন্ত্র মাত্র। সামন্তপ্রভুরা যা পছন্দ করত তাই হত দেশের আইন। রাজা ছিলেন সামন্তপ্রভুদের নেতা।

স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র

এই সময়ে ফ্রান্সে রাজত্ব করত বুরবোঁ বংশ। তাঁরা ছিলেন স্বৈরাচারী। তাঁদের ধারণা ছিল রাজা ভগবানের প্রতিনিধি, তাঁদের ইচ্ছাই বিধাতার বিধান। তখন ফ্রান্সের রাজা ছিলেন **পঞ্চদশ লুই** (১৭১৫-১৭৭৪)। তিনি ছিলেন অপদার্থ। তাঁর পরবর্তী রাজা **ষোড়শ লুই**ও ছিলেন অকর্মণ্য।

এই আভ্যন্তরীণ দুর্বলতার জন্যই ফ্রান্সের পক্ষে উন্নতির সকল সম্ভাবনা ছিল সুদূরপরাহত। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে এখানেই ছিল প্রধান তফাত।

সামন্তপ্রভুরা বিলাসী জীবন যাপন করত অথচ তাদের কাজকর্ম করতে হত না মোটেই। দেশের লোকের কাছ থেকে অর্থ আদায়ের সব রকমের ক্ষমতা ছিল তাদের, কিন্তু তাদের রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য টাকা-পয়সা দেওয়ার

দায়িত্ব ছিল না মোটেই। দইয়ের মাথা, ঘোলের শেষ—এটা ছিল তাদের পাওনা। আর প্রজাদের কাছ থেকে টাকা ছিনিয়ে নেওয়া, তাদের বিনা বেতনে কাজ করতে বাধ্য করা, এগুলি ছিল তাদের পবিত্র অধিকার! বলাই বাহুল্য, সমাজের মধ্যে এই অন্যায় জুলুম, এই ক্ষমাহীন শ্রেণীবৈষম্য ফ্রান্সের জীবনীশক্তিকে আড়ষ্ট করে রেখেছিল।

অবশ্য এক ইংলণ্ড ছাড়া ইওরোপের অন্যান্য প্রায় প্রত্যেকটি দেশেরই এই সময়ে একই দশা ছিল। সামন্ততন্ত্রের বদ্ধজলে আবদ্ধ ফ্রান্সের মতই ছিল তখন স্পেন, অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া, রাশিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্র সমূহও।

স্পেন : এক সময়ে স্পেন ছিল ইওরোপের শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র। ষোড়শ শতাব্দীতে স্পেনের ছিল বিরাট হাঁক-ডাক। স্পেনের জাহাজ তখন আতলান্তিক মহাসাগর পাহারা দিত। ইওরোপের ও আমেরিকার বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে তখন প্রতিষ্ঠিত ছিল স্পেনের সাম্রাজ্য। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ থেকেই স্পেনের পতনের লক্ষণগুলি দেখা যেতে থাকে। ইংলণ্ডের রানী এলিজাবেথের সঙ্গে স্পেনের যে যুদ্ধ (আর্মাডার যুদ্ধ) হয়, সেই সময় থেকেই স্পেনের অধঃপতনের সূচনা। এই যে অধঃপতন আরম্ভ হল, স্পেনের পক্ষে তাকে রোধ করা আর সম্ভব হল না। স্পেনেও সামন্ততন্ত্র এবং প্রতিক্রিয়াশীল ক্যাথলিক চার্চ—এই দুইয়ে মিলে সামাজিক অগ্রগতির সমস্ত সম্ভাবনা নিশ্চিহ্ন করে এনেছিল। স্পেনের এই আভ্যন্তরীণ দুর্বলতার জন্যই অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ফ্রান্সের রাজারা স্পেনের উপর নিজেদের আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হয়েছিল।

স্পেনের পতন

সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে স্পেন ফ্রান্সের পক্ষে যোগ দিয়েছিল। এই যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে ফ্রান্সের যেমন শক্তি ক্ষয় হয়েছিল, তেমনি হয়েছিল স্পেনের। এই সময় থেকে স্পেনের গৌরব-রবি চিরতরে অস্তমিত হল।

অস্ট্রিয়া : স্পেনের পরেই নাম করতে হয় অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার। এই সময়ে 'হোলি রোমান এম্পায়ার' (Holy Roman Empire) নামে পুরানো দিনের একটি বড় সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ ছিল। এই 'এম্পায়ারে'র মধ্যে থেকে অন্যান্য রাষ্ট্র সব বেরিয়ে গিয়েছিল। শুধু অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া—এই দুটো রাষ্ট্রই অবশিষ্ট ছিল এই 'এম্পায়ারে'র। অস্ট্রিয়ায় যিনি রাজত্ব করতেন তাঁকে বলা হত এম্পারার (Emperor); তাঁর ক্ষমতা কার্যত

অস্টিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এক সময়ে এই 'এম্পারার'-এর ছিল প্রচুর প্রভাব ও প্রতিপত্তি। এখন তার ছায়াটুকু অবশিষ্ট ছিল মাত্র। 'এম্পারার'-শাসিত এই অস্ট্রিয়াতেও সামন্ততন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল।

অস্টিয়ার ক্ষমতা হ্রাস

সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে অস্ট্রিয়া যোগ দিয়েছিল। কিন্তু এই যুদ্ধে যোগদানের ফলে তার লাভের চেয়ে ক্ষতিই হয়েছিল বেশী; কেননা, এই যুদ্ধের পরে অস্টিয়াকে তার রাজ্যের একাংশ (সাইলেশিয়া) প্রাশিয়াকে ছেড়ে দিতে হয়েছিল। জার্মানীতে অস্ট্রিয়ার নেতৃত্ব এই সময় থেকেই শিথিল হতে আরম্ভ করল।

প্রাশিয়ার অগ্রগতি

প্রাশিয়া : অস্ট্রিয়ার 'এম্পারার'-এর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন প্রাশিয়ার রাজা। প্রাশিয়া ক্রমশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করল। **ফ্রেডারিক দি গ্রেট** (১৭৪০-১৭৮৬) নামে একজন রাজা সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের সময়ে প্রাশিয়ায় রাজত্ব করতেন। তিনি ছিলেন খুব ক্ষমতাশালী। তিনি সপ্তবর্ষ-ব্যাপী যুদ্ধে ইংলণ্ডের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে ফ্রান্স ও অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন। সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে ইংলণ্ড ও প্রাশিয়ার জয় হয়েছিল। ফলে ইংলণ্ডের সঙ্গে প্রাশিয়াও লাভবান হয়েছিল। প্রাশিয়া এই যুদ্ধের সুযোগে জার্মানীর মধ্যে একটি বিশিষ্ট শক্তি হিসাবে নিজের স্থান করে নিয়েছিল। কিন্তু প্রাশিয়াতেও অন্যান্য রাষ্ট্রের মতই সামন্ততন্ত্র ছিল অব্যাহত।

রাশিয়ার শক্তিবৃদ্ধি

রাশিয়া : রাশিয়া ছিল পূর্ব ইওরোপের আর একটি প্রধান রাষ্ট্র। এই দেশটি সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত মধ্যযুগের অন্ধকারে লুকিয়ে ছিল। **পিটার দি গ্রেট** নামে একজন জার (রাশিয়ার সম্রাটকে জার বলা হত) রাশিয়াকে আধুনিক রাষ্ট্রের আসনে অধিষ্ঠিত করার জন্য সর্বপ্রথম চেষ্টা করেন। **ক্যাথারিন দি গ্রেট** নামে এক রানীও পিটার-প্রবর্তিত পথে পরিচালিত করে রাশিয়াকে উচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেন। ক্যাথারিন দি গ্রেটের সময় রাশিয়া কৃষ্ণসাগর অঞ্চলে নিজ আধিপত্য বিস্তার করে। তাছাড়া, পোল্যাণ্ডের একটি বড় অংশও সে দখল করে নেয়। ফলে পূর্ব ইওরোপে রাশিয়া একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র বলে পরিগণিত হয়।

কিন্তু সামরিক শক্তিতে বড় হলেও আভ্যন্তরীণ ক্ষমতার দিক থেকে রাশিয়ার একটি প্রধান দুর্বলতা রয়ে গেল। সেটি হল রাশিয়ার মধ্যযুগীয়

ভূমিদাস-প্রথা। রাশিয়াতে ভূমিদাস-প্রথা ইওরোপের মধ্যে সবচেয়ে বেশী দিন (উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত) স্থায়ী হয়েছিল। রাশিয়ার অগ্রগতির পথে এই ভূমিদাস-প্রথাই ছিল সবচেয়ে বড় বাধা।

ভূমিদাস-প্রথা

পোল্যাণ্ড: পূর্ব ইওরোপে এই সময়ে আর একটা প্রধান রাষ্ট্র ছিল পোল্যাণ্ড। এক সময়ে পোল্যাণ্ড পূর্ব ইওরোপের মধ্যে বেশ বড় শক্তি হয়ে উঠেছিল। কিন্তু পোল্যাণ্ডের আভ্যন্তরীণ অবস্থা ছিল নানা দিক থেকে শোচনীয়। এখানেও সামন্তপ্রভুদের ছিল দোর্দণ্ড প্রতাপ। স্বার্থান্বেষী সামন্তপ্রভুরা দেশের স্বার্থের উপরে স্থান দিত তাদের নিজের শ্রেণী-স্বার্থকে। ফলে বিদেশী শক্তিরা, বিশেষ করে রাশিয়া, প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া এই সামন্ত-প্রভুদের সাহায্য নিয়ে এই দেশে একে একে নিজেদের আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ করে নিয়েছিল। অবস্থাটা ক্রমশ এতই শোচনীয় হয়ে উঠেছিল যে রাশিয়া, অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া পোল্যাণ্ড দেশটাকে নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে এই দেশটার অস্তিত্বই ইওরোপের মানচিত্র থেকে লোপ পেয়ে গেল।

পোল্যাণ্ডের অবলুপ্তি

তুরস্ক: ইওরোপখণ্ডের উপর এই সময়ে ইওরোপের বাইরের একটি দেশের বিশেষ প্রভাব ছিল। সেই দেশটি হল তুরস্ক। তুরস্ক ছিল মুসলমান রাষ্ট্র। কিন্তু তুরস্ক পূর্ব ইওরোপের একটি বিরাট অংশে তার সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল। আজকাল যেখানে পোল্যাণ্ড, বুলগেরিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, রুমানিয়া, গ্রীস প্রভৃতি দেশ রয়েছে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে অবস্থিত ছিল তুরস্কের এক বিশাল সাম্রাজ্য। একদিকে রাশিয়া আর একদিকে অস্ট্রিয়া—এই দুটি রাষ্ট্রের সঙ্গে তুরস্কের ঝগড়া প্রায় লেগেই থাকত। তুরস্ক সাম্রাজ্যও এই সময়ে পতনোন্মুখ হয়েছিল। তুরস্কে ছিল মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থা। তুরস্কের সুলতান মধ্যযুগীয় আদর্শে নিছক দমননীতির সাহায্যে সাম্রাজ্যের উপর প্রভাব বজায় রাখতে সচেষ্ট ছিলেন। বস্তুত, তুরস্কের সাম্রাজ্য ছিল অত্যাচার ও অনাচারের প্রতীক। এই সাম্রাজ্যে নিপীড়িত জাতিগুলি সুযোগ পেলেই বিদ্রোহের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকত। কাজেই এই সাম্রাজ্যের মধ্যেও কোন সংহতি ছিল না। এই দুর্বলতা লক্ষ্য

'ইউরোপের রুগ্ন ব্যক্তি'

করে তুরস্ককে বলা হত 'ইওরোপের রুগ্ন ব্যক্তি' (Sick man of Europe)। এই হল অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইওরোপের মোটামুটি অবস্থা।

রাষ্ট্র ও জনগণের সম্পর্ক (Relation between the State and the people) : এক ইংলণ্ড ছাড়া ফ্রান্স, অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া সর্বত্রই ছিল সামন্ততন্ত্রের জগদ্দল পাথর। রাষ্ট্র ছিল জনসাধারণের সঙ্গে সংযোগশূন্য। কিন্তু ইংলণ্ডের অগ্রগতির দৃষ্টান্তটা ছিল ইওরোপের সামনে। কাজেই তাদের মনে প্রশ্ন জাগল—কোন্ পথে ইওরোপের মুক্তি? সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে, আর স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সুর অনুরণিত হতে আরম্ভ করল ইওরোপের রাষ্ট্রগুলিতে। প্রশ্ন উঠল—সামন্ততন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্রের মূলে প্রথম আঘাত হানবে কে?

বস্তুত অষ্টাদশ শতাব্দীর ইওরোপ সপ্তদশ শতাব্দীর ইওরোপ হতে ছিল অনেকদিক থেকে আলাদা। প্রথমত, অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইওরোপে, বিশেষ করে ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে বুদ্ধিজীবীদের নেতৃত্বে এক জাগরণ আরম্ভ হয়। প্রচলিত সামন্ততন্ত্র ও রাজকীয় স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে এ্যাডাম স্মিথ, হব্‌স, লক, ভলতেয়ার, রুশো প্রভৃতি বুদ্ধিজীবীরা নিজ নিজ লেখনী চালনা আরম্ভ করলেন। দ্বিতীয়ত, এই শতাব্দীতে জার্মানীতে ও রাশিয়ায় বড় বড় কৃষক-বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। একদিকে বুদ্ধিজীবীদের জাগরণ, আর একদিকে বিশাল কৃষক-অভ্যুত্থান সামন্ততন্ত্র ও রাজকীয় স্বৈরাচারের ভিত্তিমূলকে প্রবলভাবে নাড়া দেয়।

জন-জাগরণ

প্রাশিয়া, রাশিয়া, অস্ট্রিয়া প্রভৃতি দেশের রাজারা অবস্থার চাপে পড়ে নিজেদের নীতি কিছুটা পরিবর্তন করতে বাধ্য হন। তাঁরা নিজেদের স্বৈরাচারী ক্ষমতা অব্যাহত রাখলেন। কিন্তু প্রজাদের আশ্বাস দিলেন প্রজাকল্যাণের দিকে তাঁরা মন দেবেন, অর্থাৎ প্রজাহিতে তাঁরা তাঁদের স্বৈরাচারী ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন। এই ধরনের প্রজাহিতৈষী স্বৈরাচারী রাজারা (Benevolent Despots) প্রজাদের কল্যাণে সমাজসংস্কার, অর্থনৈতিক সংস্কার ও রাজনৈতিক সংস্কারে মনোনিবেশ করেন। কিন্তু প্রজাহিতের পক্ষে যে দুটি ছিল মূল সংস্কার—সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদ ও রাজকীয় স্বৈরাচারের বিলোপ সাধন—এই দুটিই অব্যাহত থাকায় প্রজাহিতৈষী স্বৈরাচারী রাজাদের

প্রজাহিতৈষী স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র

সকলকেই শেষ পর্যন্ত বিফলতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এঁদের মধ্যে প্রজাহিতৈষী স্বৈরাচারী রাজা হিসাবে এই সময়ে বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন প্রাশিয়ার ফ্রেডারিক দি গ্রেট, রাশিয়ার ক্যাথারিন দি গ্রেট, অস্ট্রিয়ার দ্বিতীয় জোসেফ প্রভৃতি।

আগেই বলেছি, মূল দুটি সংস্কারে হাত না দেওয়ায় প্রজাহিতৈষী স্বৈরাচারী রাজাদের ব্যর্থতা ছিল অনিবার্য। এই দুটি মূল সংস্কারের— সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদ ও রাজকীয় স্বৈরাচারের অবলুপ্তির দাবি নিয়ে তাই পরবর্তী যুগে বিরাট এক গণবিপ্লবের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। ঐতিহাসিক ফরাসী বিপ্লবের (১৭৮৯) মধ্যেই প্রথম ইওরোপ-ব্যাপী সেই গণ-বিপ্লবের জয়ধ্বনি শোনা গেল।

গণবিপ্লব

[২]

জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগ

[The Age of Enlightenment]

চতুর্দশ, পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে রেনেসাঁস, রিফর্মেশন ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে ইওরোপের মনোজগতে এক বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল। সপ্তদশ শতকের শেষে ও অষ্টাদশ শতকে এই আন্দোলনগুলির সূত্র ধরে বিজ্ঞানে, দর্শনে, রাজনীতি-চিন্তায়, অর্থনীতি চিন্তায়, সাহিত্যে, কলা ও সংগীতে নব নব অনুশীলন আরম্ভ হয়। জ্ঞানে-বিজ্ঞানে অগ্রগতির ইতিহাসে এই যুগ ছিল অভূতপূর্ব। তাই সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীকে বলা হয়ে থাকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগ (Age of Enlightenment)।

এই যুগের চিন্তায় সাধারণভাবে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। সেই বৈশিষ্ট্যগুলি হল : (১) এটি ছিল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের যুগ। এই যুগে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন-বিদ্যা, জীববিদ্যা, ভূতত্ব প্রভৃতির ক্ষেত্রে অনেক নতুন আবিষ্কার হয়। এই যুগে এই ধারণা বদ্ধমূল হয় যে প্রাকৃতিক রহস্য বলে কিছু নাই। মানুষ জ্ঞান ও গবেষণার সাহায্যে প্রতিটি প্রাকৃতিক ঘটনার চরিত্র বিশ্লেষণ করতে সক্ষম। যেমন, আগে যেখানে মেঘ-বৃষ্টি-ঝড় ছিল মানুষের কাছে রহস্যের মত, এখন বৈজ্ঞানিকেরা গবেষণার সাহায্যে এই প্রাকৃতিক বিষয়গুলির ব্যাখ্যা উপস্থিত করতে সমর্থ হলেন। (২) এই যুগের আর একটি

জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগ এই কথার অর্থ কি ?

বৈশিষ্ট্য যুক্তির প্রতি নিষ্ঠা। দৈবশক্তির বদলে বুদ্ধি, অন্ধবিশ্বাসের জায়গায় যুক্তি এই যুগে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই যুগের দর্শনে, সাহিত্যে এই যুক্তি-ধর্মিতার প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। (৩) এই যুগ ছিল : মানবতাবাদের যুগ। এই যুগের সাহিত্যে, সংগীতে, স্থাপত্যে, সর্বত্র মানুষের উপর বিশ্বাস, মানুষের অধিকারের উপর জোর চোখে পড়ে।

বিজ্ঞান—বিজ্ঞানে এই যুগ নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, বিশেষ করে পদার্থ-বিদ্যা, রসায়ন-বিদ্যা, জীববিদ্যা, ভূতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে এই যুগে নানা গবেষণা আরম্ভ হয়। রোমে, লণ্ডনে, প্যারিসে বৈজ্ঞানিক গবেষণাকেন্দ্র স্থাপিত হয়। বৈজ্ঞানিক গবেষণার উপযোগী ল্যাবরেটারী, মিউজিয়াম, পরীক্ষাকেন্দ্র প্রভৃতি স্থাপিত হয়।

নিউটন ও বয়েল

পদার্থবিজ্ঞানে ইংলণ্ডের **স্যার আইজাক নিউটনের** গবেষণা, বিশেষ করে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি (Law of Gravitation) যুগান্তকারী আবিষ্কার। বস্তুত পদার্থ বিজ্ঞানের জনক ছিলেন নিউটন। রসায়ন-বিদ্যার জনক ছিলেন **রবার্ট বয়েল**। তাঁর আবিষ্কৃত "বয়েলস্ পদ্ধতি" (Boyle's Law) রসায়ন বিদ্যায় যুগান্তর আনয়ন করে।

অন্যান্য বিজ্ঞান-শাখায়, যেমন ভূতত্ত্বে—উদ্ভিদবিদ্যায়, প্রাণীতত্ত্বে, চিকিৎসাবিদ্যায় নব নব আবিষ্কার এই সময়ে দেখা গিয়েছিল।

দর্শনশাস্ত্র—দর্শনশাস্ত্রেও এই যুগে অভূতপূর্ব উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। এই যুগের দর্শন অধ্যাত্মবাদের গণ্ডী অতিক্রম করে বিজ্ঞান ও যুক্তির আশ্রয়ে জীবন্ত হয়ে ওঠে।

ডেকার্টে, স্পিনোজা, হিউম, কাণ্ট

ফরাসী দার্শনিক **ডেকার্টে** (Descartes) পূর্বসূরীদের পথ পরিত্যাগ করে দর্শনকে ধর্ম থেকে পৃথক করে দেওয়ার চেষ্টা করলেন। অতিপ্রাকৃত তত্ত্বের কচকচির মধ্যে না গিয়ে তর্ক ও যুক্তির সাহায্য নিয়ে, প্রাকৃতিক নিয়মের অনুবর্তী হয়ে তিনি তাঁর দার্শনিক চিন্তা উপস্থাপিত করেন। হল্যাণ্ডের দার্শনিক **স্পিনোজাও** ছিলেন যুক্তির পূজারী। স্কটল্যাণ্ডের **ডেভিড হিউম** তাঁর দর্শন চিন্তায় দেবজগতের অলীক কল্পনা বাতিল করে মানবীয় জগতের শ্রেষ্ঠত্ব কোথায় তা বিশ্লেষণ করলেন। জার্মানীর **ইম্যানুয়েল কাণ্ট** বিজ্ঞানের প্রতি অনুরাগী ছিলেন। তিনি ধর্মের অনুশাসনকে বাদ দিয়ে নীতিশাস্ত্রের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করেন বিজ্ঞানকে।

সাহিত্য-চারুকলা-সংগীত—সাহিত্যে, শিল্পে, স্থাপত্যে, সংগীতেও এই যুগ ছিল নব নব অবদানে ঐশ্বর্যময়। ফরাসী দেশে সাহিত্যে **কর্ণেলি, মোলেয়ার ও রেসিন** নবজীবনের সঞ্চার করেন। ইংলণ্ডে **জন মিলটন, জন ড্রাইডেন ও আলেকজাণ্ডার পোপ** ছিলেন এই যুগের শ্রেষ্ঠ লেখক। জার্মানীতে **গ্যেটে ও শিলার** সাহিত্যে নতুন দিগন্ত উন্মুক্ত করেন। এ দের লেখায় যুক্তি ও মানবতা প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠে।

মিলটন, গ্যেটে, শিলার

সংগীতে জার্মানীর **বাক্ ও মোজার্টের** নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মোজার্টের সংগীতে নবযুগের সুর ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল।

মোজার্ড

চারুকলায় এই যুগে হল্যাণ্ড উন্নতির উচ্চশীর্ষে আরোহণ করেছিল। **রুবেন, ভ্যান ডাইক ও রেমব্র্যাণ্ডের** নাম এই যুগে শিল্পের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এঁদের চারুকলায় বাস্তববাদী মনোভাবের পরিচয় মেলে। স্পেনের শিল্পী **গোয়াও** ছিলেন বাস্তববাদী এবং তাঁর চিত্রে স্পেনের অভিজাত সম্প্রদায়ের জীবনের অন্তঃসারশূন্যতা ফুটে উঠেছিল।

রুবেন, ভ্যান ডাইক, রেমব্র্যাণ্ড, গোয়া

সমাজবিজ্ঞান—এই যুগে সমাজবিজ্ঞান সম্বন্ধেও যথেষ্ট গবেষণা হয়েছিল। সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা যেমন অর্থনীতি, রাজনীতি, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে বহু গবেষণামূলক পুস্তক লিখিত হয়। ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে ইতালীর অধ্যাপক **ভিকো** ও ঐতিহাসিক **হার্ডার** নতুন দৃষ্টি উপস্থাপিত করেন। ঐতিহাসিক **গীবনের** বিখ্যাত পুস্তক Decline & fall of the Roman Empire—ইতিহাস শাস্ত্রে এক নতুন সংযোজন। এই যুগে মানবসমাজের অগ্রগতির ইতিহাসের উপরেই অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল।

গীবন

অর্থনীতির ক্ষেত্রে, ফরাসী অর্থনীতিবিদ **কুইস্‌নের** নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ছিলেন ফ্রান্সের রাজা চতুর্দশ লুইয়ের চিকিৎসক। তিনি বলতেন যে ধনোৎপত্তির একটি নিয়ম আছে। সেই নিয়ম অনুযায়ী ধনোৎপাদন ঘটে থাকে। তাকে কেন্দ্র করে ফ্রান্সে একদল অর্থনীতিবিদের উদ্ভব হয়। এঁদের বলা হত **ফিজিওক্র্যাট** (Physiocrat)।

কুইস্‌নে ফিজিওক্র্যাট

স্কটল্যাণ্ডবাসী **এ্যাডাম স্মিথের** গবেষণা অর্থনীতিশাস্ত্রে সব চেয়ে মূল্যবান সম্পদ। তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত পুস্তকের নাম Wealth of Nations। তিনি বলতেন ধনোৎপাদনের মূল উৎস—বাণিজ্য নয়, কৃষি নয়, মূল উৎস হল শ্রম। তিনি অর্থনীতিক্ষেত্রে অবাধ বাণিজ্যের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর অর্থনীতিতত্ত্বের মূল কথা ছিল—অবাধ বাণিজ্য (Laissez-faire)।

রাজনীতি-বিজ্ঞান—রাজনীতি-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও এই যুগে নতুন চিন্তাধারার সংযোজন লক্ষণীয়। এই যুগের মানুষের কাছে নূতন করে রাজনীতি-চিন্তার এক বিশেষ তাগিদ এসেছিল। তার প্রমাণ ১৬৪২ খ্রীঃ থেকে ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সংঘটিত ইংলণ্ডের অভূতপূর্ব প্রজাবিদ্রোহ। ইংলণ্ডে রাজকীয় স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহ পরিচালিত হয়। এই বিদ্রোহের পরে ইংলণ্ড থেকে রাজকীয় স্বৈরতন্ত্র চিরতরে অন্তর্হিত হয়। ইংলণ্ডেই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম রাজকীয় স্বৈরতন্ত্রের বদলে পার্লামেণ্টের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এই রাজনৈতিক আলোড়নের পটভূমিকায় ইংলণ্ডে রাজনীতিবিজ্ঞান সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এই দিক থেকে হব্‌স (Hobbes) এবং লকের (Locke) দান সবচেয়ে বেশী।

হব্‌স

হব্‌স (Hobbes) ছিলেন রাজতন্ত্রের সমর্থক। ইংলণ্ডে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল তার প্রতি তাঁর কোন সহানুভূতি ছিল না। তিনি শক্তিশালী, ক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্রকর্তৃত্বের পক্ষে মত জ্ঞাপন করেন। হব্‌সের চিন্তাধারাকে কেন্দ্র করে ইংলণ্ডের রাজনীতিবিদ্‌দের মধ্যে রাজনৈতিক তর্কের ঝড় উঠেছিল। এই তর্কযুদ্ধের ফলে ইংলণ্ডে রাজনীতি-বিজ্ঞান নিয়ে বহু গবেষণা আরম্ভ হয়।

লক

হব্‌স যেমন রাজতন্ত্রের সমর্থক ছিলেন, **লক** (Locke) তেমনি ছিলেন ইংলণ্ডে রাজনৈতিক পরিবর্তনের পক্ষপাতী। লক জোর দিতেন মানুষের সহজাত অধিকারের উপরে (natural rights)। জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তির অধিকার—তিনি মনে করতেন মানুষের সহজাত অধিকার। রাষ্ট্রের কাজ হল এই সমস্ত অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখা। কোন সরকার যদি এই সমস্ত অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখতে না পারে, তাহলে সেই সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অধিকার জনসাধারণের আছে—এই ছিল লকের মত।

ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টারী শাসন এবং হব্‌স্ ও লকের চিন্তাধারা, পার্শ্ববর্তী ফ্রান্সের বুদ্ধিজীবীদের মনেও যথেষ্ট সাড়া জাগিয়ে ছিল। ফ্রান্সের স্বাধীনতাকামী বুদ্ধিজীবীরা যেমন ভলতেয়ার, মাণ্টেস্কু প্রভৃতি ইংলণ্ড পরিভ্রমণে আসেন এবং ইংলণ্ডের গণতান্ত্রিক ভাবধারার প্রতি যথেষ্ট আকৃষ্ট হন।

ফ্রান্সের জনজাগরণে যিনি সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছিলেন তিনি হলেন রুশো। তাঁর সব চেয়ে বিখ্যাত বইয়ের নাম হল 'সোশ্যাল কণ্ট্রাক্ট' (Social Contract)। এই বইখানিকে বলা হয়ে থাকে 'বিপ্লবের বাইবেল। ফরাসী সমাজে মানুষ যে ভাবে দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ রয়েছে তা' দেখে তিনি ব্যথিত হলেন। তিনি বললেন—মানুষ যখন এত সভ্য হয় নাই, তখন সে ছিল স্বাধীন, তার পায়ে ছিল না এইরকম দাসত্বের শৃংখল। রুশো আক্ষেপ করে বললেন—মানুষ জন্মেছিল স্বাধীন হয়ে, অথচ সর্বত্র তার পায়ে আজ বেড়ি। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে তিনি প্রচার করলেন তাঁর নিজের **সামাজিক চুক্তি মতবাদ**। তাঁর মতে প্রজারাই সমবেতভাবে দেশের একমাত্র সার্বভৌম শক্তি। তাই রুশোর মতবাদে রাজার কোনো স্থান নেই।

রুশো

এই বিশাল জ্ঞানোন্মেষের আন্দোলনে সমস্ত ইওরোপ আলোকিত হয়ে উঠল। ইতিহাসে নতুন প্রাণ, নতুন শক্তি সঞ্চারিত হবার ফলে এক নবযুগের অভ্যুদয় হল।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ বিপ্লবের যুগ

[১]

আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধ

[American War of Independence]

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইওরোপের মানুষের মধ্যে যেমন জাগরণ দেখা দিয়েছিল, তেমনি প্রচণ্ড এক রাজনৈতিক আলোড়ন দেখা দিয়েছিল আমেরিকায়। অবশ্য, আমেরিকার অবস্থা সব দিক থেকেই ছিল ইওরোপের অবস্থা থেকে আলাদা।

স্বাধীনতা যুদ্ধের পূর্বে আমেরিকার অবস্থা

[America before the War of Independence]

আমেরিকা ছিল ইংলণ্ডের উপনিবেশ। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে স্টুয়ার্ট রাজাদের আমলে ইংলণ্ডে দারুণ অশান্তি চলেছিল। বহু সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জিত ইংলণ্ডের জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকারগুলিকে রাজা প্রথম জেম্‌স্ ও প্রথম চার্লস অগ্রাহ্য করে স্বৈরাচারের বন্যা বইয়ে দিলেন। কি রাজনীতিতে, কি ধর্মে তাঁদের একগুয়েমি আর গোঁড়ামি ইংলণ্ডের গণতন্ত্রপ্রিয় অনেক মানুষই পছন্দ করল না। যারা এই ব্যবস্থা পছন্দ করল না, তারা স্বাধীন ভাবে চলার ইচ্ছায়, ইংলণ্ড ছেড়ে আমেরিকায় গিয়ে বসবাস করতে আরম্ভ করল। পরে ইংলণ্ডে যখন রাজার ভাগ্যবিপর্যয় হয়েছিল (প্রথম জেম্‌সের পুত্র চার্লসের শিরশ্ছেদ করা হয়েছিল), তখন আবার রাজার বহু অনুগামী হতাশায় ইংলণ্ড ছেড়ে আমেরিকায় চলে যায়। গণতন্ত্রপ্রিয় যারা, তারা গিয়ে বসবাস করতে লাগল আমেরিকার উত্তর অংশে, আর রাজভক্তরা ভিড় করল দক্ষিণে। তবে আমেরিকায় গিয়ে যারা বাস করছিল তাদের মধ্যে রাজার অনুরাগীদের তুলনায় গণতন্ত্রবাদীদের সংখ্যাই ছিল

আমেরিকায় ইংলণ্ডের উপনিবেশ স্থাপন

বেশী। যাই হোক, ক্রমশ দেখতে দেখতে আমেরিকায় ক্রমে ইংরেজ অধিবাসীদের তেরটি উপনিবেশ গজিয়ে উঠল।

শিক্ষায়-দীক্ষায়, চিন্তায়-ধারণায় এঁরা রয়ে গেলেন ইংরেজ, কিন্তু ধন-সম্পত্তিতে বৈষয়িক দিক থেকে এঁরা গড়ে তুললেন আমেরিকায় তাঁদের এক নিজস্ব জীবন। ইংলণ্ডের রাজাকে তাঁরা যেমন রাজা বলে মেনে নিলেন, তেমনি ইংলণ্ডে প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক অধিকারগুলিকেও তাঁরা নিজস্ব অধিকার বলে দাবি করলেন। তাঁরা বিশেষ করে দাবি করলেন প্রতিনিধিত্বমূলক গণ-তন্ত্রের (Representative Democracy) অধিকার।

ইংলণ্ডে প্রতিষ্ঠিত প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র বা পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের আদর্শ অনুযায়ী তাঁরা আমেরিকায় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের চেষ্টায় মন দিলেন। কিন্তু আমেরিকার ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রশ্নটির সঙ্গে আরও একটি প্রশ্ন জড়িত ছিল। সেটি হল আমেরিকার স্বাধীনতার প্রশ্ন। আমেরিকা ছিল ইংলণ্ডের কাছে পরাধীন, ইংলণ্ডের উপনিবেশ। কাজেই আমেরিকাবাসীরা এক সঙ্গে দুটি দাবি উত্থাপন করল—(১) স্বাধীনতার দাবি, (২) গণতন্ত্রের দাবি।

আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের কারণ

[Causes of the American War of Independence]

আগেই বলেছি, আমেরিকা ছিল ইংলণ্ডের উপনিবেশ। তখনকার দিনে প্রচলিত অবাধ বাণিজ্যের মতবাদ অনুসারে ইংলণ্ডের বৃহৎ বণিকেরা নিজেদের স্বার্থে আমেরিকা শোষণ করতে চাইল। তারা চাইল: (১) আমেরিকা থেকে সেই সমস্ত পণ্যদ্রব্য আমদানি করবে যা ইংলণ্ডে উৎপন্ন হয় না। (২) আমেরিকার বণিকেরা এমন কোন জিনিস উৎপাদন করবে না যাতে ইংলণ্ডের বণিকদের স্বার্থহানি ঘটে। (৩) তাছাড়া আমেরিকার উপর ইংলণ্ডের ঔপনিবেশিক শাসন বজায় রাখার জন্য সরকারী দপ্তরখানা, সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনী বাবদ যা খরচা হবে তাও আমেরিকাবাসীকে বহন করতে হবে।

ইংলণ্ড ও আমেরিকার বাণিজ্য-সম্পর্ক

প্রকৃতপক্ষে ইংলণ্ডের বৃহৎ বণিকেরা আমেরিকাকে নিজেদের মুনাফা অর্জনের মৃগয়া-ক্ষেত্রে রূপান্তরিত করার জন্য উদ্‌গ্রীব হল। নিজেদের

ব্রিটিশ বণিক ও আমেরিকার বণিকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব

মুনাফার লোভ তাদের এতই অন্ধ করে তুলেছিল যে তারা আমেরিকার স্থানীয় বণিকদের স্বার্থের দিকে চাইবার সময় পেল না। তারা স্থানীয় ব্যবসায়ীদের স্বার্থ উপেক্ষা করে নিজেদের পণ্যদ্রব্য চালু করার জন্য আমেরিকার বাণিজ্যের উপর নানা বিধি-নিষেধ আরোপ করতে লাগল। ব্রিটেনের ইস্পাত ও পশমী দ্রব্যের বণিকদের স্বার্থে আমেরিকায় ইস্পাত, পশমী দ্রব্য, এমন কি টুপি পর্যন্ত প্রস্তুত করা নিষিদ্ধ করা হল। বলাই বাহুল্য, আমেরিকার স্থানীয় অধিবাসীরা নিজেদের মুখের উপর উন্নতির দরজাটা বন্ধ দেখে মোটেই সুখী হতে পারল না। শুরু হল ব্রিটিশ বণিক আর আমেরিকার বণিকদের মধ্যে স্বার্থসংঘাত।

তাছাড়া, সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের সময় কানাডা জয় করার ব্যাপারে ইংলণ্ডের যে ক্ষতি হয়েছিল, সেই ক্ষতি পূরণের জন্য ইংলণ্ড আমেরিকার উপর একের পর এক ট্যাক্স বসাতে আরম্ভ করল। এই উদ্দেশ্যে ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথমে চিনির উপর আমদানি কর বসানো হল।

চিনির উপর কর

এর পরে ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টে এই মর্মে আইন পাস করা হল যে, আমেরিকায় প্রত্যেকটি দলিলের উপর টিকিট (স্ট্যাম্প) মারতে হবে। এই সঙ্গে আদেশ জারি হল যে পুস্তিকা, সংবাদপত্র প্রভৃতিও টিকিট-মারা কাগজে মুদ্রিত করতে হবে। এই টিকিট থেকে সংগৃহীত অর্থ ইংলণ্ড আত্মসাৎ করল।

'স্ট্যাম্প এ্যাক্ট'

কিন্তু আমরা আগেই দেখেছি যে, আমেরিকার স্থানীয় অধিবাসীরা শিক্ষায়-দীক্ষায় ইংলণ্ডের গণতান্ত্রিক আদর্শের দ্বারা উদ্বুদ্ধ ছিল। তাই তারা বলল—ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টে তাদের যখন কোন প্রতিনিধি নাই, তখন তাদের উপর ট্যাক্স ধার্যের অধিকারও ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টের নাই (No taxation without representation)।

এডমণ্ড বার্ক

ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ বাগ্মী এডমণ্ড বার্ক-প্রমুখ ইংলণ্ডের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি আমেরিকাবাসীদের এই যুক্তির ন্যায্যতা স্বীকার করলেন। কিন্তু জোর করে যখন এই ট্যাক্স চাপিয়ে দেওয়া হল তখন চারদিক থেকে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ দেখা দিল। ইংলণ্ডের পণ্যদ্রব্য বয়কট করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। এখানে-ওখানে সংঘর্ষ

বাধল, একজন ইংরেজ গভর্নরের বাড়িতে হামলা করা হল, ট্যাক্স আদায়কারীদের কুশপুত্তলিকা দাহ করা হতে থাকল। ঝড়ের মুখে ইংলণ্ডের শাসকবৃন্দ মাথা নোয়াল, স্ট্যাম্প-কর রহিত করা হল, কিন্তু এই সঙ্গে নতুন একটি আইন পাশ করে ঘোষণা করা হল যে স্ট্যাম্প কর রহিত করা হল বটে, তবে আমেরিকাবাসীদের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য ইংলণ্ডের আইন পাস করার অধিকার অবশ্যই আছে। এইটি 'ডিক্লারেটরি আইন' (Declaratory Act) নামে পরিচিত।

স্ট্যাম্প-কর রহিত ; ডিক্লারেটরি আইন পাশ

এর পরে ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী টাউনসেণ্ড আমেরিকাবাসীদের ওপর নতুন এক ট্যাক্সের বোঝা চাপালেন। তিনি চা, কাঁচ ও কাগজের আমদানির উপর ট্যাক্স বসালেন। এইটি 'টাউনসেণ্ড আইন' বলে পরিচিত। অত্যন্ত কঠোরতার সঙ্গে সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে আমেরিকাবাসীদের কাছ থেকে এই কর আদায় করা হল। বোস্টনের নাগরিকেরা ট্যাক্স আদায়কারীদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল। ট্যাক্স আদায়কারী ও নাগরিকদের মধ্যে রক্তাক্ত সংগ্রাম আরম্ভ হল। ইংরেজ সৈনিকদের হাতে বোস্টনবাসীদের প্রাণ দিতে হল। এই ঘটনাটি বোস্টন হত্যাকাণ্ড (Boston Massacre) বলে পরিচিত।

টাউনসেণ্ড আইন

শেষে দেশব্যাপী প্রতিরোধের মুখে কাঁচ ও কাগজের উপর থেকে ট্যাক্স তুলে নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু চায়ের উপর থেকে ট্যাক্স তোলা হল না।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এই সময়ে আমেরিকায় চা আমদানি করত প্রচুর। এই কোম্পানীতে ইংলণ্ডের বড় বড় বণিকদের অনেক শেয়ার ছিল। তাই এই কোম্পানী যাতে চড়া দরে আমেরিকায় চা বিক্রি করতে পারে সেই দিকে ইংলণ্ডের বণিকদের নজর ছিল খুব বেশী। কিন্তু এতে স্থানীয় চায়ের ব্যবসায়ীদের উন্নতির পথ বন্ধ হয়ে গেল।

চায়ের উপর কর

স্থানীয় বণিকদের অসন্তোষ শেষ পর্যন্ত ফেটে পড়ল ; এক বিশাল ঝড় উঠল আমেরিকার বুকে। স্থানীয় বণিকেরা স্থির করল তারা ইংলণ্ডের চা বর্জন করবে। সুতরাং ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন বোষ্টন বন্দরে জাহাজ-ভরতি করে চা এনে হাজির করল, তখন স্থানীয় অধিবাসীদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে

বোস্টন বন্দরের ঘটনা

গেল। তারা রেড ইণ্ডিয়ানদের ছদ্মবেশ ধারণ করে চা-ভরতি জাহাজে উঠে বসল এবং সমস্ত চা সমুদ্রের জলে জোর করে ফেলে দিল।

এই ঘটনা থেকেই আরম্ভ হল আমেরিকার অধিবাসীদের প্রত্যক্ষ বিদ্রোহ। আমেরিকার অধিবাসীরা শপথ নিল—ব্রিটেনের আধিপত্য থেকে তারা দেশকে মুক্ত করবে, তারা গড়ে তুলবে আমেরিকায় নিজেদের এক স্বাধীন রাষ্ট্র।

যুদ্ধের ঘটনাবলী

ইংলণ্ড সৈন্য পাঠিয়ে আমেরিকাবাসীদের বিদ্রোহ দমন করতে সচেষ্ট হল।

ইংলণ্ড ও আমেরিকার মধ্যে যুদ্ধ

কিন্তু স্থানীয় অধিবাসীরাও নিজেদের উদ্যোগে সৈন্য-বাহিনী গঠন করে ইংরেজ সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হল। ইংলণ্ডের শত্রু ফ্রান্স ও স্পেন ইংলণ্ডের দুর্দিনের সুযোগ নিতে অগ্রসর হল। তারা আমেরিকাবাসীদের সাহায্য করতে এগিয়ে এল।

জর্জ ওয়াশিংটন : স্বাধীনতা-যুদ্ধে আমেরিকার জয়লাভ

এই সময়ে এই স্বাধীনতা যুদ্ধে সেনাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করলেন আমেরিকার একজন জমিদার ও প্ল্যাণ্টার। তাঁর নাম জর্জ **ওয়াশিংটন**। জর্জ ওয়াশিংটনের নেতৃত্বে আমেরিকাবাসীরা অসাধ্য সাধন করল। তারা বৃটিশ সৈন্যদের ইয়র্কটাউনের যুদ্ধে হটিয়ে দিল এবং ব্রিটিশের আধিপত্য থেকে নিজেদের মুক্ত করে স্বাধীনতা ঘোষণা করল।



জর্জ ওয়াশিংটন

১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ভার্সাই সন্ধির শর্ত অনুযায়ী ব্রিটেন আমেরিকাকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে মেনে নিল। স্বাধীনতার যুদ্ধে আমেরিকাবাসীদের জয়লাভ একটি বিস্ময়কর ঘটনা সন্দেহ নাই। শক্তিশালী ব্রিটেনের সঙ্গে যুদ্ধে দুর্বল আমেরিকা কিভাবে জয়লাভ করল?

আমেরিকাবাসীর জয়লাভের কারণ

আমেরিকার জয়লাভের প্রথম কারণ—আমেরিকার দিক থেকে এই যুদ্ধ

ছিল ন্যায়যুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধ। তাই আবালবৃদ্ধবণিতা আমেরিকার সমস্ত দেশ-প্রেমিক শক্তি ব্রিটেনের বিরুদ্ধে আমরণ সংগ্রামের পথ বেছে নিয়েছিল। আমেরিকাবাসীর দুর্জয় দেশপ্রেমের সামনে মুনাফালোলুপ ব্রিটেন দাঁড়াতে পারে নাই। বৃটেনের দিক থেকে যুদ্ধটি ছিল অন্যায় যুদ্ধ, আক্রমণাত্মক যুদ্ধ। তাই বৃটেনের আক্রমণমুখী নীতি ব্রিটেনেও বিশেষ জনসমর্থন লাভ করে নাই। দ্বিতীয়ত, ফ্রান্স, স্পেন ও হল্যাণ্ড এই যুদ্ধে আমেরিকা-বাসীদের সাহায্য করায় যুদ্ধের গতি পরিবর্তিত হয়েছিল। ব্রিটেনের কাছে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে ফ্রান্স পরাজিত হয়েছিল। এই যুদ্ধে সেই পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবার আকাংখায় ফ্রান্স ব্রিটেনের শত্রু আমেরিকাকে সাহায্য করেছিল।

স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র (Declaration of Independence) : দেশবাসীকে উৎসাহিত করার জন্য একদল লেখক ও বুদ্ধিজীবী কলম ধরলেন। তাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন মনীষী বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন, লেখক টমাস পেইন, এবং রাজনীতিবিদ টমাস জেফারশন। এঁদের দ্বারা পরিচালিত মতবাদগত সংগ্রাম আমেরিকাবাসীদের স্বাধীনতাযুদ্ধে প্রেরণা যুগিয়েছিল। স্বাধীনতার যুদ্ধ যে ন্যায়যুদ্ধ এই ধারণা স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিকদের মনে সাহস সঞ্চার করেছিল।

অবশেষে 'ফিলাডেলফিয়া কংগ্রেসে' আমেরিকার স্বদেশপ্রেমিক নেতারা মিলিত হলেন এবং আমেরিকার ১৩টি উপনিবেশের অধিবাসীরা ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই স্বাক্ষর দিলেন এক মহান দলিলে—'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র' নামে যা ইতিহাস-বিখ্যাত হয়ে রয়েছে। এই ঘোষণাপত্র যেদিন স্বাক্ষরিত হল সেইদিন থেকে আরম্ভ হল স্বাধীন আমেরিকার নয়া ইতিহাস।

আমেরিকার স্বাধীনতার এই ঘোষণাপত্রে উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা রইল এই মহৎ বাণীটি : 'সমান অধিকার নিয়ে জন্মেছে সকল মানুষ' (All men are born equal)। এই কথাটির মধ্যেই মূর্ত হয়ে রয়েছে আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধের মর্মবাণী।

আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রকৃতি
(The Nature of the American War of Independence)

আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধে দুটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। প্রথমত, এই

বিদ্রোহ ছিল ঔপনিবেশিক মুক্তির সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম। এই যুদ্ধের ফলে আমেরিকা ব্রিটেনের আধিপত্য থেকে নিজেকে মুক্ত করতে সমর্থ হল। দ্বিতীয়ত, আমেরিকার এই স্বাধীনতার যুদ্ধ ছিল গণতন্ত্রের সংগ্রাম। সুতরাং আমেরিকার জনসাধারণ এই বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করে; তারা শুধু ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকবাদীদেরই বিতাড়িত করে নি, তারা দেশের অভ্যন্তরে যে কায়েমী স্বার্থ ছিল তাদেরও প্রতিহত করেছিল এবং জনসাধারণের এই সংগ্রামের ফলেই আমেরিকায় গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল। একই সঙ্গে ঔপনিবেশিকতাবাদের বিরুদ্ধে এবং দেশীয় স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম—আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের সব চেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য।

আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধের গুরুত্ব
(Importance of the American War of Independence)

আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধ ইতিহাসের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। প্রথমত, এই যুদ্ধ আমেরিকাকে ব্রিটেনের অধীনতাপাশ থেকে মুক্তি এনে দিল। দ্বিতীয়ত, এই যুদ্ধের ফলে আমেরিকায় গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হল। ব্রিটেনে সপ্তদশ শতাব্দীতে যে প্রজাতান্ত্রিক বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল আমেরিকার বিপ্লবে সেই প্রজাতান্ত্রিক বিদ্রোহের বাণীটি আরও পরিপূর্ণ রূপ লাভ করল। তৃতীয়ত, আমেরিকার বিপ্লবের জয়ধ্বনি ইওরোপের লোকেদের মনে, বিশেষ করে, ফরাসীদের মধ্যে গণতান্ত্রিক চেতনা জাগিয়ে তুলল। চতুর্থত, আমেরিকার বিপ্লব ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে সফল সংগ্রাম হওয়ায় দুনিয়ার সর্বত্র পরাধীন জাতির লোকেদের মনে আশার সঞ্চার করেছিল। তাই বলা চলে, আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধের গুরুত্ব কেবলমাত্র আমেরিকার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়, এর গুরুত্ব বিশ্বব্যাপী।

[২]

ফরাসী বিপ্লব
(The French Revolution)

আমেরিকায় কামানের গর্জন শেষ হতে না হতেই আবার কামানের শব্দ শোনা গেল ইওরোপের একটি দেশে—ফ্রান্সে। আমেরিকায় জনগণ

যেমন স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধে নেমেছিল, তেমনি ফ্রান্সের জনসাধারণও এই সময়ে নিজেদের দেশের অত্যাচারী রাজা ও সামন্তপ্রভুদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। তাদের এই বিদ্রোহ 'ফরাসী বিপ্লব' নামে বিখ্যাত।

ফরাসী বিপ্লবের কারণ
(Causes of the French Revolution)

সামাজিক অবস্থা (Social condition) : আমেরিকার মত ফ্রান্স অবশ্য পরাধীন দেশ ছিল না, ফ্রান্স ছিল স্বাধীন দেশ। কিন্তু স্বাধীন হলেও দেশের অধিকাংশ লোকই ছিল অধিকারহীন। ফরাসী সমাজ ছিল দ্বিধাবিভক্ত—একদিকে সব সুবিধাভোগী (privileged) আর একদিকে যারা বঞ্চিত (unprivileged)। সুবিধাভোগীরা আবার দুই ভাগে বিভক্ত ছিল—(১) সামন্তপ্রভু, (২) যাজক সম্প্রদায়। যাজকদের বলা হত প্রথম শ্রেণী (First Estate) এবং সামন্তপ্রভুদের বলা হত দ্বিতীয় শ্রেণী (Second Estate)। বাকী সমস্ত বঞ্চিত জনসাধারণকে আর একটি শ্রেণীতে ফেলা হত। তাদের বলা হত তৃতীয় শ্রেণী (Third Estate)।

এই সমস্ত সামন্তপ্রভু ও যাজক ছাড়া আর সকলেই—যেমন, গ্রামের কৃষক, শহরের শ্রমজীবী ও কারিগর, এমন কি, দেশের অর্থশালী বণিক ও উচ্চ মধ্যবিত্তেরা পর্যন্ত বংশকৌলীন্য না থাকায় তৃতীয় শ্রেণীর অর্থাৎ অধিকারহীনদের দলের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

সামন্তপ্রভু

সামন্তপ্রভুরা ছিল পরশ্রমজীবী। তাদের নিজেদের কায়িক পরিশ্রম করতে হত না। অথচ সামাজিক ধনসম্পত্তির উপর তাদের ছিল একচেটিয়া কর্তৃত্ব। রাষ্ট্রের উপরেও সামন্তপ্রভুদের ছিল দোর্দণ্ড প্রতাপ। রাষ্ট্র পরিচালনা, সেনাবাহিনী পরিচালনা প্রভৃতির অধিকার ছিল একমাত্র তাদেরই। অথচ রাষ্ট্রকে কর দেওয়ার দায়িত্ব থেকে তারা অব্যাহতি পেয়েছিল। সামন্তপ্রভুদের সমগোত্রীয় ছিল যাজকেরা। যাজকদের উপরতলার অংশ সামন্তপ্রভুদের মতই সুযোগ-সুবিধা উপভোগ করত। সামন্তপ্রভুদের ছেলেরাই বড় যাজক হবার মর্যাদা লাভ করত। যাজকেরা সামন্তবংশজাত হওয়ায় তাদের মধ্যেও পরশ্রমজীবী শ্রেণীর সমস্ত দোষ দেখা দিয়েছিল।

যাজক

তৃতীয় শ্রেণীভুক্তদের মধ্যে প্রধান ছিল উচ্চমধ্যবিত্ত সম্প্রদায় বা বুর্জোয়া

শ্রেণী। এরা ছিল বণিক অথবা শিল্পপতি। এদের হাতে প্রচুর অর্থ ছিল কিন্তু বংশ-কৌলীন্য না থাকায় এরাও ছিল অধিকারহীনদের দলে। ফলে ফরাসী বুর্জোয়া শ্রেণী অন্যান্য অধিকারহীনদের সঙ্গে যোগ দিয়ে সুবিধাভোগীদের পতন ঘটাবার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল। ফরাসী বিপ্লবে এই শ্রেণীটিই নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিল।

বুর্জোয়া শ্রেণী

তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্তদের অধিকাংশই ছিল কৃষক। কৃষকদের উপর সামন্তপ্রভুদের অত্যাচার ছিল সীমাহীন। কৃষকদের শুধু চড়া হারে খাজনাই দিতে হত না, অধিকাংশ কৃষককে ভূমিদাসের জীবন অতিবাহিত করতে হত। তাছাড়া, কৃষকদের কাছ থেকে সামন্তপ্রভুরা বেগার খাটুনি (corvee) আদায় করত।

কৃষক

সমস্ত কর আদায় করা হত কৃষকদের কাছ থেকে। কৃষকদের জমিদারগণকে দিতে হত খাজনা (rent), চার্চকে দিতে হত ধর্ম-কর (tithes) আর রাষ্ট্রকে দিতে হত ট্যাক্স (tax)। কর দিতে গিয়ে তারা সর্বস্বান্ত হত।

রাজনৈতিক অবস্থা (Political Condition)ঃ রাষ্ট্রের উপর জনসাধারণের কোন অধিকার ছিল না। রাজা ছিলেন স্বৈরাচারী ; প্রজার মতের তিনি অপেক্ষা করতেন না। প্রজার মংগলের দিকেও তিনি দৃষ্টি দিতেন না। রাজার মুখের কথাই ছিল আইন। রাজার কাজ ছিল আদেশ করা। প্রজার কাজ ছিল আদেশ পালন করা।

স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র

প্রজার অধিকার বলে কোন জিনিস এই সময়ে ফ্রান্সে ছিল না। ফ্রান্সে পূর্বে একটি পার্লামেণ্ট ছিল যাকে বলা হত এস্টেট্স্ জেনারেল (Estates General)। এই পার্লামেণ্টে জনসাধারণের প্রবেশাধিকার ছিল না। এই পার্লামেণ্টে ছিল সামন্তপ্রভুদের একাধিপত্য। কিন্তু ফরাসী রাজারা এতই স্বৈরাচারী হয়ে উঠেছিলেন যে, তাঁরা এই সামন্ততান্ত্রিক পার্লামেণ্টটি ডাকাও বন্ধ করে দিলেন।

সপ্তদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সে একজন খুব বড় রাজা ছিলেন। তাঁর নাম ছিল **চতুর্দশ লুই**। তিনি ইওরোপে ফ্রান্সের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু প্রতিপত্তি বৃদ্ধির নেশায় তিনি একের পর এক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। অনবরত যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকায় ফ্রান্সে

রাজাদের অযোগ্যতা

প্রচুর লোকক্ষয় ও ধনক্ষয় হল। চতুর্দশ লুইয়ের পরে ফ্রান্সের রাজা হলেন **পঞ্চদশ লুই**। পঞ্চদশ লুই ছিলেন অকর্মণ্য রাজা। তিনি বিলাসে গা ভাসিয়ে দিলেন। দায়িত্বহীন, লোভী সামন্তপ্রভুর দল রাষ্ট্রের সম্পত্তি লুটে-পুটে খেতে আরম্ভ করল। তাছাড়া, পঞ্চদশ লুইও কতকগুলি যুদ্ধে জড়িত থাকায় ফ্রান্সের প্রচুর অর্থক্ষয় হল। আবার এই যুদ্ধগুলিতে, বিশেষ করে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে জিততে না পারায় ফ্রান্সের সম্মানহানিও কম হল না।

ফরাসী বিপ্লবের সময় ফ্রান্সের রাজা ছিলেন **ষোড়শ লুই**। তিনি মানুষ হিসাবে ভাল হলেও একেবারেই অযোগ্য ছিলেন। তিনি সামন্তপ্রভুদের হাতের পুতুল হয়ে রইলেন।

শুধু রাজ্যশাসন ব্যাপারেই অরাজকতা দেখা গেল না। অরাজকতা দেখা গেল আইন ও বিচার বিষয়েও। দেশের সর্বত্র একই আইন প্রচলিত ছিল না। এক এক প্রদেশে এক এক রকমের আইন, এক এক রকমের ওজন এক এক রকমের মুদ্রা, এক এক রকমের শুল্ক ইত্যাদি প্রচলিত ছিল। বিচারের নামে চলত প্রহসন। ন্যায়বিচার পাবার আশা কোথাও ছিল না। এমন কি, রাজা ইচ্ছা করলেই কোন একজনকে গ্রেপ্তার করে অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্দী করে রাখতে পারতেন। শুধু রাজাই নয় রাজার অনুমতি (letters de cachet) পেলে সামন্ত-প্রভুরাও নিজেদের ব্যক্তিগত শত্রুদের বিনাবিচারে বন্দী করে রাখতে পারত।

বিচারের প্রহসন

আর্থিক অবস্থা (Financial Condition) : অকর্মণ্য রাজাদের আমলে দেশের আর্থিক অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে উঠল। উপর্যুপরি যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকায় প্রচুর অর্থক্ষয় হল। কিন্তু অর্থ রোজগারের পথ ছিল বন্ধ। যাদের হাতে টাকা সেই সামন্তপ্রভুরা রাষ্ট্রকে ট্যাক্স দিল না। সমস্ত ট্যাক্স আদায় করা হত কৃষক ও বুর্জোয়া শ্রেণীর কাছে থেকে। কৃষকেরা শেষ পর্যন্ত এমন একটি অবস্থায় গিয়ে পৌঁছাল যে তাদের পক্ষে আর বেশী কর দেওয়া অসম্ভব হয়ে উঠল। রাজকোষ শূন্য হয়ে এল। রাষ্ট্র ক্রমবর্ধমান ঋণের চাপে একেবারে নুয়ে পড়ল। দুজন অর্থমন্ত্রী টার্গো ও নেকার সামন্ত-প্রভুদের কিছু অর্থ দিতে অনুরোধ করায় মন্ত্রীপদ থেকে বরখাস্ত হলেন। রাজতন্ত্র দেউলিয়া হয়ে পড়ল।

সমগ্র সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন রাজা। তাই সামন্ততান্ত্রিক

চক্রটি—যেটি দেশের সম্পত্তির মালিক, রাষ্ট্রের কর্ণধার—তাদের বিরুদ্ধে সর্বসাধারণের ছিল প্রচণ্ড বিক্ষোভ। এইরূপ ব্যাপক বিক্ষোভ ছিল বলেই ফরাসী দেশে বিরাট একটি বিপ্লব ক্রমশ অনিবার্য হয়ে উঠেছিল।

দেশের অধিকাংশ লোকের অসন্তোষ না থাকলে বিপ্লব হয় না। ফ্রান্সে সর্বসাধারণের ভিতরে এই বিক্ষোভ সেখানে বিপ্লবের জমি তৈরী করে রেখেছিল।

কিন্তু শুধু বিক্ষোভ থাকলেই যে বিপ্লব হয় তাও নয়। লোকের ধারণা থাকা চাই, কি ভাবে এই দুর্দশা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, কি করে বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে নতুন সমাজ গড়ে তোলা যায়। তার জন্য প্রয়োজন হয় যুগোপযোগী ভাবধারা।

বুদ্ধিজীবীদের জাগরণ (Intellectual Revolt) ঃ ফ্রান্সের উচ্চ চেতনা-সম্পন্ন বুদ্ধিজীবীরা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলেন এই নিষ্প্রাণ, মৃতকল্প ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। এই প্রতিবাদের ভাষায় গড়ে উঠল এক তেজোদ্দীপ্ত বিপ্লবী সাহিত্য।

বিপ্লবী সাহিত্য

এই প্রতিবাদ জানাতে কলম ধরলেন একজন দু'জন নয়, বহু লোক। তাঁদের মধ্যে যাঁদের নাম না করলেই চলে না তাঁরা হলেন মণ্টেস্কু, ভলতেয়ার, দিদেরো ও রুশো।

উপরোক্ত কজনের মধ্যে সবচেয়ে প্রবীণ ছিলেন **মণ্টেস্কু**। ওকালতি ছিল তাঁর পেশা। তিনি পঙ্গু ফরাসী সমাজের, বিশেষ করে, ফরাসী সরকারী অপদার্থতার ছিলেন কঠোর সমালোচক। তিনি ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থার প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টারী ব্যবস্থা অনুযায়ী ফরাসী দেশের শাসনব্যবস্থাটি পুনর্গঠনের জন্য তিনি সুপারিশ করলেন।

মণ্টেস্কু ঃ পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থার প্রতি অনুরাগ

মণ্টেস্কুর চেয়েও প্রভাবশালী ছিলেন **ভলতেয়ার**। বয়সে তিনি ছিলেন মণ্টেস্কুর চেয়ে পাঁচ বছরের ছোট। ধনী পরিবারে জন্মাবার সৌভাগ্য হয়েছিল তাঁর। কিন্তু ধনী সমাজের অন্তঃসারশূন্যতা তাঁর মনকে বিষিয়ে তুলেছিল। তাই তাঁর লেখনী বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ কশাঘাতে ফরাসী অভিজাত সমাজকে আক্রমণ করার জন্য সব সময়ে উদ্যত থাকত। অভিজাত বংশীয়েরা এই বিদ্রূপের জ্বালা সহ্য করতে পারল না। বিপ্লবধর্মী রচনার জন্য রাষ্ট্রের

ভলতেয়ার ঃ যুক্তির পূজারী ঃ ধনীর অনাচারের তীক্ষ্ণ সমালোচনা

প্রধান জেল বাস্তিলে ভলতেয়ারকে আটক করে রাখা হয়েছিল। জেল থেকে বেরিয়ে ভলতেয়ার ইংলণ্ডে গেলেন এবং ইংলণ্ড থেকে ফিরে আসার পরে তাঁর স্বাধীনতা-কামনা আরও জোরাল হয়ে উঠল। এখন তাঁর কলম থেকে জ্বলন্ত বিদ্রূপ বর্ষিত হতে লাগল। তিনি একটানা আক্রমণ করে চললেন ক্ষয়িষ্ণু ফরাসী সমাজের ধুরন্ধরদের। তিনি আক্রমণ করলেন ধর্ম-যাজকদের, স্বৈরাচারী রাজাকে ও অত্যাচারী



ভলতেয়ার

সামন্ত-প্রভুদের। সত্য, ভালবাসা, আর দয়া—এই তিনের জন্য তিনি আরম্ভ করলেন এক মৃত্যুঞ্জয়ী সংগ্রাম। তিনি দাবি করলেন—চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতা, প্রতিটি মানুষের নিজের বিবেক অনুযায়ী চলার অধিকার। ভলতেয়ার ছিলেন যুক্তির পূজারী, সংকীর্ণতা ও কুসংস্কারের পরম শত্রু। তাই বলে তিনি যে গণতন্ত্রের শক্তিতে পুরোপুরি বিশ্বাসী ছিলেন তা নয়। তাঁর ধারণা ছিল রাজতন্ত্র বজায় রেখেই ফ্রান্সের মুক্তি আনা সম্ভব।

দিদেরো : জ্ঞান ও মুক্তির উপাসক

এই সময়ে এই নতুন চিন্তা, নতুন ধারণা, নতুন যুগ-চেতনা নিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল এক বিখ্যাত রচনা-সংগ্রহ। এই রচনা-সংগ্রহের নাম হল **এনসাইক্লোপিডিয়া (Encyclopaedia)**। এই রচনা-সংগ্রহের সম্পাদক ছিলেন বিখ্যাত পণ্ডিত **দিদেরো**। দিদেরো, ভলতেয়ার, রুশো ও অন্যান্য স্বাধীনতাকামী লেখকদের রচনায় এই সংগ্রহ-পুস্তকখানি সমৃদ্ধ ছিল। এই রচনা-সংগ্রহের পাতায় দেখা গেল মানবমনের স্বাধীনতাকামনার বহুমুখী প্রকাশ। মানুষের সৃজনী-শক্তির অব্যাহত বিকাশের প্রয়োজনীয়তার কথা এই রচনা-সংগ্রহের পাতায় পাতায় উচ্চারিত হতে থাকল। রাজনৈতিক তত্ত্ব প্রচারেও অগ্রণী

হলেন এই এনসাইক্লোপিডিয়ার লেখকেরা। ধর্মের নামে যে অনাচার দেশে চলছিল দিদেরো ভলতেয়ারের মত তারও বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলেন। তাই দিদেরোও দেশের বড়লোকদের বিরক্তিভাজন হয়ে উঠলেন। পুলিসের নজর পড়ল তাঁর গতিবিধির উপর। এনসাইক্লো-পিডিয়ার শেষের খণ্ডগুলি পুলিসের ভয়ে তাঁকে লুকিয়ে ছাপতে হয়েছিল। দিদেরোর ধারণা ছিল পৃথিবীর মুক্তি আসবে সদাচার আর জ্ঞানের পথ বেয়ে।



দিদেরো

ফ্রান্সে জনজাগরণের আন্দোলনে **রুশোর** অবদান সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। রুশো জন্মেছিলেন গরীবের ঘরে এবং তাঁকে বেশ কিছুদিন ভবঘুরের জীবন কাটাতে হয়েছিল। তাই ফরাসীদেশের নির্যাতিত মানুষের জীবনের টাটকা অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি আরম্ভ করেছিলেন তাঁর বৈপ্লবিক সাধনা। রুশোর সবচেয়ে বিখ্যাত বই 'সোশ্যাল কনট্রাক্ট' (Social Contract)—যাকে বলা হয়ে থাকে "বিপ্লবের বাইবেল"—তার কথা আগেই বলেছি।

রুশোর প্রজাতন্ত্রের আদর্শ



রুশো

'সোশ্যাল কনট্রাক্ট'

যুক্তিপ্রবণতায় যেমন ভলতেয়ারের, তেমনি ভাবপ্রবণতায় উজ্জ্বল ছিল

রুশোর রচনা। রুশোর লেখায় রাজসভা ও চার্চকে তীব্রভাবে আক্রমণ করা হল। প্রজার সম্মতি অনুযায়ী রাজ্যশাসন করার প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি তুলে ধরলেন অনবদ্য ভঙ্গিতে। ফরাসী দেশের লোককে সাম্য ও স্বাধীনতা মন্ত্রের সাধনা করতে শেখালেন রুশো। তাঁর কল্পিত প্রজাতন্ত্রের আদর্শ, তাঁর প্রচারিত সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শ ফরাসী দেশের মানুষকে মাতিয়ে তুলল।

সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা

ভাবের বন্যা কাজের উন্মাদনা এনে দিল মানুষের মনে। সুপ্তোত্থিত মানুষের জাগরণে ফ্রান্স হয়ে উঠল সমুজ্জ্বল। নব প্রভাতের পূর্বক্ষণে দাঁড়িয়ে ফ্রান্স অপেক্ষা করতে লাগল।

আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রভাব (Influence of the American Revolution) : তাছাড়া, আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধের প্রভাব পড়েছিল ফ্রান্সের অধিবাসীদের মনে। আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধে অনেক ফরাসী সৈন্য যোগ দিয়েছিল। স্বাধীনতা যুদ্ধের মর্মবাণী তাদের মনে প্রেরণা জাগাল। তারা দেশে ফিরে স্বাধীনতা ও মুক্তির আদর্শ প্রচার করতে আরম্ভ করল।

আসন্ন কারণ (Immediate Cause) : এইভাবে বিপ্লবের জমি হল প্রস্তুত ; বারুদে দিয়াশালাইয়ের কাঠিটি দিলেই হয়। এই রকমের যখন অবস্থা, তখন রাজার রাজকোষ হয়ে এল একেবারে শূন্য। রাজা ষোড়শ লুই বাধ্য হলেন টাকার অভাবে প্রজাদের দ্বারস্থ হতে। যে প্রজারা এমনিই বিক্ষুব্ধ হয়ে আছে, তাদের কাছে রাজা বললেন—'এস, টাকা দাও। রাষ্ট্রকে বাঁচাও'। প্রজাদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। ক্রমে শুরু হল ফ্রান্সে অভূতপূর্ব এক গণঅভ্যুত্থান।

এস্টেট্‌স জেনারেল আহ্বান
(Summoning of the Estates General)

শেষ পর্যন্ত অভাবের তাড়নায় রাজাকে হাত পাততে হল জনসাধারণের কাছে। এতকাল জনসাধারণকে অগ্রাহ্য করেই ফ্রান্সের রাজারা শাসন চালিয়ে এসেছিলেন। তাই সাধারণের প্রতিনিধিদের নিয়ে ফ্রান্সে এককালে যে পার্লামেণ্ট বা এস্টেট্‌স জেনারেল (Estates General) গড়ে উঠেছিল তাকে আহ্বান করা হত না। এখন সেই পুরানো প্রতিষ্ঠানটির কথা রাজার

স্মরণ হল। দায়ে পড়ে টাকার তাগিদে ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে রাজা ডাকলেন এস্টেট্‌স জেনারেলের সভা।

এই এস্টেট্‌স্ জেনারেলের পত্তন হয়েছিল চতুর্দশ শতাব্দীতে। সে সময়ে ফ্রান্সের জনসাধারণের মধ্যে জাগরণ দেখা দেয় নাই। তাই এই প্রতিষ্ঠানটি যে সর্বাংগসুন্দর জনসাধারণের প্রতিনিধি-স্থানীয় একটি প্রতিষ্ঠান ছিল তা মোটেই নয়। এই 'এস্টেট্‌স্ জেনারেলে' তিনটি শ্রেণীর প্রতিনিধি ছিল। সামন্তপ্রভুদের প্রতিনিধি, যাজকদের প্রতিনিধি (এই সময়ে চার্চের প্রচুর ভূসম্পত্তি থাকত, তাই চার্চও ছিল এক ধরনের সামন্তপ্রভু), এবং তৃতীয় শ্রেণীর (সামন্তপ্রভু ও যাজক ছাড়া আর সকলের—কৃষক, কারিগর, শ্রমজীবী, বণিক ও উচ্চ-মধ্যবিত্ত প্রভৃতি) প্রতিনিধি। তবে এই তৃতীয় শ্রেণীটির প্রতিনিধি থাকলেও সংখ্যালঘিষ্ঠ সামন্ত ও যাজকদেরই ছিল এখানে আসল কর্তৃত্ব।

এস্টেট্‌স্ জেনারেলের গঠন

সামন্ত ও যাজকদের কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য নিয়ম করা হয়েছিল যে সামন্ত শ্রেণী, যাজক শ্রেণী ও তৃতীয় শ্রেণী আলাদা আলাদা ঘরে সভা করবে। যে কোন বিষয়ে আলোচনার সময়ে তাদের সিদ্ধান্তও হবে আলাদা আলাদা। এস্টেট্‌স্ জেনারেলের সভা ডাকার পরেই তৃতীয় শ্রেণী দাবি জানাল—তিনটি শ্রেণীর প্রতিনিধিদের একসঙ্গে বসার ব্যবস্থা করতে হবে এবং একসঙ্গে বসে অধিকাংশের ভোটে আইন পাস করতে হবে। তৃতীয় শ্রেণীর সংখ্যাধিক্য থাকায় তারা জানত একসঙ্গে ভোট দিলে তাদের জয় হবে নিশ্চিত। আবার সামন্ত ও যাজকেরা দেখল একসঙ্গে বসলে তাদের বিশেষ সুবিধাগুলি বজায় রাখা কঠিন হবে। তাই তারা একসঙ্গে বসার বিরোধিতা করতে লাগল। রাজা সামন্ত ও যাজকদের মতকে সমর্থন করলেন।

তৃতীয় শ্রেণীর দাবি

তৃতীয় শ্রেণীটি সামন্তপ্রভু ও যাজকদের মতামত অগ্রাহ্য করে নিজেরা মিলিত হল। রাজার মতেরও তারা অপেক্ষা করল না। নিজেদের কাজের সমর্থনে তারা আমেরিকার বিদ্রোহীদের নজীর দেখিয়ে বলল—'আমেরিকার বিদ্রোহীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করার আগে কি ইংলণ্ডের মতামতের জন্য অপেক্ষা করেছিল?' ১৭ই জুন তারিখের এই সভায় তারা ঘোষণা করল—তারাই হল ফ্রান্সের শতকরা ৯৬ জন লোকের প্রতিনিধি; তাই দেশের নতুন শাসনতন্ত্র গঠন করার অধিকার একমাত্র

'জাতীয় সভা' গঠন

তাদেরই আছে। এই দাবি নিয়ে তারা নিজেদের সম্মেলনটিকে 'জাতীয় সভা' (National Assembly) বলে ঘোষণা করল।

জাতীয় সভা
(The National Assembly)

রাজা **ষোড়শ লুই** পড়লেন বিপদে। তিনি ছিলেন ভীরু, বুদ্ধিহীন ও কাপুরুষ। সামন্তদের চাপে পড়ে তিনি তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধিদের



ষোড়শ লুই

কাজকর্ম সব বে-আইনী বলে ঘোষণা করলেন। ২০শে জুন তারিখে তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধিদের একটি সভা ডাকা হয়েছিল তৃতীয় শ্রেণীর কক্ষে। কিন্তু রাজা ঘরটি বন্ধ করে রাখলেন। তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধিরা এসে যখন হলঘর বন্ধ দেখল, তখন তারা রাজার শত্রুতা সম্পর্কে আরও নিঃসন্দেহ হল। তারা তাদের মনটাকে আরও শক্ত করে বাঁধল। সমবেত প্রতিনিধিরা প্রতিজ্ঞা করল—তারা সভা করবেই। পাশে একটা টেনিস কোর্ট ছিল; তারা সেখানেই মিলিত হল (২০শে জুন)। তারা এই টেনিস কোর্টে দাঁড়িয়ে একসঙ্গে আন্দোলনের শপথ গ্রহণ করল।

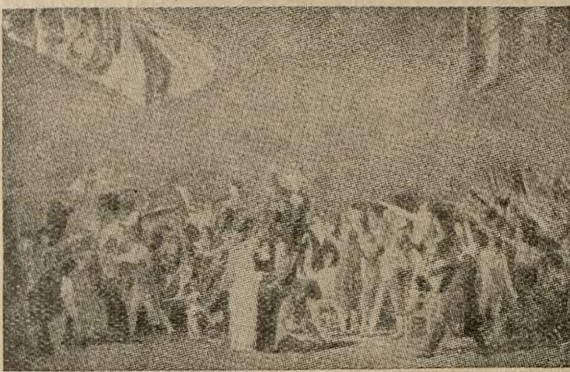
টেনিস কোর্টের শপথ

জনসাধারণের ভাবগতিক দেখে রাজা ভয় পেয়ে গেলেন এবং শেষ পর্যন্ত তৃতীয় শ্রেণীর দাবি মেনে নিলেন—তিনটি শ্রেণী আলাদা আলাদা ঘরে না বসে এক ঘরেই বসবে। অর্থাৎ পুরানো দিনের এস্টেট্‌স্‌ জেনারেলের বদলে নতুন জাতীয় সভাটিকে এখন রাজা বহু টালবাহানার পরে মেনে নিলেন।

রাজার নতি স্বীকার: 'জাতীয় সভা'কে স্বীকৃতি দান

এইভাবে তৃতীয় শ্রেণীর নেতা হিসাবে যাঁরা নতুন ইতিহাস রচনা

করলেন, তাঁরা অধিকাংশই ছিলেন নিঃস্ব সামন্তপ্রভু বা উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক।



টেনিস কোর্ট শপথ

বিপ্লবের এই প্রথম স্তরে সর্বপ্রধান নেতা হিসাবে স্বীকৃতিলাভ করলেন **মীরাবো**। মীরাবো স্বৈরতন্ত্রের বিরোধী হলেও বিশ্বাস করতেন যে রাজতন্ত্র বজায় রেখেই দেশে স্বৈরতন্ত্র বন্ধ করা সম্ভব। ইংলণ্ডে যেমন রাজা আছেন, কিন্তু স্বৈরতন্ত্র নাই, তেমনি নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই ছিল মীরাবোর লক্ষ্য।

মীরাবো: বিপ্লবের প্রথম যুগের নেতা

তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত প্যারিস শহরের শ্রমজীবী জনতা এবং গ্রামের লক্ষ লক্ষ কৃষক—অর্থাৎ তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর লোকেরাও এই সময়ে বিপ্লবে যোগ দিতে এগিয়ে এলেন। প্রকৃতপক্ষে, এই নিম্ন-শ্রেণীর লোকেরা এই সময় থেকে বিপ্লবে একটি স্বাধীন শক্তি হিসাবে অবতীর্ণ হলেন। তাঁরা উচ্চ মধ্যবিত্ত নেতাদের উপর নির্ভর না করে নিজেরাই ইতিহাস রচনার কাজে অগ্রণী হলেন। এই কাজে প্রথম অগ্রসর হল প্যারিস শহরের শ্রমজীবী জনতা।

প্যারিস শহরে শ্রমজীবী জনতার অভ্যুত্থান

জনতার অভ্যুত্থান শুরু হল। রাজা সামন্তবন্ধুদের পরামর্শ অনুযায়ী বিপ্লবকে দমন করার জন্য প্যারিস শহরে এবং তার আশে পাশে ত্রিশ হাজার সৈন্য মোতায়েন করলেন।

রাজা যখন সৈন্য মোতায়েন করে সাধারণকে ভীতি প্রদর্শনের জন্য সচেষ্ট,

ঠিক সেই সময়ে প্যারিস শহরে চলছে দারুণ খাদ্যাভাব। বুভুক্ষু শ্রমজীবী জনতা দোকানপাট লুঠ করতে আরম্ভ করল ; এখানে ওখানে আরম্ভ হল খাদ্যের জন্য কাড়াকাড়ি ও সংঘর্ষ। রাজার সৈন্যরা বাধা দেওয়া দূরে থাকুক, বুভুক্ষু জনতার সঙ্গে অনেক জায়গায় যোগদান করল। নির্যাতিত জনতা এতে আরও সাহস পেয়ে শেষ পর্যন্ত রাজকীয় নির্যাতনের প্রতীক—রাজকীয় জেলখানাটি (যার নাম ছিল 'বাস্তিল দুর্গ) আক্রমণ করল। দুর্গরক্ষীরা দুর্গ রক্ষা করতে পারল না। জনতা দুর্গ দখল করল, বন্দীদের মুক্ত করল, অত্যাচারের প্রতীক এই দুর্গটি ধ্বংস করল। **১৪ই জুলাই**—যেদিন **বাস্তিলের পতন** হল—সেই দিনটি ফ্রান্সের স্বাধীনতাকামী জনসাধারণের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে রইল।

'বাস্তিল দুর্গ' আক্রমণ

বাস্তিলের পতন



বাস্তিলের পতন

বাস্তিলের পতনের খবর যেমনি গ্রামাঞ্চলে গিয়ে পৌঁছাল, অমনি সেখানেও দেখা দিল এক অভূতপূর্ব চাঞ্চল্য। গ্রামাঞ্চলের কৃষকদের কাছে মূল প্রশ্ন ছিল—সামন্তপ্রভুদের অত্যাচার। সামন্তপ্রভুদের ধার্য কর, খাজনা, বেগার খাটুনি—এইগুলির বিরুদ্ধেই ছিল তাদের মনের জ্বালা।

গ্রামাঞ্চলে কৃষক-অভ্যুত্থান

মধ্য ও উত্তর ফ্রান্সের কৃষকেরা আক্রমণ করল সামন্তপ্রভুদের দুর্গগুলি। লাঠি, সড়কি, কাস্তে, কোদাল—যে যা পেল তাই তারা তুলে নিল হাতে

অস্ত্র হিসাবে। সামন্তপ্রভুদের দুর্গে দুর্গে প্রবেশ করে তারা প্রভুদের সযত্নে রক্ষিত দলিলগুলি আগুনে নিক্ষেপ করল; দুর্গগুলি ভেঙে তছনছ করে দিল। গ্রামাঞ্চল থেকে তারা মুছে দিতে চেষ্টা করল সামন্ততন্ত্রের শেষ চিহ্নটুকু।

শহরের খবর যেমন গ্রামাঞ্চলকে, তেমনি গ্রামের খবর শহরাঞ্চলকে চঞ্চল করে তুলল। ফ্রান্সের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত রাজকীয় স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে একযোগে বিদ্রোহ ঘোষণা করল।

অক্টোবর মাসে আরও একটি নাটকীয় ঘটনার মধ্যে দিয়ে বিদ্রোহ তীব্রতর রূপ গ্রহণ করল। প্যারিসে খাদ্যের অভাব তখনও পুরোদস্তুর চলেছে। গরীব গৃহিণীরা স্বামী-পুত্রকে মুখের গ্রাস তুলে দিতে পারছেন না বলে অধীর হয়ে উঠলেন। তাঁরা শুনলেন ভার্সাইয়ে রাজা-রাণী বিলাসিতায় ও খাদ্যের প্রাচুর্যে দিন কাটাচ্ছেন। অথচ তাঁদের এই দুর্দশা। তাই গৃহিণীরা স্থির করলেন ভার্সাই যাত্রা করবেন; শোভাযাত্রা করে খাদ্যের দাবি জানাবেন রাজার কাছে। গৃহিণীরা সারি দিয়ে হাঁটা পথে চললেন ভার্সাই।

মহিলাদের অভিযান

রাজ-বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে তাঁরা চীৎকার করে বললেন—'রাজা, আমাদের খেতে দাও'। রাজা জনতার সম্মুখীন হতে ভয় পেলেন। রানী **মেরী এণ্টয়নেট** বেরিয়ে এসে জনতাকে ধমক দিলেন। ভর্ৎসনা করে বললেন—'রুটি নেই, তবে কেক খাও'!



৫। রাণী মেরী এণ্টয়নেট

জনতা এই ধমকে ভয় পেল না। তারা জোর করে রাজবাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ল। তারা রাজা, রাণী ও রাজপরিবারকে গ্রেপ্তার করল। তাদের নিয়ে-আসা একখানি ভাঙা ঘোড়ার গাড়িতে গাদা-গাদি করে তারা সমস্ত রাজপরিবারকে বসাল। তারপর বন্দী রাজপরিবারকে নিয়ে তারা প্যারিস শহরে এসে হাজির হল।

জনতার হাতে রাজা-রাণী বন্দী

মধ্যবিত্ত-প্রধান জাতীয় সভাটিও এই সময়ে ভার্সাই থেকে প্যারিসে তার সভাস্থল পরিবর্তন করল।

জাতীয় সভার কাজকর্ম॥ জনতার এই প্রচণ্ড গতি-বেগ জাতীয় সভাকেও তার কর্তব্য সম্পর্কে সতর্ক করে দিল। জাতীয় সভা কতকগুলি আইনের মধ্যে দিয়ে পুরানো স্বৈরতন্ত্র, পুরানো সামন্ততন্ত্র ও পুরানো চার্চ—এই তিনটিকেই ভেঙে দেওয়ার জন্য সচেষ্ট হল। স্বৈরতন্ত্র বন্ধ করার জন্য একটি নতুন গঠনতন্ত্র (১৭৯১) তৈরি করা হল। এই গঠনতন্ত্রের অংগ হিসাবে তৈরি হল একটি দলিল। এই দলিলটির নাম দেওয়া হল—'মানুষের অধিকারের ঘোষণাপত্র' (Declaration of the Rights of Man)। আমেরিকার ইতিহাসে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের যে স্থান, ফ্রান্সের ইতিহাসে এই দলিলটিরও সেই স্থান। নতুন গঠনতন্ত্রে রাজার অধিকার সংকুচিত করা হল। রাজা ভগবানের প্রতিনিধি—এই ধারণাটির মূলে আঘাত করা হল। জনসাধারণের সম্মতিই যে রাষ্ট্র-ক্ষমতার প্রধান উৎস—এই মূল নীতিটি স্বীকার করে নেওয়া হল।

নতুন গঠনতন্ত্র (১৭৯১)

তারপরে জাতীয় সভা ক্যাথলিক চার্চের কায়েমী স্বার্থে আঘাত হানল। এতকাল ফ্রান্সে ক্যাথলিক চার্চই ছিল প্রধান। এই চার্চের প্রচুর সম্পত্তি ছিল। এই চার্চ জনসাধারণের কাছ থেকে এক ধরনের কর (Tithes) আদায় করত। রাজা ও রাজকীয় স্বৈরতন্ত্রের সঙ্গে এই ক্যাথলিক চার্চের ছিল ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ।

ক্যাথলিক চার্চের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত

বিপ্লবীরা তাই এই চার্চের ক্ষমতা খর্ব করার জন্য প্রথমেই তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নিল এবং তার কর আদায় বন্ধ করে দিল। তাছাড়া ক্যাথলিকদের বিশেষ সুবিধাগুলি কেড়ে নিয়ে তারা ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্টান্ট উভয়েরই সমান অধিকার ঘোষণা করল। সবচেয়ে বড় কথা ক্যাথলিক চার্চকে রাষ্ট্রের অধীনে নিয়ে আসার বন্দোবস্ত করা হল। এই উদ্দেশ্যে চার্চের জন্য একটি গঠনতন্ত্র (Civil Constitution of the Clergy) রচনা করা হল। এই গঠনতন্ত্র অনুসারে বিশপ ও পুরোহিতদের রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীন বলে ঘোষণা করা হল এবং তাদের রাষ্ট্রের মাইনে-করা কর্মচারীতে পরিণত করা হল।

সিভিল কনস্টিটিউশন অব দি ক্লার্জি

এই পরিবর্তনগুলি আনার পরে জাতীয় সভার কাজ শেষ হল। নতুন গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ১৭৯১—১৭৯২ সালে ফ্রান্সে 'আইন সভার' (Legislative Assembly) কর্তৃত্ব আরম্ভ হল।

লেজিসলেটিভ এসেম্বলি

[The Legislative Assembly]

রাজার পলায়নের চেষ্টা

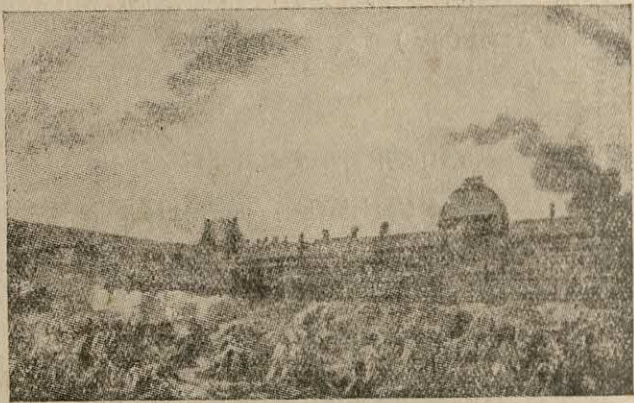
প্রাচীন সমাজের প্রতিভূ রাজা চোখের সামনে দেখলেন পুরানো সমাজের প্রতিটি ইট খসে খসে পড়ছে। তিনি নিরুপায় হয়ে বিপ্লবের প্রতি মৌখিক স্বীকৃতি জানালেন, কিন্তু তলায় তলায় বিপ্লবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন। ১৭৯১ সালের ২০শে জুন রাজা ও রাণী ছেলেপুলেদের নিয়ে প্যারিস শহর থেকে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করলেন। তিনি ভাবলেন—অস্ট্রিয়ার রাজা (অস্ট্রিয়ার রাজা ছিলেন ফ্রান্সের রাণী মেরী এন্টয়নেটের ভাই) ও যেসব সামন্তপ্রভু বিপ্লবের সময়ে দেশ ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল তাদের সাহায্য নিয়ে তিনি দেশের বিপ্লব দমন করবেন। কিন্তু ষড়যন্ত্র ধরা পড়ে গেল। রাজা পালাতে গিয়ে জনসাধারণের হাতে ধরা পড়ে গেলেন। রাজা-রাণীকে গ্রেপ্তার করে প্যারিসে ফিরিয়ে আনা হল।

ব্রান্সউইক ম্যানিফেস্টো

এমনি সময়ে আর একটি ঘটনা ঘটল যার ফলে জনসাধারণের উত্তেজনা চরম আকার ধারণ করল। জুলাই মাসে প্যারিস শহরে 'ব্রান্সউইক ম্যানিফেষ্টো' নামে একটি দলিল ছড়ানো হল। এই দলিলে লেখা ছিল যে প্রাশিয়ার রাজা ফ্রান্সের বিপ্লব দমন করে ফ্রান্সের রাজাকে তার পুরানো ক্ষমতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য ফ্রান্স আক্রমণ করবে। এমনিই অস্ট্রিয়ার রাজা ফ্রান্সের রাজাকে সাহায্য করার জন্য বিপ্লবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল, তার উপরে প্রাশিয়ার এই হুমকি।

আত্মসম্মানজ্ঞানসম্পন্ন ফ্রান্সের জনসাধারণ অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার দম্ভ ও ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে এই নির্লজ্জ হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে দৃঢ়মত জ্ঞাপন করল। রাজা এই সমস্ত ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত আছেন ভেবে তারা রাজাকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হল।

১৭৯২ সালের ১০ই আগষ্ট তারিখে জনসাধারণের এই ক্রোধবহ্নি বর্ষিত



টুইলারিজ অবরোধ—১০ই আগস্ট ১৭৯২

হল বিশ্বাসঘাতক রাজার উপর। জনতা রাজার প্রাসাদ **টুইলারিজ (Tuileries) আক্রমণ** করল। রাজার রক্ষীরা রাজাকে রক্ষা করা দূরে থাকুক বিপ্লবীদের দলে যোগ দিল। জনতার হাতে রাজা হলেন বন্দী। এই সময়ে জেকোবিন নেতা **ড্যাণ্টন** জনতার কাজে সমর্থন জানাবার ফলে খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন।

টুইলারিজ আক্রমণ

ড্যাণ্টন

আগষ্টের এই বিদ্রোহ যখন চলছে, তখন ফ্রান্স শাসন করছিল নতুন গঠনতন্ত্র অনুযায়ী গঠিত ফ্রান্সের লেজিসলেটিভ এসেম্বলি। এখন রাজার বিচার করার জন্য নতুন একটি এসেম্বলি গঠন করা হল। এই এসেম্বলিটির নাম হল—কনভেনশন (২১শে সেপ্টেম্বর, ১৭৯২—২৬শে অক্টোবর, ১৭৯৫)।

কনভেনশন

[The Convention]

এই সভার প্রথম কর্তব্য হল রাজতন্ত্র সম্পর্কে কর্তব্য-নির্দেশ করা। রাজার বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে জনসাধারণের ঘৃণা তখন খুব প্রবল এবং রাজার উপর কনভেনশনের সভ্যদের তখন আর আস্থার লেশমাত্রও অবশিষ্ট নাই।

কনভেনশন সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব নিল যে, ফ্রান্সে চিরতরে রাজতন্ত্রের অবসান ঘোষণা করা হল। কনভেনশনের ভিতরে ডেপুটিরা এই ঘটনা উপলক্ষে হর্ষোৎসবে মেতে উঠল; বাইরে জনতা এই খবরে উল্লাসে ফেটে পড়ল। চারিদিকে ধ্বনি উঠল—প্রজাতন্ত্র দীর্ঘজীবী হোক!

রাজতন্ত্রের অবসান ঘোষণা

রাজতন্ত্রের অবসান ঘোষণা করা হল। কিন্তু আর একটি অত্যন্ত জরুরী বিষয় সম্পর্কেও কনভেনশনকে সিদ্ধান্ত নিতে হল। বিদেশীর আক্রমণ থেকে ফ্রান্সকে কি করে বাঁচানো যায়—সেইটি হল এখন প্রধান সমস্যা। অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার আগমনের প্রতীক্ষায় যে সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল সামন্তপ্রভু ও যাজক দিন গুণছিল তাদের ধ্বংস করার কাজটিকে তাদের প্রাধান্য দিতে হল। প্যারিসের জনতা এই কাজেও হল অগ্রণী। তারা জেলে প্রবেশ করে (এই সময়ে প্রতিক্রিয়াশীল নেতারা এই জেলে বন্দী ছিলেন) প্রায় এক হাজার বন্দীকে হত্যা করল।

বিদেশী আক্রমণরোধে কনভেনশনের ভূমিকা

সঙ্গে সঙ্গে চলল অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধ। যুদ্ধে কনভেনশন যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করল। উৎসাহী বিপ্লবীরা বলতে লাগল—এখন বিপ্লবীদের অন্য দেশের উৎপীড়িতদেরও মুক্তির কাজে এগিয়ে যেতে হবে। কনভেনশন এই মর্মে একটি আইন পাস করল। এই আইনে ইওরোপের সকল দেশের জনগণের উদ্দেশে সকল দেশের ভাষাতে জানানো হল—রাজা ও সামন্তদের অত্যাচার থেকে যারাই মুক্তি পেতে চায় তাদেরই সাহায্য করার জন্য ফ্রান্সের বিপ্লবী বাহিনী আত্মনিয়োগ করতে প্রস্তুত।

মুক্তির দূত—ফরাসী জাতীয় বাহিনী

কনভেনশনের আর একটি বড় কাজ বাকি ছিল। সেটি হল রাজার বিচার। রাজার বিচার করতে দেরি হল না। অধিকাংশের ভোটে স্থির হল রাজা দেশের শত্রু, তাই তাঁর একমাত্র শাস্তি—মৃত্যু। ১৭৯৩ সালের ২১শে জানুয়ারী রাজা ষোড়শ লুইকে গিলোটিনের নীচে দাঁড় করানো হল। গিলোটিনের ধারাল ফলকটি রাজার মাথাটি ধড় থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিল। লুইয়ের প্রাণহীন ধড়টি লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

রাজার বিচার

রাজার প্রাণদণ্ড

রাজার শিরশ্ছেদের ঘটনাটি বিদেশে, বিশেষ করে, অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া,

এমন কি ইংলণ্ডে রাজতন্ত্রকে আতঙ্কিত করে তুলল। তারা ফরাসী বিপ্লবকে ধ্বংস করার জন্য একযোগে চেষ্টা করতে লাগল। কাজেই কনভেনশনের সামনে বাইরে থেকে বৃহত্তর আক্রমণের সম্ভাবনা একটা মস্ত বিপদ হিসাবে দেখা দিল।



গিলোটিন

ফ্রান্সের ভিতরেও যে বিপদ ছিল না তা নয়। রাজতন্ত্রের সমর্থকরা বিপ্লবকে ধ্বংস করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠল। বিপ্লবীদেরও একটি অংশ রাজতন্ত্রবাদীদের সঙ্গে হাত মেলাল।

আইনসভায় এবং পরে কনভেনশনে বিপ্লবীদের মধ্যে দুটো দল ছিল। একটি দলকে বলা হত **গিরোণ্ডিস্ট**। আর একটি দলকে বলা হত **জেকোবিন**। গিরোণ্ডিস্টরা ছিলেন নরমপন্থী। জেকোবিনরা ছিলেন চরমপন্থী। গিরোণ্ডিস্টরা সাহায্য পেতেন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের কাছ থেকে। আর জেকোবিনরা প্যারিসের জনতার সাহায্য নিয়ে শক্তি-শালী হয়ে উঠেছিল। গিরোণ্ডিস্টদের নেতা ছিলেন **ম্যাডাম রোঁলা**। জেকোবিনদের নেতা ছিলেন ড্যাণ্টন, ম্যারাট ও রোবেস্পীয়র।

গিরোণ্ডিস্ট দল ও জেকোবিন দল

কনভেনশনের যুগে প্যারিসের জনতার সাহায্য পেয়ে জেকোবিনরাই প্রধান হয়ে উঠলেন। নরমপন্থী গিরোণ্ডিস্টরা জনপ্রিয়তা হারালেন। তাঁরা জেকোবিনদলের একনায়কত্ব ধ্বংস করার জন্য দক্ষিণ ফ্রান্সে ষড়যন্ত্র আরম্ভ করলেন।

জেকোবিন দলের একনায়কত্ব

কাজেই ভিতরের ষড়যন্ত্র ও বাইরের আক্রমণ—দু দিক থেকেই দেখা গেল বিপদ। এই দু রকমের বিপদ থেকে বিপ্লবকে রক্ষা করার জন্য জেকোবিনরা ফ্রান্সে কঠোর শাসন আরম্ভ করল। এই শাসনকে 'সন্ত্রাসের রাজত্ব' (Reign of Terror) বলা হয়ে থাকে।

সন্ত্রাসের রাজত্ব (Reign of Terror) : সন্ত্রাসের রাজত্ব চালাবার জন্য একটি উপযোগী সংগঠন গড়ে তোলা হল। প্রথমেই গঠন করা হল একটি 'জননিরাপত্তা সমিতি'। এই সমিতির কাজে সাহায্য করার জন্য পাস করা হল 'সন্দেহ আইন'। এই আইন সন্দেহজনক ব্যক্তিমাত্রকেই বন্দী করার ক্ষমতা উপরোক্ত সমিতিকে অর্পণ করল। এই সন্দেহজনক ব্যক্তিদের বিচারের জন্য 'বিপ্লবী আদালত' (Revolutionary Tribunal) প্রতিষ্ঠা করা হল। এই আদালত প্রায় ২,৬০০ লোককে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেছিল। লিওন শহরটি গিরোণ্ডিস্টদের সাহায্য করায় সেখানকার প্রায় ৪ হাজার অধিবাসীকে হয় গুলির আঘাতে নয় নদীতে ডুবে মরতে হয়েছিল।

জননিরাপত্তা সমিতি

সন্দেহ আইন

বিপ্লবী আদালত

সন্ত্রাসের রাজত্বের যুগে, জেকোবিনদের প্রধান নেতা ছিলেন **রোবেস্‌পীয়র**। নির্ভীক, সৎ ও দেশপ্রেমিক বলে তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। জনতার তিনি ছিলেন সবচেয়ে প্রিয় নেতা। তাঁর ধারণা ছিল এই সন্ত্রাসের রাজত্ব ছাড়া ফ্রান্সে পুণ্যের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। রোবেস্‌পীয়রের প্রধান কৃতিত্ব হল : তিনি ক্ষমতা পেয়ে ভিতরে প্রতিক্রিয়ার ষড়যন্ত্র যেমন কঠোর হস্তে দমন করলেন, তেমনি তিনি বিদেশের আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের দেশের সীমান্ত থেকে বিতাড়িত করলেন।

রোবেস্‌পীয়র



রোবেসপীয়র

কনভেনশনের নেতারা নতুন এক সমাজ-বিপ্লবেরও প্রবর্তন করতে চাইলেন।

বিপ্লবীরা ক্যাথলিক চার্চকে প্রতিক্রিয়ার স্তম্ভ হিসাবে দেখেছিল। তাই তারা ক্যাথলিক চার্চের, এমন কি খ্রীষ্টান ধর্মেরই ধ্বংস করতে অগ্রণী হল। প্যারিস শহর ও অন্যান্য জায়গায় চার্চের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হল। খ্রীষ্টধর্ম কুসংস্কার ও দেশদ্রোহিতার সহায়ক

কনভেনশনের কাজ

বলে নিন্দাবাদ আরম্ভ হল। খ্রীষ্টানধর্ম যাতে জনসাধারণের স্মৃতি থেকে একেবারে মুছে যায় সেই উদ্দেশ্য নিয়ে বিপ্লবের বছর থেকে নতুন বর্ষ গণনা পর্যন্ত আরম্ভ হল। খ্রীষ্টধর্মকে পরিত্যাগ করে স্বদেশপ্রেম, সাম্য ও মৈত্রী—এই তিন মহামন্ত্র নিয়ে গড়ে তোলা হল নতুন এক মানবধর্ম।

এই 'সন্ত্রাসের রাজত্ব' বিপ্লবকে রক্ষা করল বটে কিন্তু ক্রমশ এই রাজত্ব অন্তর্বিরোধের ফলে দুর্বল হয়ে পড়ল। জেকোবিনদের মধ্যেই কেউ কেউ এই সন্ত্রাস বন্ধ করার কথা তুললেন। জেকোবিন-নেতা ড্যান্টন এই কথা বলায় সন্দেহভাজন হয়ে উঠলেন। তাঁকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হল। শেষে সন্ত্রাসের রাজত্ব সম্পর্কে অনেকের মনে দেখা দিল অবসাদ। এমন কি, রোবেস্‌পীয়রের জনপ্রিয়তায় ভাঁটা পড়ল। শেষে তাঁকেই সন্ত্রাসের রাজত্বের জন্য দায়ী বলে দোষারোপ করা হতে লাগল। অবশেষে কনভেনশনের নির্দেশে তাঁকেও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হল।

জেকোবিনদলের আধিপত্য হ্রাস

রোবেসপীয়রের প্রাণদণ্ড

রোবেস্‌পীয়রের প্রাণদণ্ডের পর থেকে বিপ্লবের শক্তি আস্তে আস্তে নিস্তেজ হয়ে গেল। এইভাবে শেষ হয়ে গেল ইওরোপের ইতিহাসের যুগান্তকারী এক ঘটনা।

ফরাসী বিপ্লবের গুরুত্ব

[Significance of the French Revolution]

ফরাসী বিপ্লব পৃথিবীর ইতিহাসে এক অনন্যসাধারণ ঘটনা। এই বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সের জনসাধারণ মুক্তির আস্বাদন লাভ করেছিল। ফরাসী বিপ্লবের মর্মবাণী গ্রথিত ছিল তিনটি মহামন্ত্রে—Liberty, Equality, Fraternity.

স্বাধীনতা (Liberty) কথাটির অর্থ হল : রাষ্ট্র কোন রাজার মর্জির উপর নির্ভরশীল নয়, রাষ্ট্রের ভিত্তি হল জনসাধারণের সম্মতি। নাগরিক মাত্রেরই কতকগুলি মৌলিক অধিকার, যেমন, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, ধর্মাচরণের স্বাধীনতা, সম্পত্তি রাখার স্বাধীনতা ইত্যাদি রাষ্ট্র মেনে নিতে বাধ্য।

সাম্য (Equality) কথাটির অর্থ : সামন্ততান্ত্রিক ভূমিদাস প্রথার অবসান, ব্যক্তি মাত্রেরই সমান অধিকার, আইনের চোখে ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে প্রত্যেকেরই সমান অধিকার।

মৈত্রী (Fraternity) কথাটির অর্থ : যারাই অধিকতর সুন্দর ও সুখী পৃথিবী রচনার আদর্শ নিয়ে এগুতে চায় তাদের মধ্যে চাই বন্ধুত্ব, চাই মৈত্রী।

ফরাসী বিপ্লব দুনিয়ার সামনে তুলে ধরল সাম্য, মৈত্রী ও জাতীয় স্বাধীনতার উজ্জ্বল আদর্শ। ক্রমশ ফরাসী দেশের সীমান্ত অতিক্রম করে সাম্য, মৈত্রী ও জাতীয় স্বাধীনতার এই আদর্শটি সমগ্র ইওরোপকে অনুপ্রাণিত করে তুলল। দূরদূরান্তরের মুক্তিকামী জনসাধারণের সম্মুখে এই আদর্শটি এক নতুন দিগন্ত উন্মুক্ত করে দিল। প্রকৃতপক্ষে, ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব ছিল বিশ্বব্যাপী এবং সুদূরপ্রসারী।

[৩]

ফরাসী বিপ্লব ও নেপোলিয়ন

(French Revolution and Napoleon)

ফরাসী বিপ্লব যখন শেষ অধ্যায়ে এসে পৌঁছেছে, বিপ্লবের আগুন যখন নির্বাপিত-প্রায়, ঠিক সেই সময়ে বিপ্লবের রথে চড়েই ইতিহাসের মঞ্চে এসে আবির্ভূত হলেন নেপোলিয়ন। ফরাসী বিপ্লব যদি না হত, তাহলে নেপোলিয়নেরও আবির্ভাব সম্ভব হত না—একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

বংশ পরিচয়

নেপোলিয়নের না-ছিল বংশগৌরব, না-ছিল টাকার জোর। ফ্রান্সের অধীন একটি দ্বীপে কর্শিকায় তাঁর জন্ম হয়েছিল। কিন্তু বিপ্লবের যুগে বংশ-মর্যাদার জোর কমে এসেছিল। যোগ্যতা থাকলে অত্যন্ত সাধারণ ঘরে জন্মেও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ দেখা দিয়েছিল। বস্তুত, ফরাসী বিপ্লবের যাঁরা নেতা তাঁদের কারোই বংশ-মর্যাদার জোর ছিল না ; জোর ছিল ব্যক্তিগত প্রতিভার। এই রকমের অত্যন্ত প্রতিভাসম্পন্ন এক ব্যক্তি ছিলেন নেপোলিয়ন। তাই বংশ-মর্যাদার

জোর না থাকলেও নিজের প্রতিভার জোরেই তিনি ইতিহাসে নিজের আসন জোগাড় করে নিলেন।

টুঁলোতে প্রতিবিপ্লবী ষড়যন্ত্র দমন

কনভেনশনের আমলে নেপোলিয়ন এসে বিপ্লবী সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিলেন। ১৭৯৩ সালে টুঁলোতে যখন প্রতিবিপ্লবীরা ষড়যন্ত্র করছিল, তখন নেপোলিয়নকে এই প্রতিবিপ্লব দমন করার জন্য পাঠানো হয়েছিল। এই প্রতিবিপ্লব দমনে যোগ্যতা দেখিয়ে তিনি সেদিন ফরাসী জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।

বিদেশী আক্রমণ রোধে নেপোলিয়নের ভূমিকা

এই সময়ে নেপোলিয়নের বয়স ২৬ বছর মাত্র। বিপ্লবীদের প্রিয় সহচর, এমন কি জেকোবিন দল ও রোবেস্‌পীয়রের সমর্থক বলেও সেদিন তিনি পরিচিত হয়েছিলেন। ফ্রান্সের ভিতরে প্রতিবিপ্লবীরা এই সময়ে যেমন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল তেমনি বিপ্লবের শক্তিকে ধ্বংস করার জন্য বাইরে থেকে অস্ট্রীয়া ও প্রাশিয়া বার বার চেষ্টা করতে লাগল। বিদেশী আক্রমণকারীদের পরাজিত করার জন্য কনভেনশন নেপোলিয়নকে নিয়োগ করেছিল।



নেপোলিয়ন

নেপোলিয়নের রাজ্যজয়

(Conquests of Napoleon)

তালী অভিযান

উচ্চাকাঙ্ক্ষী নেপোলিয়ন এটিকে সুযোগ বলেই মনে করলেন। অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে তিনি সেনাপতি নির্বাচিত হলেন। অস্টিয়ার ক্ষমতাশ্রিত ইতালী তিনি আক্রমণ করলেন। ফরাসী সেনাবাহিনীর মধ্যে বিপ্লবী চেতনা তখনও একেবারে নিভে যায় নি। কিন্তু অস্ত্রশস্ত্র, সাজসজ্জায় তারা তখন অত্যন্ত দুর্বল। তিনি এই সেনাবাহিনীর

মনে জাতিগর্ব জাগিয়ে তুললেন। তারা নেপোলিয়নকে নিজেদের প্রিয় সেনাপতি হিসাবে বরণ করে নিল।

নেপোলিয়নের সৈন্যদের অগ্রগমন বন্ধ করতে পারে এমন বৈষয়িক বা নৈতিক শক্তি অস্ট্রীয়ার তখন ছিল না। তাই নেপোলিয়ন ঝড়ের বেগে এগিয়ে গিয়ে অস্ট্রীয়াকে উত্তর ইতালী থেকে বিতাড়িত করলেন। আল্পস্ পর্বত অতিক্রম করে দক্ষিণ জার্মানীতেও তিনি অবতরণ করলেন। অস্ট্রীয়া রাইন নদীর তীর পর্যন্ত ফ্রান্সের সীমানা বলে মেনে নিয়ে সন্ধি ভিক্ষা করল (১৭৯৭ খ্রীঃ)।

ইতালী বিজয়ের পরে নেপোলিয়ন যখন ফ্রান্সে ফিরে এলেন, তখন ফ্রান্সের জনসাধারণ নেপোলিয়নকে বিপুল অভ্যর্থনা জানাল। কিন্তু নেপোলিয়ন প্যারিসে নিজেকে আটক রাখতে চাইলেন না। তিনি আরও গৌরবের জন্য অধীর হয়ে উঠলেন।

মিশর অভিযান

ইংলণ্ড সম্পর্কে নেপোলিয়নের ঘৃণা ছিল বরাবর। তিনি ইংলণ্ডকে 'দোকানদারের জাত' (A Nation of Shop-Keepers) বলে অভিহিত করতেন। ইংলণ্ড সারা প্রাচ্যে কর্তৃত্ব করছে—এটা ছিল তাঁর বিরক্তির কারণ। তিনি ভাবলেন—ইংলণ্ডের উপনিবেশগুলি আক্রমণ করা প্রয়োজন। সেই উদ্দেশ্যে তিনি প্রথম মিশর আক্রমণ করলেন। মিশরে তিনি কয়েকটি যুদ্ধে জয়লাভ করলেন। কিন্তু নেপোলিয়নের একটা দুর্বলতা ছিল। ফ্রান্স ছিল ইংলণ্ডের চেয়ে নৌ-শক্তিতে অনেক ছোট। সেইজন্য **নেলসনের** নেতৃত্বে ইংলণ্ড মিশরে যে নৌ-বাহিনী পাঠাল, তার কাছে নেপোলিয়নকে পরাজয় স্বীকার করতে হল।

ফ্রান্সে আভ্যন্তরীণ গোলযোগ: ডাইরেক্টরী শাসন

মিশর থেকে পালিয়ে এসে নেপোলিয়ন দেখলেন—ফ্রান্সে ভারি গোলযোগ। কনভেনশনের পরে ফ্রান্সে যারা শাসন (এইটিকে 'ডাইরেক্টরী শাসন' বলা হত) করছিল, তাদের উপর জনসাধারণ বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিল। তাদের শাসনে নানা ধরনের দুর্নীতিপরায়ণতা দেখা দিয়েছিল। এইজন্য দেশের লোক ডাইরেক্টরী শাসনের পরিবর্তন চাইছিল।

কন্সালের শাসন: নেপোলিয়ন প্রথম কন্সাল

নেপোলিয়ন দেখলেন সুবর্ণ সুযোগ। তিনি অন্যান্যদের সঙ্গে একজোট হয়ে নতুন গঠনতন্ত্র প্রবর্তন করলেন

(১৭৯৯ খ্রীঃ)। নতুন গঠনতন্ত্রে তিনজন 'কন্সালে'র হাতে শাসনভার অর্পণ করা হল। নেপোলিয়ন হলেন প্রথম কন্সাল।

নিজেকে সম্রাট বলে নেপোলিয়নের ঘোষণা

দু বছর পরে নেপোলিয়ন দেখলেন তাঁর ক্ষমতা আরও বেড়েছে। তাই তিনি আর অপেক্ষা না করে নিজেকে যখন সম্রাট বলে ঘোষণা করলেন (১৮০২ খ্রীঃ) তখন জনসাধারণের বিরাট এক অংশ নেপোলিয়নের সম্রাট হবার পক্ষে সম্মতি জানিয়েছিল।

ফ্রান্সের অবিসংবাদী নেতা নেপোলিয়ন এখন সারা ইওরোপে প্রাধান্য বিস্তারের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলেন। অপ্রতিদ্বন্দ্বী এই সেনাপতির বিজয় অভিযানের পথ স্তব্ধ করতে পারে এমন শক্তি তখন ইওরোপে সত্যিই ছিল না।

তাঁর বিজয় অভিযানের মুখে যে দেশই পড়ল, সেই আত্মসমর্পণ করল। অস্ট্রীয়া, প্রাশিয়া, স্পেন, ইতালী, নেদারল্যাণ্ড, জার্মানী, পোল্যাণ্ড—একে

নেপোলিয়নের ইউরোপ বিজয়

একে সবাই বিজয়ী নেপোলিয়নের কাছে নোয়াল তাদের শির। ম্যারেঙ্গো, অস্টারলীজ, জেনা, ফ্রিডল্যাণ্ড, ওয়াগ্রাম ও লিপজিগের যুদ্ধগুলির কাহিনী নেপোলিয়নের বিজয় অভিযানের চিহ্ন বহন করে চলেছে।

পুরানো মানচিত্র মুছে দিয়ে নেপোলিয়ন রচনা করলেন ইওরোপের নতুন এক মানচিত্র।

নেপোলিয়নের পতন
[Downfall of Napoleon]

অল্পদিনে নেপোলিয়ন এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুললেন। কিন্তু এই সাম্রাজ্য ভেঙে পড়তেও বেশী সময় লাগে নাই।

নেপোলিয়নের পতনের মূলে ছিল তাঁর সীমাহীন উচ্চাকাঙ্ক্ষা। নেপোলিয়ন সাম্রাজ্য গড়ার নেশায় একটির পর একটি ইওরোপের রাজ্য জয় করেছিলেন। যে দেশগুলি তিনি জয় করলেন তাদের স্বাধীনতা-কামনাকে তিনি আমল দিলেন না। কাজেই নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে দেশে দেশে আরম্ভ হল জাতীয় অভ্যুত্থান। সুযোগ বুঝে এই বিক্ষুব্ধ দেশগুলির নেতৃত্বে এগিয়ে এল নৌ-শক্তিতে বলীয়ান ইংলণ্ড।

তাই নেপোলিয়নের পতনের সঙ্গে যে কয়টি প্রধান ঘটনা জড়িত সেগুলি হল—

(১) ইংলণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধ
(২) স্পেনের জাতীয় অভ্যুত্থান
(৩) রুশ অভিযান
(৪) জার্মানীতে মুক্তিযুদ্ধ
(৫) নেপোলিয়ন-বিরোধী জোট গঠন

নেপোলিয়ন ও ইংলণ্ড (Napoleon & England): নেপোলিয়নের সামনে মাথা নোয়াল না ইওরোপের একটি মাত্র দেশ—সেটি ইংলণ্ড। নৌ-শক্তিতে ইংলণ্ড ছিল শ্রেষ্ঠ। নৌ-শক্তিতে প্রাধান্যের জন্যই ইংলণ্ড নীলনদের যুদ্ধে নেপোলিয়নকে পরাজিত করতে সক্ষম হয়েছিল। তারপর ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়নের স্থলবাহিনীর সামনে ইওরোপ যখন কম্পমান ঠিক সেই সময়েই **নেলসনের** কাছে নেপোলিয়নকে আবার পরাজয় স্বীকার করতে হল। স্পেনের দক্ষিণ উপকূলে **ট্রাফালগারের নৌ-যুদ্ধে** নেপোলিয়নকে পরাজয় মেনে নিতে হয়েছিল।

ট্রাফালগারের নৌ-যুদ্ধ

নেপোলিয়ন ইংলণ্ডকে সহজে ছেড়ে দেবার পাত্র ছিলেন না। তিনি ইংলণ্ডকে জব্দ করতে চাইলেন তার সওদাগরীর পথটা বন্ধ করে দিয়ে। এই উদ্দেশ্যে তিনি ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে বার্লিন ডিক্রী (Berlin Decree) জারি করলেন। তিনি ইওরোপের রাষ্ট্রগুলিকে নির্দেশ দিলেন—ইংলণ্ডের কোন পণ্যদ্রব্য ইওরোপের কোন বন্দরে নামানো চলবে না। তারপরে ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে মিলান ডিক্রী (Milan Decree) জারি করে তিনি ঘোষণা করলেন—কোন নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের জাহাজও যদি ব্রিটেনের বন্দর থেকে অথবা ব্রিটিশ অধিকৃত স্থান থেকে যাত্রা করে, তাহলে নেপোলিয়ন ও তাঁর মিত্রগোষ্ঠী সেগুলিকে আটক করবে। এইভাবে নেপোলিয়নের নির্দেশে ইওরোপ ইংলণ্ডের পণ্যদ্রব্য আমদানি বন্ধ করল।

কন্টিনেন্টাল সিস্টেম

ইংলণ্ডও নেপোলিয়নের এই অর্থনৈতিক অবরোধ নীতি ব্যর্থ করে দেবার সংকল্প গ্রহণ করল। সে আদেশ জারি করল যে কোন জাহাজ ফ্রান্স বা তার মিত্রগোষ্ঠীর সঙ্গে বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপন করলে ইংলণ্ড তাদের আক্রমণ করবে।

নেপোলিয়ন প্রবর্তিত এই ব্যবস্থাটি মহা-ইওরোপীয় ব্যবস্থা বা 'কন্টিনেণ্টাল সিস্টেম' (Continental System) নামে পরিচিত। কিন্তু এই ব্যবস্থা বেশীদিন চালানো সম্ভব হল না। ইওরোপের দেশগুলি —বিশেষ করে রাশিয়া এই নির্দেশ মানল না। একে একে অন্যান্য রাষ্ট্র-গুলিও এই ব্যবস্থা নিজেদের স্বার্থের পরিপন্থী বুঝে এই কাজে সহযোগিতা করল না। ইংলণ্ডের শক্তি নষ্ট করতে নেপোলিয়ন এবারও ব্যর্থ হলেন। শুধু এখানেই নয়, সব দিক থেকেই নেপোলিয়নের ভাগ্যলক্ষ্মী যেন অপ্রসন্ন হতে লাগল।

স্পেনে জাতীয় অভ্যুত্থান (The National Upheaval in Spain) ঃ এই সময়ে স্পেনও নেপোলিয়নকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল। স্পেনের রাজারা এতদিন নেপোলিয়নকে স্বীকার করে নিয়েছিল। কিন্তু এই সময়ে স্পেনে নেপোলিয়ন একটি আভ্যন্তরীণ গোলযোগের গন্ধ পেলেন। তাই তিনি এই সুযোগে স্পেন দেশটাকে সরাসরি জয় করে নেবার কথা ভাবলেন। স্পেন দখল করতে পারলে ব্রিটেনের সঙ্গে নৌ-যুদ্ধেও তাঁর সুবিধা হত। কিন্তু এখানে এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটল।

স্পেনে নেপোলিয়ন বিরোধী মুক্তি-যুদ্ধ

নেপোলিয়ন স্পেন জয় করে তাঁর ভাই জোসেফ বোনাপার্টকে স্পেনের সিংহাসনে বসালেন। কিন্তু স্পেনের জনসাধারণ দেশের স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে রাজী হল না কিছুতেই। স্পেনের দেশপ্রেমিকদের নেতৃত্বে স্পেনীয়রা চালাতে আরম্ভ করল নেপোলিয়ন-বিরোধী এক মুক্তি-যুদ্ধ। ইংলণ্ডও সুযোগ বুঝে স্পেনের মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন জানাল। ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী লর্ড ক্যানিং স্যার আর্থার ওয়েলেসলীর নেতৃত্বে স্পেনকে সাহায্য করার জন্য এক সেনাবাহিনী পাঠালেন। এই সেনাবাহিনী স্পেনের মুক্তি-যোদ্ধাদের সঙ্গে হাত মেলাল। ফলে, দীর্ঘস্থায়ী (১৮০৮-১৮১৩) এক যুদ্ধ চলল। এইটি **পেনিনসুলার যুদ্ধ** বলে পরিচিত। এই যুদ্ধের শক্তি ক্রমশ এত প্রবল আকার ধারণ করল যে দুর্ধর্ষ নেপোলিয়নকেও হার মানতে হল।

রুশ অভিযান (The Russian Expedition) ঃ ঠিক এই সময়ে নেপোলিয়ন আরও একটা বড় বাধার সম্মুখীন হলেন রাশিয়ায়। ১৮০৭

খ্রীষ্টাব্দে টিলসিটের সন্ধিতে রাশিয়ার জার প্রথম আলেকজাণ্ডার নেপোলিয়নকে কন্টিনেণ্টাল ব্যবস্থা প্রবর্তনে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু এই ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণ করায় রাশিয়ার জাতীয় স্বার্থ বিঘ্নিত হয়। রাশিয়ার জনসাধারণ আলেকজাণ্ডারকে এই নীতি পরিবর্তন করতে বাধ্য করে। জার আলেকজাণ্ডার যখন পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কন্টিনেণ্টাল ব্যবস্থা সমর্থন করলেন না তখন নেপোলিয়ন জারের উপর রাগান্বিত হলেন। নেপোলিয়ন এক বিরাট বাহিনী নিয়ে রাশিয়া অভিযানে অগ্রসর হলেন। রাশিয়ার অধিবাসীরা নেপোলিয়নের সঙ্গে যুদ্ধ না করে পিছিয়ে যেতে লাগল। এমন কি মস্কো রক্ষার জন্যও তারা সংগ্রাম করল না। নেপোলিয়ন মৃতপুরী মস্কোর মধ্যে ঢুকলেন। এদিকে মস্কোতে তখন দারুণ শীত। তাঁকে পিছু হটতে হল। একে প্রচণ্ড শীত, তার উপর রাশিয়ার গেরিলা সৈন্যরা পথে তাঁকে আক্রমণে আক্রমণে অস্থির করে তুলল। নেপোলিয়ন অসাফল্য অনিবার্য বুঝে অধিকাংশ সৈন্যকে পথে ফেলে রেখে প্যারিসে ফিরে এলেন। রুশ অভিযানে ব্যর্থতা নেপোলিয়নের জীবনের ট্রাজেডিকে ত্বরান্বিত করে তুলল।

রুশ অভিযানের ব্যর্থতা

জার্মানীতে মুক্তিযুদ্ধ (The German War of Libertion) ঃ ক্রমশ জার্মানীতেও জাতীয় অভ্যুত্থান দেখা গেল। জার্মানী তখন বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত ছিল। কিন্তু জার্মানীর প্রত্যেকটি অংশের উপরেই নেপোলিয়ন আধিপত্য বিস্তার করেন। জার্মানীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে প্রধান ছিল প্রাশিয়া। প্রাশিয়া সমস্ত জার্মানীকে নেপোলিয়ন-বিরোধী মুক্তিযুদ্ধে সমবেত হতে জানাল। সমগ্র জার্মানী প্রাশিয়ার আহ্বানে সাড়া দিল। নেপোলিয়ন-বিরোধী মুক্তিযুদ্ধ ক্রমশ জার্মানীতে দুর্বার গতিতে অগ্রসর হল।

নেপোলিয়ন-বিরোধী জোট গঠন (The Coalition Against Napoleon) ঃ আস্তে আস্তে নেপোলিয়ন-বিরোধী শক্তিগুলি একসঙ্গে মাথা তুলে দাঁড়াল। প্রাশিয়া, অস্ট্রিয়া, রাশিয়া, সুইডেন এবং ইংলণ্ড নেপোলিয়ন-বিরোধী একটি জোট গঠন করল। এই জোটের সঙ্গে নেপোলিয়নকে এখন শক্তি-পরীক্ষায় নামতে হল। নেপোলিয়নের ভাগ্য-পরিবর্তন দেখে অনেক ফরাসী সেনাপতির মনে এই সময়ে দ্বিধা দেখা দিয়েছিল। অথচ এদের নিয়েই নেপোলিয়নকে যুদ্ধ চালাতে হল। **লিপজিগের যুদ্ধে**

মিলিত জোটের কাছে নোপোলিয়নের পরাজয়

(১৮১৩) নেপোলিয়ন মিলিত জোটের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হলেন। কিন্তু তিনি পরাজয় স্বীকার করে নেওয়ার পাত্র ছিলেন না। তাই যুদ্ধ চলতে থাকল। মিলিত জোট অবশেষে ফ্রান্সে প্রবেশ করল এবং প্যারিস দখল করে নিল। নিরুপায় হয়ে নেপোলিয়ন ফ্রান্সের কর্তৃত্ব থেকে অবসর গ্রহণ করলেন। তাঁকে এলবা দ্বীপে গিয়ে বসবাস করতে অনুমতি দেওয়া হল।

এলবা দ্বীপে নির্বাসন

কিন্তু নেপোলিয়ন এখনও নিজের পরাজয়কে চূড়ান্ত বলে স্বীকার করে নিলেন না। তিনি জানতেন ফ্রান্সের জনসাধারণ তাঁর প্রতি এখনও সুপ্রসন্ন এবং তিনি ফিরে গেলে আবার অভ্যর্থনা করে নেবে তারা। তাই তিনি এলবা থেকে ফ্রান্সে আবার ফিরে এলেন। জনসাধারণ তাঁকে সত্যিই অভ্যর্থনা করে ঘরে তুলে নিল।

এলবা থেকে প্রত্যাবর্তন

নেপোলিয়ন ফিরে এসে আবার গড়ে তুললেন নতুন এক সেনাবাহিনী এবং চরম পরীক্ষায় অবতীর্ণ হলেন পুনর্বার মিলিত জোটের বিরুদ্ধে। কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মী এবারও অপ্রসন্ন হল। **ওয়াটার্লুর যুদ্ধে** নেপোলিয়ন ইংলণ্ডের সেনাপতি ওয়েলিংটনের হাতে চূড়ান্তভাবে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হলেন। মিলিত জোট আবার ফ্রান্সে এসে প্রবেশ করল ও প্যারিস দখল করল। নেপোলিয়ন হলেন তাদের হাতে বন্দী। এবারে নেপোলিয়নকে আফ্রিকার পশ্চিমে ১২০০ মাইল দূরে দক্ষিণ-অতলান্তিক সাগরে অবস্থিত সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে নির্বাসিত করা হল।

ওয়াটার্লুর যুদ্ধ

সেণ্টহেলেনা দ্বীপে নির্বাসন

নেপোলিয়ন সেণ্ট হেলেনায় যখন নির্বাসিত হলেন, তখন তাঁর বয়স মাত্র ৪৬ বৎসর। এই দ্বীপে বসবাসকালে সংকীর্ণচিত্ত ইংরেজ গভর্নর নেপোলিয়নের সঙ্গে নানা বর্বরোচিত ব্যবহার করেছিল। তবে এই দুর্দশার মধ্যে নেপোলিয়নকে বেশী দিন বাস করতে হয় নাই। ৫১ বছর বয়সে বন্দী অবস্থায় নেপোলিয়নের প্রাণ-বায়ু নির্গত হয়।

নেপোলিয়নের সংস্কার

[Reforms of Napoleon]

নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য ভেঙে খান খান হয়ে গেল বটে, কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁর কীর্তি অক্ষয় হয়ে রইল।

নেপোলিয়ন এক সময়ে সমস্ত ফ্রান্সের জনসাধারণের আস্থা অর্জন করতে পেরেছিলেন। ইওরোপের অন্যান্য দেশেরও একটা অংশের মধ্যে তিনি প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিলেন। তার কারণ তিনি যুগধর্মকে উপেক্ষা করেন নাই।

নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য স্থায়ী হয় নাই বটে, তবে যে সমস্ত সংস্কার তিনি প্রবর্তন করেন, সেগুলি তাঁর পতনের অনেক দিন পরেও বর্তমান ছিল এবং অন্যান্য দেশও তাঁর এই সংস্কারগুলিকে বেশ কিছুদিন আদর্শস্থানীয় বলেই মনে করত।

সিভিল কোড

নেপোলিয়নের সবচেয়ে বড় কীর্তি হল তাঁর রচিত **'সিভিল কোড'** (Civil Code)। বিপ্লবের সময়ে অনেক আইন প্রবর্তন করা হয়েছিল। এই সমস্ত আইন প্রয়োজনের তাগিদে খুব তাড়াতাড়ি রচিত হয়েছিল। এই আইনগুলি ছিল অসম্পূর্ণ, এমন কি মাঝে মাঝে পরস্পর-বিরোধী। এই আইনগুলিকে পূর্ণতা দান করাই ছিল নেপোলিয়নের উদ্দেশ্য। তাঁর 'সিভিল কোডে'র মূলে ছিল এই গণতান্ত্রিক নীতি যে, আইনের চোখে প্রত্যেক মানুষ সমান। বংশ-কৌলীন্যের অবসান ঘোষণা করে তিনি অধিকারের সাম্য প্রতিষ্ঠা করলেন। তিনি বললেন—যার প্রতিভা আছে, তারই উন্নতির পথ খোলা থাকবে (career open to talent)। এই 'সিভিল কোড' অন্য দেশের আইনের উপরও প্রভাব বিস্তার করেছিল। ইতালী, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে উনবিংশ শতাব্দীতে এই আদর্শ অনুযায়ী আইন তৈরী হয়েছিল।

চার্চ ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক বিধানেও নেপোলিয়ন যুগধর্মী মনের পরিচয় দিলেন। ধর্মের প্রতি নেপোলিয়নের বিশেষ কোন অনুরাগ ছিল না। তিনি ধর্মকে দেখেছিলেন রাজনীতিকের দৃষ্টি থেকে। চার্চকে এমন কাজ তিনি করতে দিতে রাজী ছিলেন না, যাতে রাষ্ট্র ও আইনের শক্তি দুর্বল হয়ে পড়তে পারে।

চার্চের সঙ্গে চুক্তি : কনকরডাট

সেইজন্য তিনি ক্যাথলিক চার্চের সঙ্গে নিজের সুবিধামত শর্তে চুক্তি করলেন। এই চুক্তিটিকে বলা হয় **'কনকর্ডাট্'** (**Concordat**)। এই চুক্তি অনুযায়ী ক্যাথলিক চার্চের পদাধিকারীদের তিনি রাষ্ট্রের কর্তৃত্বে আনয়ন করলেন। বিপ্লবের সময়ে চার্চের যে সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া হয়েছিল নেপোলিয়ন তা ফিরিয়ে দিলেন না। তাছাড়া বিপ্লবের সময়ে ধর্মবিষয়ে স্বাধীনতার যে নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল সেটিও অক্ষুণ্ণ রইল।

তাঁর আর একটি কাজ হল শিক্ষা-সংস্কার। তিনি বিপ্লবের দৃষ্টিকোণ থেকে নতুন শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করলেন। এতকাল শিক্ষা দেবার ভার ছিল প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তাধারার প্রচারক ক্যাথলিক চার্চের উপর। নেপোলিয়ন ফ্রান্সে নতুন শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করলেন। শিক্ষার ভার চার্চের হাত থেকে কেড়ে নেওয়া হল এবং রাষ্ট্রকর্তৃত্বাধীন একশ্রেণীর শিক্ষালয় খোলা হল। এই শিক্ষালয়গুলিতে শিক্ষকের বেতন ও শিক্ষার পাঠ্যতালিকা স্থির করে দিল রাষ্ট্র। এক কথায়, ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থার নেপোলিয়নই ছিলেন পথ-প্রদর্শক।

শিক্ষা সংস্কার

ফ্রান্সের জনসাধারণ বিশেষ করে কৃষক সমাজ নেপোলিয়নের ছিল অনুরক্ত। তার কারণ নেপোলিয়ন সম্রাট বলে নিজেকে ঘোষণা করলেও তিনি সামন্ততন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন নি। কৃষকদের মধ্যে বিপ্লবের সময়ে যে জমি বণ্টন করে দেওয়া হয়েছিল, সেই জমি তিনি কৃষকের হাত থেকে কেড়ে নেন নি। ফরাসী বিপ্লবের মূল কর্মকাণ্ডকে ধ্বংস না করে বরং তাকে স্বীকার করে নিয়েই তিনি তাঁর শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। ইওরোপের বাইরে যে-সমস্ত দেশ তিনি জয় করেন সেখানেও তিনি উপরোক্ত প্রগতিশীল সংস্কারগুলি প্রবর্তন করেন। এইজন্য জনসাধারণের চোখে নেপোলিয়ন ছিলেন বিপ্লবেরই উত্তরসাধক। অবশ্য, নেপোলিয়নের সংস্কারের একটি প্রধান ত্রুটি ছিল ; তিনি ফরাসী বিপ্লবের সাম্যের মন্ত্রটিকে সমর্থন করলেও স্বাধীনতার মন্ত্রটিকে আমল দেন নাই। তিনি ফরাসীদের ব্যক্তি-স্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করেছিলেন। শুধু যারা তাঁর জয়গান করতে পারত তাদেরই স্বাধীনতা ছিল। এইদিক বিচার করে নেপোলিয়নকে আবার বিপ্লবের হত্যাকারী (Destroyer of the Revolution) বলা হয়ে থাকে। তবে দুর্বলতা সত্বেও বিপ্লবের অধিকাংশ নীতিকে তিনি মেনে নিয়েছিলেন বলে তাঁকে বিপ্লবের উত্তরসাধক বলে চিত্রিত করাই সংগত।

সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার বাণী ও নেপোলিয়ন

তৃতীয় অধ্যায়

শিল্প সভ্যতা

(Industrial Civilisation)

ইওরোপের জীবনে প্রতিভাত বড় বড় রাজনৈতিক পরিবর্তনগুলির কথা এর আগে বলা হয়েছে। উদাহরণ হিসাবে ইংলণ্ডের বিপ্লব (১৬৪৮ খ্রীঃ), আমেরিকার বিপ্লব (১৭৭৬ খ্রীঃ) এবং ফরাসী বিপ্লবের (১৭৮৯ খ্রীঃ) কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে, রাজনীতিক্ষেত্রে এই বড় বড় পরিবর্তনগুলি আকস্মিক ঘটনা নয়। একটা দেশের অর্থনীতি ও সমাজের অভ্যন্তরে আস্তে আস্তে যে পরিবর্তনের সূচনা হয়, রাজনীতিক পরিবর্তন তার বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার ক্ষয়িষ্ণুতা

এমন এক সময় ছিল যখন ইংলণ্ড, ফ্রান্স, প্রভৃতি দেশে সামন্ততন্ত্র ছিল সমাজের প্রধান ভিত্তি। এই সামন্ততন্ত্রের যুগে সামন্তপ্রভুরাই ছিল জমির মালিক। আর জমি যারা চাষ করত তারা ছিল সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত ভূমিদাস মাত্র। কৃষিই ছিল ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের জাতীয় সম্পদের একমাত্র উৎস। এই সময়ে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সভ্যতা ছিল আমাদের ভারতের মত কৃষিপ্রধান ও গ্রামকেন্দ্রিক। কিন্তু ক্রমশ কৃষি-কেন্দ্রিক, গ্রামকেন্দ্রিক এই সামন্ত-ব্যবস্থার ক্ষুদ্রতা, সংকীর্ণতা ও সীমাবদ্ধতা পরিস্ফুট হয়ে উঠতে লাগল। সামন্ততন্ত্রের জঠরের মধ্যেই উৎপাদনের নতুন নতুন পদ্ধতির উদ্ভব হতে আরম্ভ করল। সামন্ততন্ত্রের জঠরেই জন্ম নিল ছোট ছোট শিল্প। আর এই শিল্প-বিনিময়ের মধ্য দিয়ে আরম্ভ হল

বাণিজ্যের প্রসার : মধ্যবিত্ত শ্রেণী

বাণিজ্যের প্রসার। আগের দিনের সামন্তপ্রভু ও ভূমিদাসের মাঝামাঝি একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আবির্ভাব হল। বণিক, ক্ষুদ্র শিল্পের মালিক এবং শিল্প-বাণিজ্য পরিচালনার জন্য লেখাপড়া জানা একদল বুদ্ধিজীবী—এই নিয়ে তৈরি হল উপরোক্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণী। এরা শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্য দিয়ে

দেশের সম্পদ বাড়াতে লাগল। বাণিজ্যের নেশায় মধ্যবিত্তেরা দেশের এক অংশ থেকে আর এক অংশে, এক দেশ থেকে আর এক দেশে ঘুরে বেড়াত। সেইজন্য তাদের মধ্যে কুসংস্কারের বাধা ছিল কম; নব নব অভিজ্ঞতার ফলে তাদের মধ্যে কিছুটা উদারতা দেখা দিয়েছিল। অপেক্ষাকৃত উদার, পরিবর্তনপ্রিয় এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও পুরানো দিনের সংকীর্ণতাবাদী, পরিবর্তনবিমুখ সামন্তপ্রভু—এদের মধ্যে আরম্ভ হল বিরোধ। এক দিকে সামন্তপ্রভুরা, যারা পরিবর্তনের বিরোধী; আর এক দিকে মধ্যবিত্ত শ্রেণী, যারা পরিবর্তনের পক্ষপাতী। ইংলণ্ডে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী পরিবর্তন চাইল, আর সামন্তপ্রভুরা বাধা দিল। ফ্রান্সেও তাই। সামন্তপ্রভুদের বিরুদ্ধে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিদ্রোহ ফরাসী বিপ্লবেরও গোড়ার কথা।

ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংগ্রাম

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নেতৃত্বে ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে এই যে বিপ্লব হল, এই দুটি বিপ্লব দুটি দেশেরই সামন্ততান্ত্রিক সমাজে প্রচণ্ড আঘাত হানল। ইংলণ্ডে সামন্ততন্ত্র জখম হল; ফ্রান্সে সামন্ততন্ত্রের মূলোচ্ছেদ হল।

তাই বলে এই রাজনৈতিক বিপ্লবের ফলে রাতারাতি এই দুটো দেশ যে আধুনিক শিল্পোন্নত দেশে পরিণত হল, তা নয়। আধুনিক শিল্পোন্নত দেশে উন্নয়নের জন্য যে আধুনিক যন্ত্রশক্তির প্রয়োজন, যে আধুনিক উৎপাদন-ব্যবস্থার প্রয়োজন, তা তখনও গড়ে ওঠে নি। তাই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নেতৃত্বে সমাজে আমূল পরিবর্তন আনতে আরও কিছুটা সময় লেগেছিল।

ইংলণ্ডের শিল্প-বিপ্লব

(Industrial Revolution in England)

কৃষি শিল্পের কাছে প্রথম চূড়ান্তভাবে পরাজয় স্বীকার করেছিল ইংলণ্ডে।

প্রশ্ন উঠতে পারে—ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লবের প্রথম আবির্ভাব হল কেন?

ইংলণ্ডে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আবির্ভাব হয়েছিল মধ্যযুগের শেষে। ইংলণ্ডে বিপ্লবের পরবর্তী যুগে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ব্যবসায়ী বা

বণিকেরা হস্তচালিত যন্ত্রের সাহায্যে উৎপাদনেও কিছুটা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিল। তবুও এই বণিক ব্যবসায়ীরা যে যন্ত্র ব্যবহার করত তা আকারে ছিল খুব ছোট। মোট কথা, আজকের মত বড় বড় যন্ত্র, বড় বড় কারখানা, যেখানে হাজার হাজার শ্রমিক কাজ করছে সেই রকমের কিছুই অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত ইংলণ্ডে গড়ে ওঠে নি।

ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লবের প্রথম আবির্ভাব হল কেন?

কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের মধ্যে ইংলণ্ডের নৌ-শক্তির প্রাধান্যে এশিয়া ও আমেরিকায় ইংলণ্ডের একটি বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল এই সাম্রাজ্য থেকে প্রচুর অর্থ এই সময়ে ইংলণ্ডে আমদানি হয়েছিল। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে, এই সময়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারত-লুট-করা প্রচুর অর্থ ইংলণ্ডে পাঠাতে লাগল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইংলণ্ডস্থিত অংশীদারদের হাতে প্রচুর পুঁজি সঞ্চিত হতে লাগল। এই পুঁজি শিল্পোন্নয়নের কাজে নিয়োগের জন্য অপেক্ষা করে রইল। এই পুঁজির সদ্ব্যবহারের জন্য পুজিপতিরা উন্নততর যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের প্রয়োজন অনুভব করলেন।

প্রয়োজনের তাগিদ অনুযায়ী নতুন নতুন যন্ত্রপাতি আবিষ্কারে বৈজ্ঞানিকেরা মনোনিবেশ করলেন। ইংলণ্ডের শিল্পপতিরা এই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কর্তাদের পৃষ্ঠপোষক হয়ে উঠলেন। তাঁরা এই আবিষ্কারগুলিকে উৎপাদনের কাজে প্রয়োগ করলেন। ফলে উৎপাদন পদ্ধতিতে আমূল পরিবর্তন দেখা দিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংলণ্ডের আধা-সামন্ততান্ত্রিক, আধা-শিল্পকেন্দ্রিক জীবনে এক বিরাট আলোড়ন দেখা দিল। ইংলণ্ডে এই যে আলোড়ন শুরু হল তার জোয়ার চলল উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত।

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও যন্ত্রশিল্পের উদ্ভব

[Scientific Inventions and the Growth of Machine Industries

যে আবিষ্কারগুলির ফলে এই পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল তার কথা এখন সংক্ষেপে বলব।

প্রথমেই ধরা যাক বস্ত্র—শিল্পের কথা। মধ্যযুগে ইংলণ্ডে কুটির শিল্পের মধ্যে সূতা-কাটা ও বস্ত্র-বয়নই ছিল প্রধান।

বস্ত্রশিল্প

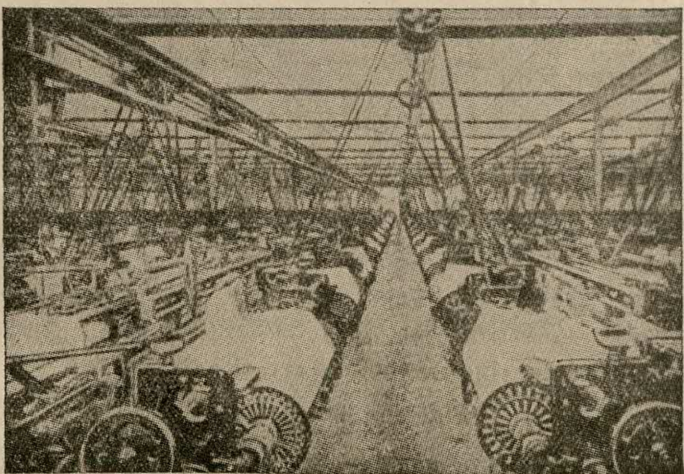


হস্তচালিত তাঁত

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে সূতা-কাটা ও বস্ত্র-বয়ন শিল্পের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখা গেল। ১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দে **জন্-কে** **'বৈজ্ঞানিক মাকু'** আবিষ্কার করলেন। এর পূর্বে মাকুর সূতা টানার সূতার মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে নিয়ে যেতে হত। ফলে প্রচুর সময় লাগত। এই নতুন আবিষ্কারের ফলে উৎপাদন দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেল।

বৈজ্ঞানিক মাকু

তখন অধিক সূতারও প্রয়োজন দেখা দিল। ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে **হার-**



আধুনিক তাঁতকল

গ্রিভস নামক এক ব্যক্তি **স্পিনিং জেনি** নামে এক যন্ত্র আবিষ্কার করলে এই সমস্যার কিছুটা সমাধান হল। তারপরে **আর্করাইটের 'ওয়াটার ফ্রেম', ক্রম্পটনের 'মিউল'** এবং **'কার্টরাইটের 'পাওয়ার লুম'** প্রভৃতি উন্নত প্রণালীর বস্ত্র-বয়ন ও সুতা-কাটা যন্ত্রের আবিষ্কার হওয়ায় যন্ত্রশিল্পে যুগান্তর উপস্থিত হল।

স্পিনিং জেনি

এই যুগে আর একটি অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার হল বাষ্পশক্তির ব্যবহার-রীতি। ১৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দে **জেম্‌স ওয়াট** সর্বপ্রথম **বাষ্পচালিত ইঞ্জিন** নির্মাণ করেন। এতদিন ইংলণ্ডের যন্ত্রপাতি ছিল জলশক্তি চালিত। এখন থেকে সেই যন্ত্রপাতি হল বাষ্পশক্তি চালিত। বাষ্পচালিত ইঞ্জিনের আবিষ্কারের ফলে কল-কারখানা চালাবার ব্যবস্থায় সুবিধা হল এবং ইংলণ্ডে প্রচুর পরিমাণে পণ্যদ্রব্য উৎপাদন আরম্ভ হল।

বাষ্পচালিত ইঞ্জিন



জেমস্ ওয়াট

বাষ্পচালিত কারখানাগুলিতে ব্যবহারের জন্য প্রচুর কয়লা ও লোহার প্রয়োজন হল। এই প্রয়োজন মেটাবার কাজেও বৈজ্ঞানিকেরা অগ্রণী হলেন। **হামফ্রী ডেভি** নামে জনৈক বৈজ্ঞানিক **সেফ্‌টি ল্যাম্প** আবিষ্কার করলেন। এই ল্যাম্প আবিষ্কারের ফলে কয়লাখনির শ্রমিকদের জীবনের নিরাপত্তা দৃঢ় হল। শ্রমিকদের কাজের সুবিধা হওয়ায় কয়লার উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি পেল।

কয়লা খনি ও সেফ্‌টি ল্যাম্প

তাছাড়া, পূর্বে লোহা গলাবার জন্য কাঠ-কয়লা ব্যবহৃত হত। নতুন আবিষ্কারের ফলে এখন থেকে পাথুরে কয়লার সাহায্যে লোহা গলাবার প্রণালী আবিষ্কৃত হল। কারখানার প্রয়োজনের চাপে ইস্পাত তৈরীর নতুন কৌশল আবিষ্কৃত হল। **হেনরি কর্টের** আবিষ্কার এই ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য।

এই সমস্ত আবিষ্কারের ফলে ইংলণ্ডে প্রথম লোহার তৈরী জাহাজ নির্মাণ করা সম্ভব হল।

যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি

এইভাবে নতুন নতুন আবিষ্কারের ফলে জিনিসপত্রের উৎপাদন যেমন বাড়তে থাকল, তেমনি দেশের মধ্যে এক অংশ থেকে আর এক অংশে অথবা দেশের বাইরে এই পণ্য চালান দেবার প্রয়োজন অনুভূত হল। এই প্রয়োজন মেটাতেও বৈজ্ঞানিকেরা অগ্রসর হলেন। রাজপথ নির্মাণে ও খাল খননে ইঞ্জিনিয়ারেরা নতুন নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন।

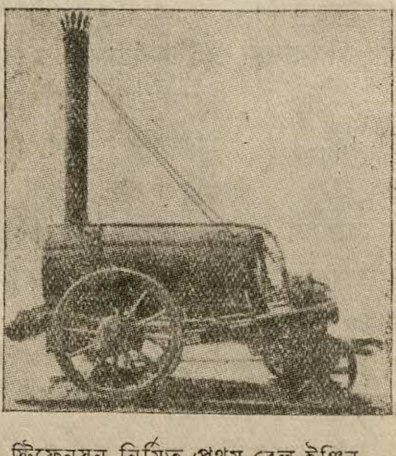


স্টিফেনসন

যাতায়াত ও মালপত্র চলাচলের সুবিধার জন্য **ব্রিণ্ডলে** নামক জনৈক বৈজ্ঞানিক কতকগুলি আধুনিক ধরনের খাল খনন করলেন। **টেলফোর্ড ও ম্যাক আডাম** পাকা রাস্তা তৈরি করার প্রণালী উদ্ভাবন করলেন। ম্যাক আডামের নাম অনুসারে পাকা রাস্তাকে 'ম্যাকাডামাইজ্‌ড রোড' বলা হয়ে থাকে।

বাষ্পচালিত পোত

জাহাজ চলাচলের ক্ষেত্রেও অভূতপূর্ব উন্নতি দেখা গেল। বাষ্পীয় শক্তির আবিষ্কারের পর থেকে **বাষ্পচালিত পোত** চলাচল শুরু করল (১৮১২ খৃঃ)। তার দুবছর পরে **স্টিফেনসন বাষ্পচালিত ইঞ্জিন** প্রস্তুত করলেন। ফলে ইংলণ্ড সর্ব-প্রথম বাষ্পচালিত রেলগাড়ি চালাবার সৌভাগ্য অর্জন করল।



স্টিফেনসন নির্মিত প্রথম রেল ইঞ্জিন

উনিশ শতকের মাঝামাঝি আবিষ্কৃত হল বিদ্যুৎশক্তি। এই শক্তির

বলে যন্ত্র চলতে লাগল আরও দ্রুতগতিতে। উৎপাদনের গতি গেল বেড়ে ; শিল্পের উন্নতির পথ হল অধিকতর প্রশস্ত।

বিদ্যুৎশক্তি

এইভাবে একই সঙ্গে বয়ন-শিল্প, কয়লা-শিল্প, লৌহ-শিল্প ও পরিবহণ-শিল্প—সর্বক্ষেত্রে অভূতপূর্ব পরিবর্তন হওয়ার ফলে ইংলণ্ডের শিল্পজগতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখা দিল। শিল্পক্ষেত্রে এই মূলগত পরিবর্তন ইতিহাসে 'শিল্প-বিপ্লব' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

শিল্প-বিপ্লবের ফলাফল

[Effects of the Industrial Revolution]

এই শিল্প-বিপ্লবের ফলে ইংলণ্ডে যে কেবল উৎপাদন পদ্ধতিতে আমূল পরিবর্তন এল, তা নয়, শিল্প-বিপ্লবের স্পর্শে ইংলণ্ডের সমাজ-ব্যবস্থাও এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সম্মুখীন হল।

এতকাল কৃষি ও কুটির শিল্প ছিল ইংলণ্ডের একমাত্র শিল্প। এখন কৃষির প্রাধান্যের স্থলে চূড়ান্তভাবে শিল্পের প্রাধান্য স্থাপিত হল। হস্তচালিত কুটির শিল্পের স্থলে যন্ত্রচালিত শিল্পের উদ্ভব হল। এই যন্ত্রচালিত শিল্পকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠল বড় বড় কারখানা বা ফ্যাক্টরী।

শিল্পের প্রাধান্য

যন্ত্র চালিত বিরাট বিরাট এই কারখানাগুলিতে অতি অল্প সময়ে অনেক বেশী পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন সম্ভব হল। উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় ইংলণ্ডের পণ্য বিদেশে সুলভ মূল্যে বিক্রি হতে লাগল এবং ব্যবসার ক্ষেত্রে ইংলণ্ড সারা পৃথিবীর বাজারে নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে ফেলল। কার্পাসজাত সুতা ও বস্ত্র এবং লৌহ-নির্মিত দ্রব্য, বিশেষ করে, বড় বড় যন্ত্র (machine) বিক্রির ব্যাপারে ইংলণ্ড সারা দুনিয়ায় নিজের একচেটিয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করল। যে দেশেরই এই সব জিনিসের প্রয়োজন তাদেরই ইংলণ্ডের দ্বারস্থ হতে হল। শিল্প-বিপ্লবের ফলে ইংলণ্ড হয়ে উঠল সারা দুনিয়ার কারখানার (Workshop of the world) মত। এক কথায় বলা চলে, শিল্প-বিপ্লব ইংলণ্ডের সামনে সুখ-সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্যে-ভরা এক নতুন দিগন্ত খুলে দিল।

ইংলণ্ড সারা পৃথিবীর কারখানায় পরিণত

কিন্তু শিল্প-বিপ্লব ইংলণ্ডের জন্য শুধু যে বিধাতার আশীর্বাদ বহন করে আনল তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে এল বিধাতার অভিশাপও।

অগেই বলেছি শিল্প-বিপ্লবের ফলে ফ্যাক্টরী শিল্পের উদ্ভব হল। কুটির শিল্পে নিযুক্ত কারিগরগণ ফ্যাক্টরী শিল্পের উৎপাদনের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারল না। ফলে কুটির শিল্পের শ্বাস রুদ্ধ হল। যে সমস্ত কারিগর কুটির শিল্পের দ্বারা স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্বাহ করত তারা ফ্যাক্টরীতে বেতনভোগী শ্রমিকের কাজ নিতে বাধ্য হল।

শিল্প-বিপ্লবের কুফল

শিল্প-বিপ্লবের ফলে কারিগরদের মত কৃষকদেরও দুর্দশা আরম্ভ হল। ধনিক সম্প্রদায় কৃষকদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিগুলি কিনে নিয়ে খণ্ড খণ্ড জমির পরিবর্তে বড় বড় খামার খুললেন। অর্থের অভাবে দরিদ্র কৃষকেরা উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি কিনতে পারল না ; ফলে নিজেদের জমিজমা বিক্রি করে তারা দিনমজুরের তালিকায় নাম লেখাতে বাধ্য হল।

এইভাবে শহরে শিল্পাঞ্চলে লোকের ভিড় জমল। শ্রমিকদেরও দুর্দশার অবধি রইল না। যে সমস্ত ফ্যাক্টরীতে তারা কাজ করত সেখানে আলো-বাতাসের চিহ্নমাত্র ছিল না। তাদের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা ছিল আরও নিন্দনীয়। শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত শ্রমিক বস্তির অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে শ্রমিকদের ছেলেমেয়েরা বেড়ে উঠতে

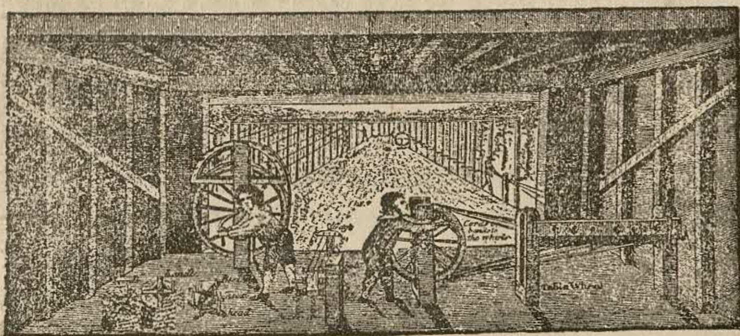
শ্রমিকদের দুর্দশা



কারখানায় নিযুক্ত শ্রমিক ক্রীতদাস

লাগল। তাছাড়া ফ্যাক্টরীতে কাজের কোন নির্দিষ্ট সময় রইল না। কারখানার

মালিকের ইচ্ছানুসারে তাদের কার্যকলাপ নির্ধারিত হত। তাদের চাকরির কোন নিশ্চয়তাও ছিল না। মালিক ইচ্ছা করলেই যে কোন সময়ে তাদের ছাঁটাই করতে পারত। নারী ও শিশু শ্রমিকদের মজুরী অল্প ছিল। সেইজন্য মালিকেরা ফ্যাক্টরীর কাজে অধিক সংখ্যায় নারী ও শিশুদের নিয়োগ করত।



কারখানায় নিযুক্ত শিশু শ্রমিক

শ্রমিক আন্দোলনের সূত্রপাত

ক্রমে ক্রমে শ্রমিকদের মধ্যে এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দারুণ অসন্তোষ জমে উঠতে লাগল। তারা দেখল কারখানার যারা মালিক তারা তাদের খাটিয়ে প্রচুর মুনাফা অর্জন করছে, অথচ তাদের শূয়োরের মত জীবনযাপন করতে হচ্ছে। ফলে, মালিকদের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের মন বিষিয়ে উঠল। শ্রমিকেরা ধৈর্যচ্যুত হয়ে যন্ত্রপাতি ভাঙতে আরম্ভ করে দিল। এই যন্ত্র-ভাঙা আন্দোলন **লুডাইট আন্দোলন** বলে পরিচিত। এই যন্ত্র-ভাঙা আন্দোলনের ফলে মালিক ও রাষ্ট্রনায়কের চৈতন্য হল। 'কারখানা আইন' পাস করে শ্রমিকদের কাজের সময় নির্দিষ্ট করে দেওয়া হল। শ্রমিকদের স্বাস্থ্যবিধান এবং নারী ও শিশু শ্রমিকদের সমস্যার কিছু কিছু সমাধান হল।

ট্রেড ইউনিয়ন গঠন

ক্রমশ শ্রমিকদের চেতনাও উন্নত হল। তারাও বুঝতে শিখল যে তাদের দুর্দশা যন্ত্রগুলির দোষে নয়, যন্ত্রগুলির মালিকদের দোষে। তাই তারা যন্ত্র-ভাঙার আন্দোলন বন্ধ করে যন্ত্রের মালিকদের সঙ্গে সংগ্রামের জন্য নিজেদের ঐক্যবদ্ধ করতে সচেষ্ট হল। নিজ নিজ শিল্পে তারা গড়ে তুলতে শিখল শ্রমিক সঙ্ঘ বা ট্রেড ইউনিয়ন।

ইওরোপে শিল্প-বিপ্লবের প্রসার ও তার ফলাফল
[Industrial Revolution in Europe & its Effects]

এইভাবে শিল্প-বিপ্লবের দরজা প্রথম খুলে গেল ইংলণ্ডে। কিন্তু ইংলণ্ড থেকে এই বিপ্লব ইওরোপের দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়তে খুব বেশী বিলম্ব হল না।

শিল্প-বিপ্লবের পক্ষে ইংলণ্ডের পরেই ফ্রান্সের জমি প্রস্তুত ছিল। ইংলণ্ডের বৈজ্ঞানিকদের মত ফ্রান্সের বৈজ্ঞানিকরাও এই সময়ে কয়েকটি মৌলিক আবিষ্কারের কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। ফ্রান্সের বৈজ্ঞানিকদের নব নব আবিষ্কার এই দেশে শিল্প-বিপ্লবের কাজটি সহজ করে তুলল। তারপরে বেলজিয়াম ও হল্যাণ্ডেও শিল্প-প্রসার আরম্ভ হল। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে জার্মানীতেও শিল্প-বিপ্লবের আগমন-ধ্বনি শোনা যেতে লাগল। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ঐক্য আন্দোলন জয়যুক্ত হওয়ার পরে জার্মানী শিল্পোন্নতিতে ইওরোপের মধ্যে অন্যতম প্রধান স্থান দখল করল।

ফ্রান্সে শিল্পবিপ্লব

জার্মানীতে শিল্প-বিপ্লব

ক্রমে ক্রমে ইওরোপের, বিশেষ করে, পশ্চিম ইওরোপের চেহারা একেবারে বদলে যেতে লাগল। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড ও জার্মানী —প্রত্যেকটা দেশই এককালে ছিল কৃষিপ্রধান দেশ—এখন থেকে সেগুলি শিল্পপ্রধান দেশে পরিণত হল। ক্ষেতখামারের স্থান দখল করল যন্ত্রচালিত বড় বড় কারখানা। গ্রামের স্থান দখল করল শহর। কাজেই ক্রমশ এই সব দেশে সামন্ত-প্রভুদের রাজনৈতিক ক্ষমতাতেও ছেদ পড়ল এবং কারখানার মালিকেরা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করল। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড—সর্বত্রই কারখানার মালিকদের প্রতিনিধিরা হলেন রাষ্ট্রনেতা। ক্রমশ রাষ্ট্র এই নতুন ধনিক শ্রেণীটির যন্ত্রে পরিণত হল।

ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, হল্যাণ্ডে এই ধনিকশ্রেণী পরিচালিত কারখানাগুলিতে পণ্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন হল পাট, তূলা, রবার, নীল প্রভৃতি কাঁচামালের। অথচ এই সব দেশে ছিল কাঁচামালের একান্ত অভাব। কাজেই কাঁচামাল সংগ্রহের কাজে রাষ্ট্র মনোনিবেশ করল। এই সময়ে তারা দেখল, এশিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকার দেশগুলিতে প্রচুর কাঁচামাল রয়েছে। তাই তারা কাঁচামালের উৎস এশিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকার দেশগুলির দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করল।

কাঁচামালের সন্ধান

ইওরোপ থেকে এশিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকার দূরত্বের বাধাও কেটে এসেছিল। কেননা শিল্প-বিপ্লবের পরে যাতায়াতের ব্যবস্থা অনেক উন্নত হওয়ার ফলে ইওরোপের রাষ্ট্রগুলি দূরত্বের ব্যবধান অতিক্রম করে যেখানেই কাঁচামালের সন্ধান পেল সেখানেই গিয়ে পৌঁছল। তারা মালয় থেকে আনল টিন; ইন্দোনেশিয়া থেকে রবার; ভারত থেকে পাট ও তুলা। কাজেই ভারত ও এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে ইওরোপের কারখানাগুলির যোগসূত্র স্থাপিত হল।

তাছাড়া, শিল্প-বিপ্লবের ফলে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের কারখানাগুলি থেকে যে প্রচুর পরিমাণে পণ্যদ্রব্য উৎপাদন হতে থাকল তার বিক্রির জন্য প্রয়োজন দেখা দিল বিস্তৃত বিক্রয়ক্ষেত্র বা বাজারের। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের লোকসংখ্যা খুব কম। অথচ এই সব দেশের উৎপাদনের পরিমাণ হতে থাকল বিরাট।

সারা বিশ্বের বাজার দখলের চেষ্টা

কাজেই এই বাড়তি পণ্যের বিক্রয়ক্ষেত্রের জন্য তাদের দৃষ্টি পড়ল কোটি কোটি লোকের আবাসস্থল এশিয়া ও আমেরিকার দিকে। তারা ভাবল—ভারতের ত্রিশ কোটি মানুষ ও চীনের পঞ্চাশ কোটি মানুষকে যদি তাদের পণ্যদ্রব্য কিনতে বাধ্য করা যায় তাহলে এই বাজারের সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে।

ইওরোপের শিল্পোন্নত দেশগুলি এই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়েই উনবিংশ শতাব্দীতে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং সারা পৃথিবীকে তারা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছিল।

এই ভাবেই শিল্প-বিপ্লব থেকে পশ্চিম ইওরোপে প্রথম গড়ে উঠেছিল আধুনিক ধনতন্ত্র এবং ধনতন্ত্রের প্রয়োজনে গড়ে উঠল পৃথিবীব্যাপী এক অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ।

ইংলণ্ডের শিল্প-বিপ্লব ও ভারতবর্ষ

[India and the Industrial Revolution]

এই অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের কবলে পড়ে ভারতের জীবনে এসেছিল ঘোর অমানিশা। আগেই বলেছি, কি ভাবে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভারত-লুট-করা অর্থে ইংলণ্ডের শিল্প-বিপ্লব সম্পন্ন হয়েছিল। শিল্প-বিপ্লবের পরে ইংলণ্ডে যে কারখানাগুলি খোলা হল তার জন্য প্রয়োজন দেখা দিল কাঁচামালের। এইজন্য প্রয়োজন হল নীল, পাট, তুলা প্রভৃতির।

ইংলণ্ডের স্বার্থে ভারতে পাটের চাষ আরম্ভ হল। ইংলণ্ডের প্রয়োজন হল তূলার; ভারতে তূলার চাষ আরম্ভ হল। ইংলণ্ডের নীল প্রয়োজন নাবিকদের ইউনিফর্ম রঙ করার জন্য ও কাপড় রাঙাবার জন্য; সুতরাং নীল চাষের প্রবর্তন করা হল। এইভাবে ম্যাঞ্চেস্টারের পুঁজিপতিদের স্বার্থে ভারতকে ইংলণ্ডের কাঁচামাল সরবরাহকারী দেশে পরিণত করা হল।

ভারত ইংলণ্ডের কাঁচামাল সরবরাহকারী দেশে পরিণত

তারপরে ভারত-জাত এই কাঁচামাল থেকে ইংলণ্ডের কারখানায় তৈরী হল প্রচুর পণ্যদ্রব্য, যার জন্যে চাই বিস্তৃত বিক্রয়ক্ষেত্র। আবার নজর পড়ল ভারতের দিকে। ভারতের চল্লিশ কোটি লোক যদি ইংলণ্ডের জিনিস কেনে তাহলে আর ভয় কোথায়! তাই ভারতের বাজার ছেয়ে গেল বিলাতী জিনিসে। দেশের প্রসিদ্ধ শিল্পগুলি বিলাতী পণ্যের সঙ্গে পাল্লা দিতে না পেরে আস্তে আস্তে ধ্বংস হয়ে গেল।

ভারত বিলাতী পণ্যের বিক্রয়ক্ষেত্রে পরিণত

এককথায় বলা চলে, দেশের স্বার্থে ভারতের কাঁচামাল ব্যবহার হল না। দেশের শিল্পের জন্য দেশের বাজার খোলা রইল না। ভারতের নিজের প্রয়োজনের দিকে না তাকিয়ে, ভারতকে ইংরেজ শিল্পপতির যূপকাষ্ঠে বলি দেওয়া হল। শিল্প-বিপ্লবের ফলে ইংলণ্ড হল ধনী থেকে আরও ধনী। আর ইংলণ্ডের শিল্প-বিপ্লবের ছোঁয়ায় ভারত হল নিঃস্ব থেকে আরও নিঃস্ব।

চতুর্থ অধ্যায়

ইওরোপের পুনর্গঠন (১৮১৫-১৮৪৮)

[Reconstruction of Europe]

নেপোলিয়নের পতনে ইওরোপের রাজনীতিতে নতুন অধ্যায়ের স্থচনা হল। নেপোলিয়ন ছিলেন বিপ্লবের প্রতীক। নেপোলিয়নের পতনে ইওরোপে সাময়িকভাবে বিপ্লবী শক্তিগুলির পতন ঘটেছিল।

নেপোলিয়নের পতনে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল ইংলণ্ড। কিন্তু ইংলণ্ড একা নেপোলিয়নের পতনের জন্য দায়ী নয়। নেপোলিয়নের পতন পতন ঘটাতে ইংলণ্ড যাদের সাহায্য পেয়েছিল, যাদের নিয়ে সে নেপোলিয়ন-বিরোধী যুক্তফ্রন্ট গঠন করেছিল তারা হল অস্ট্রিয়া, রাশিয়া ও প্রাশিয়া। কাজেই নেপোলিয়ন-বিরোধী উপরোক্ত চারিটি প্রধান শক্তি,—ইংলণ্ড, অস্ট্রীয়া, রাশিয়া ও প্রাশিয়া—এখন ইওরোপে প্রাধান্য লাভ করল। নেপোলিয়ন ছিলেন যেমন বিপ্লবের প্রতীক, উপরোক্ত চতুঃশক্তি ছিল তেমনি প্রতিক্রিয়ার স্তম্ভ, বিপ্লবের শত্রু।

নেপোলিয়নের পতনের পরে ইওরোপকে নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী পুনর্গঠিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে এই চারটি শক্তি অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা শহরে একটি সম্মেলনে মিলিত হল। এই সম্মেলনটি (১৮১৪-১৫) "ভিয়েনা কংগ্রেস" (Vienna Congress) নামে সমধিক খ্যাত।

ভিয়েনা কংগ্রেস

[Vienna Congress]

এই সম্মেলনের মধ্যমণি ছিলেন মেটারনিক (Metternich)। তিনি ছিলেন অস্ট্রিয়ার প্রধান মন্ত্রী। কূটবুদ্ধিতে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। নেপোলিয়ন যেমন ছিলেন বিপ্লবের স্তম্ভস্বরূপ, তেমনি তিনি ছিলেন প্রতিক্রিয়ার স্তম্ভ। মেটারনিক এই সম্মেলনে নেতৃত্ব গ্রহণ করায় অষ্ট্রিয়া আগাগোড়া ভিয়েনা কংগ্রেসে আধিপত্য করল। ভিয়েনা কংগ্রেসে ইংলণ্ডের পক্ষ থেকে যোগদান

ভিয়েনা কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ

করেন রক্ষণশীল দলের নেতা ও তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী লর্ড **ক্যাশেলরীগ** (Lord Castlereagh)। রাশিয়ার পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন জার **প্রথম আলেকজাণ্ডার** (Czar Alexander I) এবং প্রাশিয়ার পক্ষ থেকে **তৃতীয় ফ্রেডারিক উইলিয়ম** (Frederick William III)।

ভিয়েনা সম্মেলনের লক্ষ্য

এই সম্মেলনের মূল লক্ষ্য ছিল বিপ্লবের শক্তির মূলোচ্ছেদ করা। উদ্যোক্তাদের মতে বিপ্লবের ব্যাপারটাই ছিল একটা বে-আইনী কাজ। তাঁদের চোখে এই ঘটনাগুলি ছিল ইতিহাসের ব্যতিক্রম। তাই তাঁরা বিপ্লবের আগে যে অবস্থা ছিল তাকে ফিরিয়ে আনার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করলেন।

তিনটি মূলনীতি

তিনটি মূলনীতি অনুসারে এই সম্মেলনের কাজ পরিচালিত হয়েছিল। সেই তিনটি মূলনীতি হল: (১) **ন্যায্য অধিকার নীতি** (principle of legitimacy) অর্থাৎ তাঁদের মতে ফরাসী বিপ্লব ছিল অবৈধ বিপ্লব এবং কাজেই বিপ্লবের আগে যাঁরা ফ্রান্সে রাজা ছিলেন তাঁদেরই ছিল ফ্রান্সের সিংহাসনে 'নায্য অধিকার'। (২) **ক্ষতি-পূরণ নীতি** অর্থাৎ নেপোলিয়ন-বিরোধী যুদ্ধে যারা যোগদান করেছিল তাদের ক্ষতিপূরণ দান। (৩) **শক্তি-সাম্য নীতি** অর্থাৎ রাজনীতি-ক্ষেত্রে ফ্রান্স পুনরায় ক্ষমতাশালী হয়ে ইওরোপের শক্তি-সাম্য যাতে নষ্ট করতে না পারে তার জন্য ফ্রান্সকে ঘিরে ইওরোপে একটি রাষ্ট্রসংঘ গঠন করা।

ফ্রান্সে বুরবোঁ রাজবংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা

ন্যায্য অধিকার নীতি (Principle of Legitimacy): উপরোক্ত ন্যায্য অধিকার নীতি অনুযায়ী ফ্রান্সের সিংহাসনে বিপ্লব পূর্ববর্তী বুরবোঁ রাজবংশটিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হল। ভিয়েনা সম্মেলনে যোগদানকারীদের মতে একমাত্র এই বুরবোঁদেরই ছিল ফ্রান্সে রাজ্যশাসনের আইনসঙ্গত অধিকার।

শুধু ফ্রান্সের ক্ষেত্রেই তাঁরা বিপ্লব-পূর্ব-অবস্থা (Status Quo) ফিরিয়ে আনেন নি। তাঁরা স্পেনে বুরবোঁ বংশকে, হল্যাণ্ডে অরেঞ্জ বংশকে, পিডমণ্ট সার্ডিনিয়াতে সেভয় বংশকে এবং মধ্য ইতালীতে পোপের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করলেন। এক কথায়, নেপোলিয়ন ইউরোপে দেশে দেশে যে প্রজাতান্ত্রিক পরিবর্তন সাধন করেছিলেন, সেগুলি নাকচ করে ইওরোপের প্রত্যেকটি দেশেই তাঁরা প্রতিক্রিয়াশীল শাসনব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করলেন।

ক্ষতিপূরণ নীতি (Principle of Compensation): ন্যায্য

অধিকার নীতির পাশাপাশি 'ক্ষতিপূরণ নীতি' চালু করা হল। ইংলণ্ড, অস্ট্রিয়া, রাশিয়া ও প্রাশিয়াকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে ইওরোপ ও ইওরোপের বাইরে নানা ভূখণ্ড বণ্টন করে দেওয়া হল। যেমন, ক্ষতিপূরণ হিসাবে ইংলণ্ড সিংহল, দক্ষিণ আফ্রিকা, গিনির একাংশ লাভ করল। অস্ট্রীয়া ক্ষতিপূরণ হিসাবে ইতালীর উপর প্রভুত্ব বিস্তারের সুযোগ লাভ করল। ভেনিস ও মিলানকে অস্ট্রিয়ার হাবস্‌বুর্গ বংশের সঙ্গে সংযুক্ত করা হল। মধ্য ইতালীর অন্তর্গত টাসকেনি, পার্মা ও মডেনাকে হাবসবুর্গ বংশের শাসকদের অধীন করা হল। জার্মানীকে ৩৮টি খণ্ড-রাজ্যের সমষ্টি হিসাবে গড়ে তোলা হল এবং তার উপরে অস্ট্রিয়ার কর্তৃত্ব সাব্যস্ত হল; প্রাশিয়াকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে জার্মানীর সেই সব অংশ ফিরিয়ে দেওয়া হল যেগুলি নেপোলিয়ন তার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিলেন। তাছাড়া, প্রাশিয়া পোমারানিয়ার একাংশ, স্যাক্সনির একাংশ, ওয়েষ্টফালিয়া ও রাইনল্যাণ্ড লাভ করল।

ক্ষতিপূরণের নামে পররাজ্য গ্রাস

শক্তিসাম্য নীতি (Principle of Balance of Power) : ক্ষতিপূরণ নীতির পাশাপাশি আবার শক্তিসাম্য নীতি চালু করা হল। এই নীতি অনুসারে ফ্রান্সের ভবিষ্যৎ অগ্রগতি রোধ করার জন্য ফ্রান্সের সীমান্তবর্তী রাষ্ট্রগুলিকে জোরদার করা হল। যেমন, প্রাশিয়াকে নতুন নতুন রাজ্য দিয়ে শক্তিশালী করা হল যাতে সে ফ্রান্সের অগ্রগতি রোধ করতে পারে। ফ্রান্সের সীমান্তবর্তী আর একটি রাষ্ট্র হল্যাণ্ডকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলার জন্য তাকে বেলজিয়ামের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার সুযোগ দেওয়া হল। ফ্রান্সের অগ্রগতি রোধ করার জন্য অস্ট্রিয়াকে ইতালী ও জার্মানীতে কর্তৃত্ব করার সুযোগ দেওয়া হল। নেপোলিয়নকে সাহায্য করার শাস্তি হিসাবে ডেনমার্কের কাছ থেকে নরওয়ে কেড়ে নিয়ে সুইডেনের সঙ্গে যোগ করে দেওয়া হল।

ভিয়েনা সম্মেলনের সমালোচনা (Criticism of the Vienna Congress) : ভিয়েনা কংগ্রেসের রচয়িতাদের এক অত্যন্ত জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তাঁরা এই জটিল সমস্যাগুলির সাময়িক সমাধান করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁদের রচিত ইওরোপীয় পুনর্গঠন ব্যবস্থাটি ১৮১৫ থেকে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল।

কিন্তু ইওরোপীয় সমস্যার স্থায়ী সমাধানে তাঁরা ব্যর্থ হয়েছিলেন। তাঁদের ব্যর্থতার মূল কারণ—তাঁরা যুগধর্মকে উপেক্ষা করেছিলেন।

প্রথমত, তাঁরা গণতন্ত্রের নীতি (principle of democracy) অস্বীকার করলেন। শুধু ফ্রান্সে বুরবোঁদের ফিরিয়ে এনেই তাঁরা নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। ইওরোপের যেখানেই বিপ্লবের বা প্রগতিশীল আন্দোলনের এতটুকু সাড়া পাওয়া গেল সেখানেই তাঁরা হস্তক্ষেপ করে বিপ্লবের শক্তিকে অঙ্কুরেই বিনাশ করতে চাইলেন। হল্যাণ্ডে বহু আগে থেকেই একটা প্রজাতন্ত্র ছিল। সম্মেলনের উদ্যোক্তারা এই প্রজাতন্ত্রটিকে সন্দেহের চোখে দেখতে লাগলেন। তাঁরা হল্যাণ্ডের প্রজাতন্ত্রটি ধ্বংস করে হল্যাণ্ড ও বেলজিয়াম দুটি দেশকে নিয়ে একটি নতুন রাজতন্ত্র সৃষ্টি করলেন।

গণতন্ত্রের নীতি অস্বীকার

অস্ট্রিয়ায়, প্রাশিয়ায়, ফ্রান্সে—সর্বত্র আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে স্বৈরাচারী শাসন প্রতিষ্ঠা করা হল। ইওরোপের দেশে দেশে স্থাপন করা হল **পুলিশরাষ্ট্র** (অর্থাৎ যে রাষ্ট্রে পুলিসই সব, জনসাধারণ সকল অধিকার থেকে বঞ্চিত)।

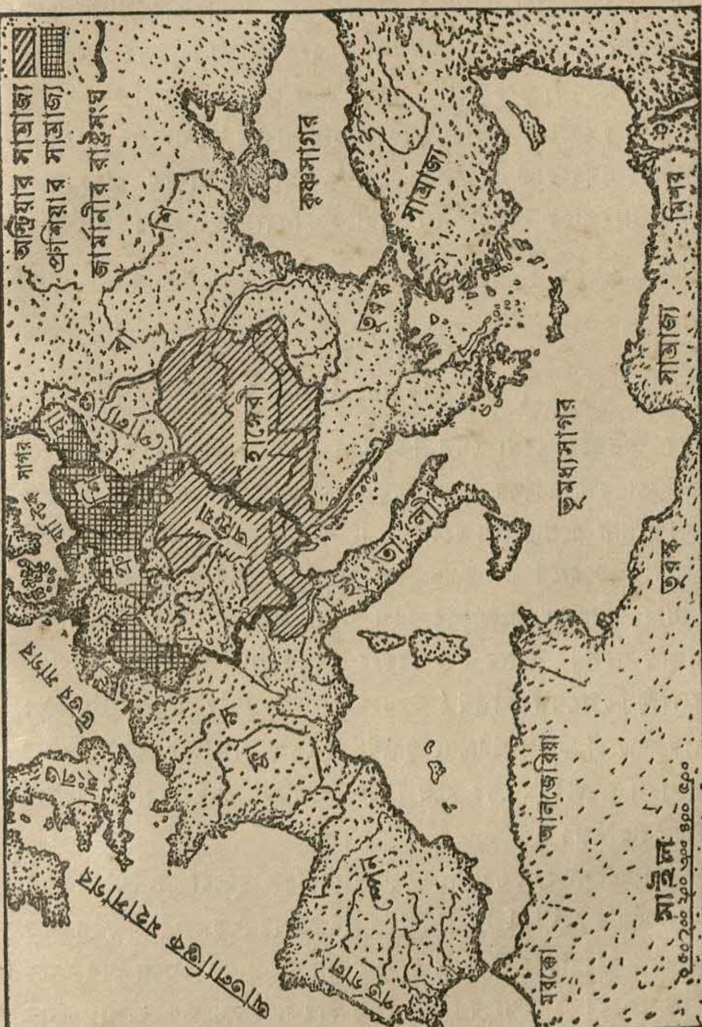
পুলিশপ্রধান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা

দ্বিতীয়ত, সম্মেলনের রচয়িতারা জাতীয়তা (principle of nationality) বা জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের (right of self-determination) নীতিটিকেও অগ্রাহ্য করলেন। বেলজিয়াম ছিল একটি স্বাধীন রাজ্য। এই রাজ্যটিকে হল্যাণ্ডের সঙ্গে সংযুক্ত করে দেওয়ায় বেলজিয়ামের ক্ষেত্রে আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকারটি অগ্রাহ্য করা হল। এই সময়ে পোল্যাণ্ডে স্বাধীনতা আন্দোলন চলছিল। তাঁরা এই আন্দোলন দমন করার জন্য এই দেশটিকে তিনটি খণ্ডে বিভক্ত করে প্রধানত রাশিয়া, অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার মধ্যে ভাগ করে দিলেন। নরওয়ের জাতীয়তার প্রশ্নটি উপেক্ষা করে সুইডেনের সঙ্গে নরওয়েকে যোগ করে আর একটি রাজতন্ত্র সৃষ্টি করা হল। আত্মনিয়ন্ত্রণ ও জাতীয় ঐক্যসাধনের অধিকার অগ্রাহ্য করে ইতালীকে কয়েক খণ্ডে ভাগ করে রাখা হল, যাতে তার অনৈক্যের সুযোগ নিয়ে অস্ট্রিয়া তার উপরে আধিপত্য করতে পারে। একই উদ্দেশ্যে অস্ট্রিয়ার স্বার্থে জার্মানীকেও খণ্ড-বিখণ্ড করে রাখা হল।

জাতীয়তা নীতি অস্বীকার

ইতালী খণ্ডিত

জার্মানী খণ্ডিত



ভিয়েনা সম্মেলনের পরে ইওরোপ

ভিয়েনা সম্মেলনের রচয়িতারা বিপ্লবের মূলোচ্ছেদ করার ব্যর্থ চেষ্টা করলেন। যে-যুগে তাঁরা বিপ্লবকে উৎখাত করার চেষ্টা করলেন সেটা ছিল বিপ্লবের যুগ। ফরাসী বিপ্লবের সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার বাণী তখন সমগ্র ইওরোপের মনকে আন্দোলিত করে তুলেছিল। এই অবস্থায়, যুগের হাওয়া উপেক্ষা করে গায়ের জোরে পুরানো প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে তাঁরা অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন। বস্তুত, ভিয়েনা সম্মেলনের কাজ তরবারির জোরে কিছুদিন টিকিয়ে রাখা সম্ভব হয়েছিল; স্থায়িভাবে বিপ্লবী ভাবধারাকে নির্বাসিত করার পরিকল্পনা একেবারেই ব্যর্থ হয়েছিল।

জুলাই বিপ্লব
[The July Revolution]

অদূর ভবিষ্যতে দেখা গেল ভিয়েনার নেতারা এত যত্নে যা রচনা করেছেন তা হল তাসের ঘরের মত। ঝড়ের এক ঝাপটায় তাঁদের সাজানো বাগান এলোমেলো হয়ে গেল। সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার আদর্শটি তখন সারা ইওরোপে যে তরঙ্গ সৃষ্টি করেছিল সেই তরঙ্গের গতিরোধ করার সাধ্য ভিয়েনা কংগ্রেসের ছিল না। তাই বিপ্লবের শক্তি আবার আত্মপ্রকাশ করল। প্রথমে এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাল ফ্রান্স।

জুলাই বিপ্লবের কারণ (Causes of the July Revolution) : ভিয়েনার নেতারা ফ্রান্সে পুরানো বুরবোঁ বংশের রাজাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। বুরবোঁ বংশের সঙ্গে ফিরে এসেছিল সেই পুরানো দিনের রাজকীয় স্বেচ্ছাতন্ত্র।

ভিয়েনা সম্মেলন ফ্রান্সের সিংহাসনে বসিয়েছিল বুরবোঁ বংশীয় অষ্টাদশ লুইকে (Louis XVIII)। অষ্টাদশ লুই উদার মত ও রক্ষণশীল মত দুইয়ের মধ্যে আপোসের ভিত্তিতে রাজ্যচালনা করলেন। ফলে তাঁর সময়ে কোন বড় রকমের বাধা আসে নি। কিন্তু তাঁর পরে ফ্রান্সের রাজা হলেন **দশম চার্লস** (১৮২৪-১৮৩০ খৃঃ)। তিনি যাজক ও অভিজাত শ্রেণীকে পুরানো দিনের অধিকারগুলি ফিরিয়ে দিলেন। জনসাধারণের সর্বপ্রকারের অধিকার খর্ব করা হল। ভোটাধিকার সংকুচিত করা হল; সংবাদপত্রের স্বাধীনতাও হরণ করা হল। দশম চার্লসের শাসনে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হল

প্রভাবশালী উচ্চ মধ্যবিত্ত বা বুর্জোয়া শ্রেণী। রাজা ফরাসী বিপ্লবের সময়ে পলাতক অভিজাত শ্রেণীকে উৎসাহ দিয়ে দেশে ডেকে আনলেন এবং তাঁদের ক্ষতিপূরণ হিসাবে রাজকোষ থেকে প্রচুর অর্থ দান করলেন। পলাতক অভিজাতেরাই রাজ্যশাসনেও প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করল। উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণী যারা ফরাসী বিপ্লব ও নেপোলিয়নের সময়ে ক্ষমতার আস্বাদ পেয়েছিল তারা অভিজাত ও ক্যাথলিক চার্চের ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে দেখে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে উঠল।

উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভূমিকা

এই উচ্চ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় রাজনীতিজ্ঞানে ও অর্থসম্পদে প্রভাবশালী হওয়ায় রাজার পক্ষেও এদের দমন করা সহজ ছিল না। পার্লামেণ্টে এদের শক্তি বেশী থাকায় রাজা পার্লামেণ্ট ভেঙে দিয়ে নতুন নির্বাচনের আদেশ দিলেন। কিন্তু নতুন নির্বাচনের ফলে পার্লামেণ্টে উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণী আরও বেশী আসন লাভ করল। রাজা ভয় পেয়ে নতুন পার্লামেণ্টের অধিবেশনের আগেই ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে একটি জরুরী আইন পাস করে পার্লামেণ্ট ভেঙে দিলেন।

বুরবোঁ বংশের পতন

ঘটনা (Events) : কিন্তু জনসাধারণ ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবে অর্জিত সাম্য ও স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে রাজী হল না। তাই ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে জুলাই মাসে বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতৃত্বে ফ্রান্সের জনসাধারণ বুরবোঁ রাজাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। উচ্চ মধ্যবিত্ত প্রভাবিত সংবাদপত্রগুলি জনসাধারণকে বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করার জন্য উৎসাহ দিতে লাগল। শিল্পপতিরা প্রতিবাদে কারখানা বন্ধ করে দিল। রাস্তায় রাস্তায় জনগণ ব্যারিকেড রচনা করে রাজার সৈন্যদের সঙ্গে হাতাহাতি লড়াই আরম্ভ করল। তিন দিন ধরে রাস্তায় রাস্তায় হাতাহাতি লড়াইয়ের পরে রাজকীয় সেনাবাহিনী পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হল। বিদ্রোহের মুখে দশম চার্লস সিংহাসন ত্যাগ করলেন এবং ইংলণ্ডে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচালেন। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে জুলাই মাসে এই বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল বলে এটি 'জুলাই বিপ্লব' বলে খ্যাত।

জুলাই বিপ্লবের ফলাফল (Effects of the July Revolution) : জুলাই বিপ্লবের ফলাফল দেখা গেল ফ্রান্সে এবং ফ্রান্সের বাহিরে সারা ইওরোপে।

ফ্রান্সে এই বিপ্লব গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধন করল। এই বিপ্লবের ফলে

ফ্রান্সের সিংহাসন থেকে বুরবোঁ বংশকে চিরতরে বিদায় নিতে হয়েছিল। বুরবোঁ বংশকে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের প্রতীক বলে ধরা হত। তাই তাদের পতনে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র বা দৈব অধিকার তত্ত্ব (theory of divine right) ফ্রান্সের রাজনীতি থেকে বিদায় গ্রহণ করল।

ফ্রান্সে

বুরবোঁ বংশের বদলে অরলিয়ানিস্ট (Orleanist) বংশ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হল। অরলিয়ানিস্ট বংশীয় লুই ফিলিপ (Louis Philippe) আশ্বাস দিলেন তিনি ফ্রান্সকে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র ও দৈবতত্ত্ব থেকে মুক্তি দেবেন। তার চেয়ে বড় কথা লুই ফিলিপ উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বার্থ অনুযায়ী রাজ্য পরিচালনার আশ্বাস দান করলেন। ফলে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের পরে ফ্রান্সে উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণী ক্ষমতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল। তাদেরই স্বার্থে এখন থেকে ফ্রান্সের অর্থনীতি ও রাজনীতি পরিচালিত হল। ফ্রান্সে প্রতিষ্ঠিত হল স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের বদলে মধ্যবিত্ত-প্রধান বা বুর্জোয়া রাজতন্ত্র (middle class monarchy বা bourgeois monarchy)।

ফ্রান্সের বাহিরে জুলাই বিপ্লবের পরিব্যাপ্তি

ফ্রান্সের বাহিরেও এই বিপ্লবের প্রভাব পরিব্যাপ্ত হল। এই বিপ্লবের প্রভাবে বেলজিয়ামে, পর্তুগালে, স্পেনে, ইতালীতে, জার্মানীতে, পোল্যাণ্ডে, সুইজারল্যাণ্ডে—এক কথায় সারা ইওরোপে জন-জাগরণ আরম্ভ হয়েছিল।

বেলজিয়ামে স্বাধীনতা আন্দোলনের জয়লাভ

জুলাই বিপ্লবের প্রভাবে বেলজিয়ামে স্বাধীনতার দাবিতে গণআন্দোলন আরম্ভ হল। ভিয়েনা সম্মেলনে বেলজিয়ামকে জোর করে হল্যাণ্ডের সঙ্গে সযুংক্ত করে দিয়েছিল। বেলজিয়ামের জনগণ এই সংযুক্তি জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী বলে মনে করত। তাই তারা বেলজিয়ামকে হল্যাণ্ড থেকে পৃথক করে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন আরম্ভ করল।

জুলাই বিপ্লবের রণধ্বনি তাদের মনে নতুন সাহস যোগাল। ব্রাসেলস্ (Brussels) শহরে গণ-অভ্যুত্থান আরম্ভ হল। রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড রচনা করা হল। মন্ত্রীদের নাজেহাল করা হল। জাতীয় রক্ষীবাহিনী গঠন করা হল। বেলজিয়ামে দেশপ্রেমিকরা ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে স্বাধীনতা ঘোষণা করল।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিও বেলজিয়ামের স্বাধীনতা আন্দোলনের অনুকূল

ছিল। বেলজিয়ামের স্বাধীনতা আন্দোলন দমনে মেটারনিক মন দিতে পারলেন না। তিনি ইতালী ও জার্মানীতে বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত ছিলেন। আর জার প্রথম আলেকজাণ্ডার পোল্যাণ্ডে বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত ছিলেন। অপর দিকে ইংলণ্ডের বৈদেশিক মন্ত্রী পামারস্টোন ও ফ্রান্সের নবনির্বাচিত সম্রাট লুই ফিলিপ বেলজিয়ামের স্বাধীনতা আন্দোলনে সমর্থন জানালেন। এই অবস্থায়, ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। এই চুক্তির শর্তানুযায়ী বেলজিয়াম একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করল এবং বেলজিয়ামে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল।

ইংলণ্ডে জুলাই বিপ্লবের প্রভাবে জনজাগরণ তীব্র আকার ধারণ করল। ইংলণ্ডে উচ্চ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের পার্লামেণ্টে প্রবেশের সুযোগ ছিল না।

ইংলণ্ডে সংস্কার আন্দোলন

উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণী পার্লামেণ্টে প্রবেশাধিকারের জন্য নির্বাচন-ব্যবস্থার সংস্কার দাবি করল। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে নির্বাচন-ব্যবস্থার সংস্কার সাধনের ফলে উচ্চ মধ্যবিত্তের পার্লামেণ্টে প্রবেশের অধিকার স্বীকৃত হল।

ইতালীতে ও জার্মানীতেও ঐক্যের দাবীতে আন্দোলন আরম্ভ হল।

অন্যান্য দেশে আন্দোলন

পোল্যাণ্ডে স্বাধীনতা আন্দোলন দেখা গেল। পর্তুগাল ও স্পেনে উদারনৈতিক সংস্কারের দাবি উঠল।

মেটারনিক ইতালী ও জার্মানীর এবং প্রথম আলেকজাণ্ডার পোল্যাণ্ডের আন্দোলন চণ্ডনীতির সাহায্যে বন্ধ করলেন। স্পেন ও পর্তুগালে আন্দোলনের শক্তিগুলি দুর্বল থাকায় সাফল্য অর্জন করতে পারল না। কিন্তু ফ্রান্সে, বেলজিয়ামে ও ইংলণ্ডে বিপ্লবের যে সাফল্য সূচিত হল তাতে তাদের মনে বিপ্লবের প্রেরণা অব্যাহত রইল। পরবর্তীকালে এই সব দেশ নূতন করে বিপ্লবতরঙ্গে মেতে উঠেছিল এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বিপ্লব সাফল্য-মণ্ডিত হয়েছিল।

ফেব্রুয়ারী বিপ্লব
[The February Revolution]

ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের কারণ (Causes of the February Revolution) : জুলাই বিপ্লবের পরে ফ্রান্সের রাজা হলেন অরলিয়ানিস্ট বংশের **লুই ফিলিপ**। লুই ফিলিপকে সিংহাসনে বসিয়েছিল উচ্চ-মধ্যবিত্ত

বা বুর্জোয়া শ্রেণী। কাজেই বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থে তিনি রাষ্ট্রক্ষমতা পরিচালনা করতেন। একমাত্র বুর্জোয়া শ্রেণীই তাঁর ভোটাধিকার পেল, এবং এরাই কি রাজনীতি, কি অর্থনীতি, সব দিকে প্রতিষ্ঠা অর্জনের সুযোগ লাভ করল।

বুর্জোয়া শ্রেণীর আত্মপ্রতিষ্ঠা

কাজেই লুই ফিলিপের আমলে যারা সামন্তপ্রভু বা অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল তারা অসন্তুষ্ট হল। আবার নিম্ন মধ্যবিত্ত, শ্রমিক ও কৃষকের স্বার্থও সম্পূর্ণ অবহেলিত হল। কাজেই একদিকে রক্ষণশীলেরা লুই ফিলিপের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করল। আর একদিকে শ্রমিক, কৃষক, নিম্ন মধ্যবিত্তদের দাবি নিয়ে চরমপন্থী আন্দোলন আরম্ভ হল। এই সময়ে ফ্রান্সে শ্রমিক ও কৃষকের স্বার্থ সুরক্ষিত করার জন্য একটি সমাজতান্ত্রিক আন্দালনও গড়ে উঠল।

ফ্রান্সে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সূচনা

লুই ফিলিপের আমলে প্রধান মন্ত্রী ছিলেন শিল্পপতিদের বন্ধু গিজো। গিজো বিরোধী পক্ষের কণ্ঠরোধ করার জন্য সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করলেন; ঘুঁষ দিয়ে পার্লামেণ্টে সংখ্যাধিক্য বজায় রাখতে সচেষ্ট হলেন এবং সভা-শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করলেন। ক্রমশ ফ্রান্সে উচ্চ মধ্যবিত্তের নেতৃত্বে একটি ডিক্টেটরী শাসন প্রতিষ্ঠিত হল।

গিজোর প্রতিক্রিয়াশীল নীতি

বিরোধী পক্ষ, যখন দেখল যে সভা-সমিতির অধিকার নিষিদ্ধ হয়েছে, তখন তারা প্যারিসে বড় বড় ভোজসভার আয়োজন করল এবং এই ভোজসভাগুলি বিপ্লবী আন্দোলনের যোগসূত্র হয়ে দাঁড়াল। গিজো এই ভোজসভাও নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন।

ঘটনা (Events) : ভোজসভা নিষিদ্ধ করায় ফরাসী জনসাধারণের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে পড়ল। জনতা সমস্ত আইন অগ্রাহ্য করে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল এবং অবিলম্বে সংস্কার দাবি করল। গিজো পথে পথে সৈন্যবাহিনী মোতায়েন করলেন। প্যারিস শহরের শ্রমিকেরা রাস্তায় ব্যারিকেড তৈরী করে সেনাবাহিনীকে বাধাদান করল। সেনাবাহিনীর একাংশ রাজার পক্ষ পরিত্যাগ করে বিপ্লবীদের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। জনতা বিপ্লবী সৈন্যদের সঙ্গে কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে দাবি করল—গিজোর পদত্যাগ চাই। রাজার পদত্যাগ চাই। লুই ফিলিপ ঝড়ের মুখে

ফিলিপের পলায়ন

আত্মরক্ষার তাগিদে ফ্রান্স থেকে পালিয়ে গিয়ে ইংলণ্ডে আশ্রয় নিলেন। লুই ফিলিপের পলায়নে অরলিয়ানিস্ট বংশের পতন ঘটল।

লুই ফিলিপের বিরুদ্ধে এই বিপ্লব ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ঘটেছিল। তাই এটি **ফেব্রুয়ারী বিপ্লব** বলে পরিচিত।

ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের ফলাফল (Effects of the February Revolution): ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের ফলাফল দেখা গেল যেমন ফ্রান্সে, তেমনি ফ্রান্সের বাইরেও।

ফ্রান্স

ফ্রান্সে ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের ফলে অরলিয়ানিস্ট বংশের পতন হল। ফরাসী জনসাধারণ এখন রাজতন্ত্র সম্পর্কে সমস্ত বিশ্বাস হারাল। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবের পরে তারা দৈবতত্ত্বে বিশ্বাসী স্বৈরাচারী রাজাদের বিদায় দিয়েছিল এবং আশা করেছিল লুই ফিলিপের নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু এখন তারা দেখল রাজতন্ত্র মাত্রই খারাপ, তা সে স্বৈরতান্ত্রিকই হোক, আর নিয়মতান্ত্রিকই হোক। তাই তারা এবার রাজতন্ত্র উচ্ছেদ করে ফ্রান্সে পুনরায় প্রজাতন্ত্র স্থাপন করল। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সে প্রথম প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়েছিল। এখন স্থাপিত হল দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র (Second Republic)।

ইওরোপে প্রায় প্রত্যেকটি দেশেই এই বিপ্লবের প্রভাবে গণজাগরণ আরম্ভ হল। তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মধ্য-ইওরোপের গণঅভ্যুত্থান।

অস্ট্রীয়ায় বিদ্রোহের প্রসার

বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠল খাস অস্ট্রিয়ায়, প্রতিক্রিয়ার প্রধান কেন্দ্রে, মেটারনিকের দেশে। মেটারনিকের আমলে অস্ট্রিয়ায় ব্যক্তি-স্বাধীনতার কণ্ঠরোধ করা হয়েছিল, দেশে চলছিল পুলিসরাজ। দেশের জনসাধারণ এই অত্যাচারী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ১৩ই মার্চ তারিখে অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় ছাত্র ও শ্রমিকেরা শোভাযাত্রা করে সম্রাটের

মেটারনিকের পতন

অট্টালিকা ও মেটারনিকের বাড়ি ঘেরাও করল এবং অগ্নি নিক্ষেপ করল। মেটারনিকের চোখের সামনে তাঁর বাড়ি দাউ দাউ করে পুড়তে লাগল। শহরের রক্ষীবাহিনী ও পুলিস বিপ্লবী জনতাকে সাহায্য করতে অগ্রসর হল। অবস্থা আয়ত্তের বাইরে দেখে মেটারনিক পদত্যাগ করলেন এবং গোপনে ভিয়েনা থেকে পালিয়ে গিয়ে লণ্ডনে আশ্রয় গ্রহণ করলেন।

অস্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যের মধ্যেও ভাঙন ধরল। হাঙ্গেরী এই সময়ে ছিল অস্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। হাঙ্গেরীর জনসাধারণ এই সাম্রাজ্যের অধীনতা-পাশ থেকে মুক্তি চাইল। হাঙ্গেরী **লুই কসাথ** নামে জনৈক দেশপ্রেমিকের নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করল।

হাঙ্গেরীতে স্বাধীনতা আন্দোলন : লুই কসাথ

ইংলণ্ডেও এই অভ্যুত্থানের ঢেউ গিয়ে পৌঁছাল। এই সময়ে ইংলণ্ডের শ্রমিক শ্রেণী একটি রাজনৈতিক শক্তিরূপে আবির্ভূত হয়েছিল এবং নিজেদের দাবি-দাওয়া সংবলিত একটি সনদ (Charter) পার্লামেন্টের কাছে পেশ করল। ইংলণ্ডের শ্রমিক শ্রেণীর এই আন্দোলনটি **চার্টিস্ট আন্দোলন** নামে খ্যাত।

ইংলণ্ডে চার্টিস্ট আন্দোলন

ক্রমে ক্রমে ইতালী, জার্মানী, ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশেও বিপ্লব দেখা দিল।

এইভাবে ১৮৩০ থেকে ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সমস্ত ইওরোপ গণ-অভুত্থানের এক উত্তাল তরঙ্গে মথিত হয়ে উঠেছিল। এমন কি রাশিয়া, সুদূর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এবং দক্ষিণ আমেরিকাও এই সময়ে চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। বস্তুত ১৮৪৮—এই বছরটিকে 'বিপ্লবের বছর' বললে অত্যুক্তি হয় না।

মেটারনিক-ব্যবস্থা
[Metternich System]

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লব ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত 'ভিয়েনা ব্যবস্থা'র পতন ঘটাল। ১৮১৫ থেকে ১৮৪৮—এই ক'বছর ইওরোপের রাজনীতিতে প্রধান ব্যক্তি ছিলেন **মেটারনিক**। তিনি ছিলেন অস্ট্রিয়ার প্রধান মন্ত্রী। তাঁর সময়ে অস্ট্রিয়া মধ্য ইওরোপের সর্বপ্রধান রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করেছিল। এই সাম্রাজ্যের মধ্যে বাস করত নানা জাতির লোক, অস্ট্রিয়ান, হাঙ্গেরিয়ান, বোহেমিয়ান, চেক প্রভৃতি। তাছাড়া, ভিয়েনা-ব্যবস্থার ফলে অস্ট্রিয়া ইতালী ও জার্মানীতেও নিজ প্রভুত্ব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল।

মেটারনিক ছিলেন সামন্তবংশসম্ভূত। মতবাদের দিক থেকে তিনি ছিলেন গোঁড়া রক্ষণশীল। তিনি ফরাসী বিপ্লবের সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণীকে ঘৃণা করতেন এবং পুরানো ভাব-ধারা সারা জীবন তিনি আঁকড়ে ছিলেন। বিপ্লব-পূর্ব ব্যবস্থা অর্থাৎ স্বৈরাচারী

মেটারনিকের মতামত

রাজতন্ত্র, ক্যাথলিক চার্চের একাধিপত্য, সামন্তপ্রভুদের একাধিপত্য প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে যে ব্যবস্থা ইওরোপে বহুকাল কায়েমী হয়ে ছিল তিনি তার ছিলেন গোঁড়া ভক্ত। ফরাসী বিপ্লবপ্রসূত গণতন্ত্রবাদ বা জাতীয়তাবাদ এই দুটিকে তিনি যমের মত ভয় করতেন এবং সারা জীবন তিনি এই দুটি মতবাদকে ইওরোপ থেকে নির্বাসিত করার জন্য সচেষ্ট ছিলেন।

মেটারনিকের লক্ষ্য ছিল অস্ট্রিয়াকে একটি আদর্শ রক্ষণশীল রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তোলা। বাইরে থেকে বিপ্লবী মতবাদের ঢেউ যাতে অস্ট্রিয়াতে এসে প্রবেশ করতে না পারে তার জন্য তিনি সংবাদ পরিবেশন তদারকের ব্যবস্থা করলেন, সংবাদপত্রের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখলেন, স্কুলে-কলেজে রক্ষণশীল যাজকদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করলেন এবং পুলিসের ক্ষমতা বৃদ্ধি করলেন। বস্তুত তিনি অস্ট্রিয়ায় গড়ে তুললেন একটি পুলিস রাষ্ট্র। অস্টিয়ার সাম্রাজ্যভুক্ত হাঙ্গেরী, বোহেমিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে জাতীয় আন্দোলন বন্ধ করার জন্য তিনি এই সব অঞ্চলের দেশপ্রেমিকদের জেলে বন্দী করে রাখলেন এবং এই সব অঞ্চলে অস্ট্রিয়ার সৈন্য মোতায়েন করলেন।

অস্টিয়ার প্রধানমন্ত্রী হিসাবে

শুধু অস্টিয়া নয় এই সময়ে ইওরোপের কয়েকটি দেশের রাজনীতি তাঁর অঙ্গুলি হেলনে চলত। তাই বলা চলে ইওরোপে এই সময়ে দেখা দিয়েছিল 'মেটারনিক-ব্যবস্থা' (Metternich System)।

মেটারনিক-ব্যবস্থা

ইতালীতে ও জার্মানীতে মেটারনিকের নির্দেশে স্বৈরাচারী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। জার্মানীতে বিপ্লবী আন্দোলন দমন করার অজুহাতে 'কার্লসবাড ডিক্রি' (Carlsbad Decrees) নামে একটি কালা আইন তিনি পাস করেন। এর ফলে স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের উপর কড়া নজর রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বন্ধ করা হয় এবং নিয়মতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা নিষিদ্ধ করা হয়।

শুধু জার্মানী কেন, মেটারনিক সমগ্র ইওরোপেই বিপ্লব দমনে অগ্রণী ছিলেন। তাঁর উদ্যোগে ইওরোপ "চতুঃশক্তি সম্মিলন" (Quadruple Alliance) গড়ে উঠেছিল। এই সম্মিলনের সভ্য ছিল অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া, রাশিয়া ও ইংলণ্ড। বিপ্লবের গতিরোধ কার্য এই সংগঠনের উদ্দেশ্য ছিল। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে নেপল্‌স, পিডমণ্ট, স্পেন, পর্তুগালের

বিদ্রোহ মেটারনিক দমন করেন। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে ইতালী ও জার্মানীতে তিনি বিপ্লবের অগ্রগতি রোধ করেন।

কিন্তু যুগধর্মের বিরুদ্ধে তিনি তাঁর জীবন উৎসর্গ করায় তাঁর পতন ছিল অনিবার্য। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবতরঙ্গে মেটারনিক-ব্যবস্থা ভেঙে খান খান হয়ে যায়। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিক্রিয়ার মূলকেন্দ্র অস্ট্রিয়াতেও বিপ্লবের রণধ্বনি শোনা যায়। অস্ট্রিয়ায় বিপ্লব সফলতা লাভ করায় মেটারনিককে অস্ট্রিয়া থেকে পলায়ন করে ইংলণ্ডে গিয়ে আশ্রয় নিতে হয়।

মেটারনিকের পতন

মেটারনিকের পতন একটি বড় ঐতিহাসিক ঘটনা ; কেননা মেটারনিকের পতনে শুধু একটি ব্যক্তির পতন ঘটে নাই, পতন ঘটেছিল 'মেটারনিকের ব্যবস্থার'ও।

ফ্রান্স ঃ তৃতীয় নেপোলিয়ন
(১৮৪৮—৭০)

আগেই বলা হয়েছে, ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী বিপ্লবের পরে ফ্রান্সে লুই ফিলিপের সরকারের পতন ঘটে এবং ফ্রান্সে দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রজাতন্ত্রের যুগে (১৮৪৮-৫২) ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন লুই নেপোয়িন বোনাপার্ট (Louis Napoleon Bonaparte)।

কিন্তু লুই নেপোলিয়নের প্রজাতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাস ছিল না। তাই তিনি ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে ২রা ডিসেম্বর নিজের হাতে সমস্ত রাষ্ট্রক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার উদ্দেশ্য নিয়ে আইনসভা ভেঙে দিলেন এবং নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করলেন। এখন থেকে ফ্রান্সে আরম্ভ হল দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের যুগ (১৮৫২—৭০)। এই দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের যুগে সমস্ত রাষ্ট্রক্ষমতাই সম্রাট **তৃতীয় নেপোলিয়নের** হাতে কেন্দ্রীভূত হল। তিনি ফ্রান্সে স্বৈরাচারী শাসন প্রতিষ্ঠা করলেন।

তৃতীয় নেপোলিয়ন ছিলেন প্রথম নোপোলিয়নের নিকট আত্মীয়। তাই তিনি জনসাধারণকে এই বলে মুগ্ধ করার চেষ্টা করলেন যে—প্রথম নেপোলিয়নের আদর্শই তাঁর আদর্শ ; তিনি প্রথম নেপোলিয়নের মত ফ্রান্সে প্রতিষ্ঠা করবেন দৃঢ় শাসন, তাঁর মতই তিনি ফ্রান্সে প্রতিষ্ঠা করবেন ঐক্য ও সংহতি এবং তাঁরই আদর্শ অনুযায়ী তিনি ইওরোপের রাজনীতিতে ফ্রান্সের প্রতিপত্তি স্থাপন

প্রথম নেপোলিয়নের নামের সুযোগ গ্রহণ

করবেন। প্রকৃতপক্ষে, প্রথম নেপোলিয়নের মত কল্পনা বা যোগ্যতা কোনটিই ছিল না তৃতীয় নেপোলিয়নের। তিনি নেপোলিয়নীয় আদর্শটি জনসাধারণের কাছে তুলে ধরেছিলেন জনসাধারণকে প্রতারিত করার জন্য। সেইজন্য তাঁকে প্রথম নেপোলিয়নের সঙ্গে তুলনা করে কেউ কেউ বলে থাকেন—প্রথম নেপোলিয়নকে যদি বলা যায় বড় নেপোলিয়ন (Napoleon the Great), তাহলে তৃতীয় নেপোলিয়নকে বলা যেতে পারে ছোট নেপোলিয়ন (Napoleon the Little)।

আভ্যন্তরীণ নীতি (Domestic Policy): সম্রাট হওয়ার পরে নেপোলিয়ন একটি নতুন গঠনতন্ত্র প্রবর্তন করলেন। এই গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সমস্ত ক্ষমতাই সম্রাটের হাতে কেন্দ্রীভূত হল। একটি আইন-সভা স্থাপন করা হল; প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার স্বীকার করা হল; কিন্তু এই আইনসভার হাতে সত্যিকার ক্ষমতা রইল না। আইনসভার গোপন অধিবেশনের ব্যবস্থা হল। আইনসভা আইন প্রনয়নের ক্ষমতা থেকেই বঞ্চিত রইল। এছাড়া, জনসাধারণের কতকগুলি মৌলিক অধিকার হরণ করা হল; জনসভা নিষিদ্ধ হল এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করা হল।

স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা

কিন্তু তৃতীয় নেপোলিয়নের আমলে ফ্রান্সে আর্থিক উন্নতি সাধিত হয়েছিল। এই সময়ে ফ্রান্স শিল্পোন্নত দেশে পরিণত হয়েছিল। এই সময়ে নতুন নতুন ব্যাঙ্ক গড়ে উঠেছিল। শিল্পের জোগান দিয়ে এই ব্যাঙ্কগুলি শিল্পোন্নয়নের কাজটিকে সাহায্য করেছিল। কতকগুলি কৃষি-ব্যাঙ্কও এই সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যাতায়াত ব্যবস্থারও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল এবং নতুন নতুন রেলপথ, খাল, জাহাজ, টেলিগ্রাফ প্রভৃতি নির্মাণ করা হয়েছিল।

আর্থিক উন্নতি

নেপোলিয়নের বাণিজ্য-নীতি ছিল উদার। তিনি অবাধ বাণিজ্য-নীতির পোষকতা করতেন। শুল্কের পরিমাণ তিনি হ্রাস করেন এবং গ্রেট ব্রিটেনের সঙ্গে বাণিজ্য-চুক্তি সম্পাদন করেন।

প্যারিস নগরীকে তিনি বহু সুরম্য অট্টালিকা ও পুষ্পোদ্যানে সুশোভিত করেন।

কিন্তু আভ্যন্তরীণ নীতি পরিচালনায় তিনি গণতন্ত্রের নীতি গ্রহণ না করায় ফ্রান্সের অগণিত জনসাধারণের বিরাগভাজন হন।

বৈদেশিক নীতি (Foreign Policy) : বৈদেশিক নীতিতেও তিনি সাফল্য অর্জন করতে পারেন নি। বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল : ইওরোপে ও ইওরোপের বাইরে নতুন নতুন রাজ্য দখল করে ফ্রান্সের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করা। কিন্তু এই প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করতে হলে যে সুগঠিত সৈন্যবাহিনীর একান্ত প্রয়োজন তা তিনি অনুভব করেন নি, বা অনুভব করলেও শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠন করতে সক্ষম হন নি। তাছাড়া তাঁর না-ছিল মনোবল, না-ছিল দৃঢ় প্রত্যয়। নানা দ্বিধা, দ্বন্দ্ব ও অসঙ্গতির ফলে তাঁর বৈদেশিক নীতি তিনি কখনও সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত করতে পারেন নি!

ক্রিমিয়ার যুদ্ধে যোগদান

ইতালীর ঐক্য আন্দোলনে আংশিক সাহায্য

মেক্সিকো অভিযান

বৈদেশিক নীতিতে তাঁর অন্যতম কীর্তি হল ক্রিমিয়ার যুদ্ধে যোগদান। এই যুদ্ধে যোগ দেওয়ায় ফ্রান্সের প্রতিপত্তি ইওরোপে বৃদ্ধি পেয়েছিল। ইতালীর ঐক্য আন্দোলনে তিনি আংশিক সাহায্য দান করেন। কিন্তু ইতালীর কাছে প্রতিদান হিসাবে সেভয় ও নিস্ নামে ইতালীর দুটি ভূখণ্ড দাবি করায় তিনি ইতালীবাসীর কৃতজ্ঞতালাভে বঞ্চিত হন। এর পরে তিনি মেক্সিকোতে একটি সামরিক অভিযান প্রেরণ করেন। তিনি সেখানে প্রজাতন্ত্রের ধ্বংস সাধন করে রাজা হিসাবে নিজের একজন প্রতিনিধিকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র যখন হুমকী দিল যে তারা নেপোলিয়নকে বাধা দেবে, তখন নেপোলিনন ভয় পেলেন এবং গভীর পরাজয় বরণ করে এই অঞ্চল থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করেন। মেক্সিকো অভিযানের ব্যর্থতায় নেপোলিয়নের প্রভাব-প্রতিপত্তি আরও হ্রাস পেল।

জার্মানীর কাছে পরাজয় বরণ

কিন্তু নেপোলিয়ন সব চেয়ে বেশী আঘাত পেলেন জার্মানীর কাছ থেকে। জার্মানী এই সময়ে বিসমার্কের নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসাবে ইওরোপে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিল। জার্মানী ফ্রান্সের প্রতিপত্তি ধ্বংস করে মধ্য ইওরোপে নিজের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার ইচ্ছুক ছিল। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানী ও ফ্রান্সের মধ্যে যে যুদ্ধটি বেধেছিল সেই যুদ্ধে ফ্রান্স পরাজিত হল। সিডানের যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে ফ্রান্সের প্রতিপত্তির যুগ শেষ হল।

সিডানের যুদ্ধে পরাজয়ের পরে তৃতীয় নেপোলিয়নের পতন ঘটল এবং সেই সঙ্গে পতন ঘটল ফ্রান্সের দ্বিতীয় সাম্রাজ্যেরও।

পঞ্চম অধ্যায়

জাতীয় ঐক্য আন্দোলন

[National Unification Movements]

জাতীয়তা, স্বাধীনতা ও ঐক্যের দাবী নিয়ে এই সময়ে ইওরোপে কয়েকটি দেশে আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের ঔপনিবেশিক মুক্তির আদর্শ এবং ফরাসী বিপ্লবের সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার আদর্শ পরাধীন ও অর্ধস্বাধীন দেশের লোকের মধ্যে নব জাগরণ সৃষ্টি করল। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ ও ফরাসী বিপ্লব পদানত দেশের লোককে জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার (right of self-determination) সম্পর্কে বিশেষ সচেতন করে তুলেছিল।

মধ্য ইওরোপে ইতালী ও জার্মানীতে এই সময়ে জাতীয় স্বাধীনতা ও জাতীয় ঐক্যের আন্দোলন দুর্বার হয়ে উঠেছিল।

ইতালীর ঐক্য আন্দোলন

[Unification of Italy]

পটভূমিকা (Background) : প্রাচীনকালে ইতালীতে বিখ্যাত রোমক সাম্রাজ্যের উদ্ভব হয়েছিল। কিন্তু রোমক সাম্রাজ্যের পতনের পরে ইতালীতেও নেমে এসেছিল ঘন অন্ধকার। এই সময়ে ইওরোপের বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি ইতালী দখল করে নিয়েছিল।

ঐক্য আন্দোলনের পূর্বেকার ইতালী

একটা দেশে যে যে উপাদান থাকলে দেশের ঐক্য ও জাতীয়তাবোধ জাগতে পারে, তার প্রত্যেকটাই বর্তমান ছিল ইতালীতে। ইতালীর বিভিন্ন অংশের ও বিভিন্ন রাষ্ট্রের লোকেরা একই ভাষায় কথা বলত। একই ধরনের জীবনধারা ছিল সর্ব অংশেই প্রচলিত। কাজেই ইতালীর অধিবাসীদের মধ্যে অস্পষ্টভাবে একটা ঐক্যবোধ ও জাতীয়তাবোধ আগাগোড়াই বর্তমান ছিল।

এই জাতীয়তাবোধের গোড়াটি অনেকটা শক্ত হয়েছিল নেপোলিয়নের ইতালী বিজয়ের ফলে। নেপোলিয়ন ছিলেন বিদেশী, কিন্তু তবুও তিনি

ইতালীকে একরাষ্ট্রে বাঁধতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু নেপোলিয়নের শাসন ইতালীতে স্থায়ী হয় নাই। নেপোলিয়নের পরাজয়ের পরে ভিয়েনা সম্মেলনের নেতাদের হাতেই আবার গিয়ে পড়ল ইতালীর ভবিষ্যৎ।

ভিয়েনা সম্মেলন ও ইতালী

ইতালীকে আবার সেই নেপোলিয়ন-পূর্ব অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। ভিয়েনা সম্মেলনের নেতাদের কাছে জাতীয়তা, স্বাধীনতা, ঐক্য—এগুলি ছিল অপরাধ। তাই তাঁরা ইতালীকে করে রাখতে চাইলেন পর-নির্ভরশীল, বিচ্ছিন্ন এবং পঙ্গু।

মেটারনিক ইতালীকে দুর্বল করে রাখার সপক্ষে যুক্তি দিতে ছাড়লেন না। তিনি বললেন—ইতালী ভূগোলের দিক থেকে এক, কিন্তু রাজনীতির দিক থেকে এক হবার যোগ্যতা তার নাই। এখানে মনে রাখা দরকার, ইংরেজরাও ভারতবর্ষকে যখন স্বাধীনতা দিতে চাইত না, তখন কৈফিয়ত হিসাবে বলত যে ভারতবর্ষের ঐক্যবদ্ধ হবার যোগ্যতা নাই।

ইতালী আটটি রাষ্ট্রে বিভক্ত

মেটারনিক ইতালীকে একটা দুটো নয়, আটটা আলাদা আলাদা রাষ্ট্রে বিভক্ত করে রাখলেন। দক্ষিণে নেপল্স ও সিসিলি নিয়ে গড়ে উঠল একটা রাষ্ট্র। নেপল্সের উত্তরে পোপের কর্তৃত্বে একটি অংশ নিয়ে গড়ে তোলা হল আর একটি রাষ্ট্র। তাছাড়া, টাসকেনী, মডেনা, পার্মা, প্রভৃতি নিয়ে গড়ে উঠল আলাদা আলাদা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র। উত্তরে লোম্বার্ডি ও ভেনেসিয়া—এই দুটি অঞ্চলকে অস্ট্রিয়ার কর্তৃত্বভুক্ত করা হল। উপরোক্ত পার্মা, মডেনা, টাসকেনীতে অস্ট্রিয়ার পরোক্ষ কর্তৃত্ব স্থাপন করা হল। অর্থাৎ অস্ট্রিয়া ও পোপ—এই দুইয়ের কর্তৃত্বাধীনে ইতালীকে আনা হল।

স্বাধীন রাষ্ট্র: পিডমন্ট সার্ডিনিয়া

কিন্তু এই অন্ধকারের মধ্যেও একটু আলো দেখা গেল। পিডমন্ট-সার্ডিনিয়া নামে উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত একটি অংশে ইতালীর নিজস্ব একটি রাজবংশ স্বাধীনভাবে রাজত্ব করার অধিকার পেয়েছিল। এই ছোট্ট অংশটির তখন প্রভাব ছিল না মোটেই। কিন্তু ক্রমশ এই স্বাধীন অঞ্চলটিকে ঘিরেই ইতালীর লোকেরা ঐক্য ও জাতীয়তার আন্দোলনে অগ্রসর হয়েছিল।

কারবোনারি পর্ব (Carbonari Period): ভিয়েনা সম্মেলন ইতালী সম্পর্কে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করল সেটা ইতালীর অধিবাসীরা প্রথম

থেকেই অপছন্দ করতে লাগল। কিন্তু অস্ট্রিয়ার সৈন্যবাহিনীর হুমকিতে ইতালীর জনসাধারণের অসন্তোষ প্রকাশের কোন বৈধ সুযোগ ছিল না।

কারবোনারি সমিতি

তাই তাদের অসন্তোষ গোপন পথে আত্মপ্রকাশ করতে লাগল। ইতালীর দেশপ্রেমিকেরা জাতির ঐক্য ও স্বাধীনতা অর্জনের উদ্দেশ্য নিয়ে গড়ে তুলল এক গুপ্ত সমিতি। এই



বিভক্ত ইতালীর রাষ্ট্র-ব্যবস্থা

সমিতির নাম ছিল **কারবোনারি (Carbonari)**। নেপল্‌সে এই সমিতি প্রথম জন্মলাভ করে এবং পরে ইতালীর সর্বত্র এই সমিতিটি প্রভাব বিস্তার করে। এই সমিতিটি ইতালীর জনসাধারণকে দেশের স্বাধীনতা অর্জন করার জন্য অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করল।

এই সমিতির উদ্যোগেই ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে নেপল্‌সে ও পিডমণ্টে গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবিতে একটি বিপ্লব সংগঠিত হয়েছিল। কিন্তু অস্ট্রিয়া বলপ্রয়োগ করে এই দুই দেশেই বিপ্লব দমন করিতে সক্ষম হয়েছিল।

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সে যখন আবার বিপ্লব হয়েছিল, তখন সেই বিপ্লবের প্রভাবে ইতালীর জনগণও চঞ্চল হয়ে উঠে। এইবার পার্মা ও মডেনা নামে যে দুটি রাষ্ট্র ছিল সেখানে বিপ্লব দেখা দেয়। কিন্তু এবারও অস্ট্রিয়ার সেনাবাহিনী এসে এই বিপ্লব দমন করে।

১৮২০ ও ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের এই দুই বিপ্লব থেকেই ইতালীয়ানরা বুঝতে পারল যে তাদের প্রধান শত্রু হল বিদেশী রাষ্ট্র—অষ্ট্রিয়া। তাই অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে তারা আরও ব্যাপক সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে লাগল।

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ফরাসী বিপ্লব ও ইতালী

ক্রমে ক্রমে ইতালীতে নাটক, কবিতা ও উপন্যাসের মাধ্যমে এক নব-জাগরণ আরম্ভ হল। এই নবজাগরণ ইতালীর 'রিসর্জিমেণ্টো' (The Italian Risorgimento) নামে বিখ্যাত।

নবজাগরণ

মাৎসিনি (Mazzini): এই নব জাগরণের যুগে ইতালীর নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন **মাৎসিনি।**

মাৎসিনি

বাস্তবিক পক্ষে, মাৎসিনি হলেন ইতালীর জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের গুরু, এই আন্দোলনের পিতা।



মাৎসিনি

মাৎসিনি ছিলেন জেনোয়ার অধিবাসী, এক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের পুত্র। যৌবনে তিনি 'কারবোনারি' সমিতিতে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেন। তিনি প্রগতিশীল ভাবধারায় ছিলেন উদ্বুদ্ধ। মাৎসিনির আগে ইতালীর স্বাধীনতা আন্দোলন ছিল অনেকটা স্বতঃস্ফূর্ত, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত, স্থানীয় ও

বিচ্ছিন্ন। মাৎসিনিই সর্বপ্রথম এই আন্দোলনটিকে একটি সামগ্রিক রূপ দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

'নবীন ইতালী' আন্দোলন

মাৎসিনি **নবীন ইতালী** নামে একটি সমিতি গঠন করলেন। এই 'নবীন ইতালী' জাতীয় আন্দোলনে নতুন পর্যায়ের সূচনা করল। মাৎসিনি জাতীয় আন্দোলনের সম্মুখে একটি নতুন কর্মসূচী উপস্থিত করলেন। তিনি বললেন প্রথমেই প্রয়োজন অস্ট্রিয়ার কবল থেকে ইতালীকে মুক্ত করা। দ্বিতীয়ত, বিদেশীর কবল থেকে ইতালীকে মুক্ত করতে হলে প্রয়োজন সারা ইতালীব্যাপী এক ঐক্যবদ্ধ জাতীয় আন্দোলন—যে আন্দোলনে ছাত্র ও যুবকেরা হবে প্রধান শক্তি। তৃতীয়ত, অস্ট্রিয়াকে বিতাড়িত করে ইতালীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলিকে ভেঙে ফেলে সেখানে গড়ে তুলতে হবে সারা ইতালী নিয়ে একটি স্বাধীন প্রজাতন্ত্র।

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ফরাসী বিপ্লব ও ইতালী

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের বিপ্লবের পরে ইতালীতে যখন নতুন করে বিপ্লবী চেতনা আত্মবিকাশের পথ খুঁজতে লাগল, তখন মাৎসিনি সেই চেতনাকে রূপ দিতে চেষ্টা করলেন। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব লক্ষ্য করা গেল ইতালীতে একটির পর একটি প্রদেশে।

লোম্বার্ডিতে বিদ্রোহ

প্রথমেই বিদ্রোহ করল লোম্বার্ডি। লোম্বার্ডিতে অস্ট্রিয়ার আধিপত্যের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। এই সময়ে অস্ট্রীয়া লোম্বার্ডি থেকে তামাকের উপর কর বসিয়ে অনেক টাকা রোজগার করত। লোম্বার্ডির শহর মিলানের লোকেরা তামাক খাওয়া বর্জন করল এবং রাজপথে কোন অস্ট্রিয়ানকে তামাক খেতে দেখলে তারা আক্রমণ সুরু করল। এইভাবে মিলানে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে 'তামাক হাঙ্গামা' আরম্ভ হয়েছিল। অস্ট্রিয়া অবশ্য অস্ত্রপ্রয়োগ করে এই বিদ্রোহ দমন করেছিল।

মিলানে তামাক হাঙ্গামা

ভেনেসিয়ার বিদ্রোহ

লোম্বার্ডি থেকে বিদ্রোহ ভেনেসিয়ায় ছড়িয়ে পড়ল। এখানে একটি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হল। এখানেও অবশ্য শেষ পর্যন্ত অস্ট্রিয়া তার আধিপত্য ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিল।

কিন্তু বিদ্রোহের ব্যাপকতা ক্রমশই বাড়তে লাগল। শেষ পর্যন্ত রোমও বিদ্রোহের আবর্তে জড়িয়ে পড়ল। রোমে পোপ ছিলেন কর্তা। পোপের

বিরুদ্ধে আরম্ভ হল জন-অভ্যুত্থান। পোপ পালিয়ে গেলেন। মাৎসিনির উদ্যোগে রোমে প্রতিষ্ঠা হল প্রজাতন্ত্র। কিন্তু এখানেও বিপ্লব শেষ পর্যন্ত জয়যুক্ত হতে পারে নাই। ফ্রান্সের রাজা তৃতীয় নেপোলিয়ন সৈন্য পাঠিয়ে পোপকে আবার পূর্ব ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করলেন।

রোমে গণ-অভ্যুত্থান

অস্ট্রিয়া এই বিপ্লবের নায়ক মাৎসিনিকে ইতালী থেকে বিতাড়িত করল। মাৎসিনি ইংলণ্ডে গিয়ে নির্বাসিত জীবন যাপন করতে বাধ্য হলেন।

মাৎসিনি নির্বাসিত

কাউণ্ট কাভ্যুর (Count Cuvour) : দেশের মধ্যে সবাই যে মাৎসিনির মত সমর্থন করত তা নয়। একদল লোক ছিল যারা ইতালীর ঐক্য চাইলেও গণঅভ্যুত্থান পছন্দ করত না। সার্ডিনিয়ার রাজাকে ঘিরে উদারনৈতিক মত অনুযায়ী ইতালীতে একটি জাতীয় রাষ্ট্র গড়ে তোলাই ছিল এই দলের লক্ষ্য। এঁদের কাছে মাৎসিনির প্রজাতন্ত্রের আদর্শটি গ্রহণযোগ্য ছিল না। তাঁরা ছিলেন নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের পক্ষপাতী। এই দলের নেতা ছিলেন কাউণ্ট কাভ্যুর। কাভ্যুর প্রজাতান্ত্রিক আদর্শে বা গণ-আন্দোলনে বিশ্বাস করতেন না। তিনি ভাবতেন নিয়মতন্ত্রের পথে ইতালীতে জাতীয় রাষ্ট্র গড়ে তুলতে হবে। তিনি ছিলেন ইংলণ্ডের নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের গোঁড়া ভক্ত। তিনি বলতেন, প্রজাতন্ত্রের বদলে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রকেই ইতালীর আদর্শ হিসাবে স্বীকার করা উচিত। গণ-আন্দোলনে বিশ্বাস না করায় তিনি ভাবতেন—ইতালী নিজের শক্তিতে কোনদিন স্বাধীন হতে পারবে না। তাই তিনি বলতেন—স্বাধীন হতে গেলে ইতালীর চাই বিদেশী সাহায্য।

কাভ্যুরের মতামত



কাভ্যুর

মাৎসিনির নির্বাসনের পরে কাভ্যুরের চিন্তাধারা অনুযায়ীই ইতালীর আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল। কাভ্যুর ছিলেন স্বাধীন ইতালীর একমাত্র

অংশ পিডমণ্ট-সার্ডিনিয়ার প্রধান মন্ত্রী। সার্ডিনিয়ার রাজা **ভিক্টর ইমানুয়েল** ছিলেন তাঁর পরম সমর্থক। তাই পিডমণ্টকে কেন্দ্র করে কাভ্যুর তাঁর কল্পনাকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করলেন।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধে ইতালীর যোগদান

এই সময়ে ইওরোপে "ক্রিমিয়ার যুদ্ধ" চলছিল। তিনি অনেকটা অনাহূত হয়েই এই যুদ্ধে যোগ দিলেন। পিডমণ্ট ক্রিমিয়ার যুদ্ধে যোগ দেওয়ার ফলে ইওরোপের দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

তৃতীয় নেপোলিয়নের ভূমিকা—ফ্রান্সের রাজা তৃতীয় নেপোলিয়ন কাভ্যুরকে ইতালীর জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার কাজে সহযোগিতার আশ্বাস দিলেন। ইতালীর ঐক্য আন্দোলনের প্রতি তৃতীয় নেপোলিয়নের সহানুভূতি ছিল। কাভ্যুর তা ভালভাবে জানতেন। তাই তিনি তৃতীয় নেপোলিয়নের সঙ্গে প্লমবিয়ার্স নামক একটি স্থানে নিভৃতে মিলিত হলেন। সেখানে নেপোলিয়ন ও কাভ্যুরের মধ্যে প্লমবিয়ার্সের চুক্তি (Pact of Plombiers) স্বাক্ষরিত হল। এই চুক্তিতে স্থির হল অস্ট্রিয়া যদি ইতালীকে আক্রমণ করে তাহলে তৃতীয় নেপোলিয়ন ইতালীর সাহায্যে এগিয়ে আসবেন। আরও স্থির হল প্রতিদানে ইতালী নেপোলিয়নকে নাইস (Nice) এবং সেভয় পুরস্কার দেবে। বস্তুত ফ্রান্সের সাহায্য পেয়ে

অস্ট্রীয়া ও ইতালীর মধ্যে যুদ্ধ

কাভ্যুর নিজেকে শক্তিশালী মনে করলেন। অস্ট্রিয়া কাভ্যুরের এই কাজকর্ম পছন্দ করল না এবং পিডমণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। ফ্রান্স পিডমণ্টকে সমর্থন করায় ইতালী অস্ট্রিয়াকে যুদ্ধে হারিয়ে দিতে পারল। কিন্তু ইতালী যখন জয়ের পথে তখন তৃতীয় নেপোলিয়ন হঠাৎ সাহায্য বন্ধ করে দিলেন। কাভ্যুর পিডমণ্টের

লোম্বার্ডি পিডমণ্টের অন্তর্ভুক্ত

রাজাকে বললেন যুদ্ধ চালিয়ে যেতে। কিন্তু রাজা ভরসা না পাওয়ায় ইতালীকে অস্ট্রিয়ার সঙ্গে সন্ধি করতে হল। এই সন্ধিতে পিডমণ্টের রাজ্যের মধ্যে লোম্বার্ডিকে অন্তর্ভুক্ত করা হল।

পার্মা, মডেনা, টাসকেনীতে গণভোট

এই সময়ে পার্মা, মডেনা, টাসকেনী প্রভৃতিতেও দারুণ উত্তেজনা চলেছিল। স্থানীয় জনসাধারণ অস্ট্রিয়ার তাঁবেদারদের পছন্দ করছিল না। কাভ্যুরের উদ্যোগে স্থির হল এই অঞ্চলের অধিবাসীরা গণভোটের সাহায্যে স্থির করবে

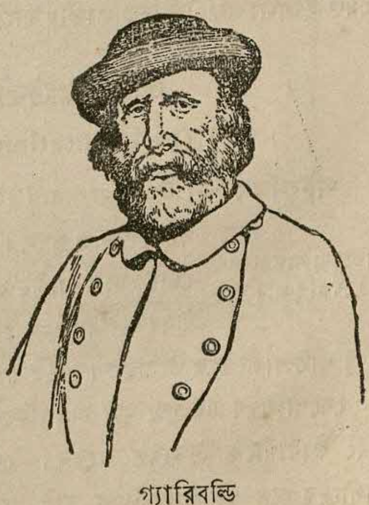
তারা আলাদা থাকবে না পিডমণ্টের সাথে সংযুক্ত হবে। গণভোট নেওয়া হল। দেখা গেল, রাজ্যের প্রায় প্রত্যেকটি লোকই রায় দিল পিডমণ্টের সঙ্গে সংযুক্তির পক্ষে। কাজেই এই অঞ্চলগুলিও লোম্বার্ডির মত পিডমণ্টের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ায় পিডমণ্ট, লোম্বার্ডি এবং এই অঞ্চলগুলি নিয়ে ইতালীতে একটি ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র গঠিত হল। কিন্তু ভেনেসিয়া রয়ে গেল অস্ট্রিয়ার কর্তৃত্বে। রোম রইল পোপের অধীন। সিসিলী তখনও আলাদা। কাজেই ইতালীর ঐক্য আন্দোলন তখন আংশিক জয়ের সম্মুখীন মাত্র।

পিডমণ্টের সঙ্গে সংযুক্তির পক্ষে ভোটদান

কিন্তু এই সময়ে সিসিলীতে দেখা দিল বিদ্রোহ। সিসিলীর বিদ্রোহের খবর পেয়ে তাকে মুক্ত করতে এগিয়ে গেলেন **গ্যারিবল্ডি**।

গ্যারিবল্ডি (Garibaldi): গ্যারিবল্ডি ছিলেন মাৎসিনির শিষ্য, কারবোনারি যুগ থেকে বিপ্লবের আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত। বীরত্বের জন্য তিনি খ্যাত ছিলেন। প্রজাতন্ত্রের আদর্শের প্রতি তাঁর ছিল পরম শ্রদ্ধা। গ্যারিবল্ডি ছিলেন নীসের অধিবাসী। প্রথম জীবনে তিনি সার্ডিনিয়ার রাজার নৌবাহিনীতে একজন সৈনিক মাত্র ছিলেন। মাৎসিনির প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে তিনি 'নবীন ইতালী' আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন। 'নবীন ইতালী' আন্দোলনের দুটি আদর্শ—জাতীয়তাবাদ (nationalism) ও প্রজাতন্ত্রবাদ (republicanism) তাঁর মনে সাড়া জাগিয়েছিল।

গ্যারিবল্ডির মতামত



গ্যারিবল্ডি

অসমসাহসী গ্যারিবল্ডি নৌবিদ্রোহে যোগ দেওয়ায় মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন। কিন্তু এই দণ্ড এড়াবার জন্য তিনি দক্ষিণ আমেরিকায় পলায়ন করেন। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইতালীতে ফিরে এসে ইতালীর প্রজাতান্ত্রিক বিপ্লবে আবার ঝাঁপিয়ে পড়েন। কিন্তু এই বিপ্লব ব্যর্থ হওয়ায় তিনি উত্তর

আমেরিকায় গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পুনরায় ইতালীতে ফিরে আসেন এবং নিজের উদ্যোগে একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করেন—যাদের বলা হত লালকোর্তা বাহিনী (red shirts)। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে সিসিলীতে যখন বিপ্লব আরম্ভ হয় তখন তিনি সেই বিপ্লবী সেনাবাহিনী নিয়ে বিপ্লবকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসেন।

তিনি এক হাজার স্বেচ্ছাসেবকের এক বাহিনী নিয়ে সিসিলীতে গেলেন। তাঁর সৈন্যদের না-ছিল অস্ত্রশস্ত্র, না-ছিল ভাল শিক্ষা, কিন্তু তাদের ছিল প্রচুর মনোবল। গ্যারিবল্ডি সিসিলী দ্বীপ অধিকার করে নিলেন। তারপরে তিনি শুনলেন নেপল্‌সেও জনগণ বিদ্রোহ করেছে। তিনি অমনি সেখানেও এগিয়ে গেলেন এবং নেপল্‌সের জনগণকে অত্যাচারী শাসকদের হাত থেকে মুক্ত করলেন। গ্যারিবল্ডির চেষ্টায় এই দুটি অঞ্চলও পিডমন্টের সঙ্গে সংযুক্ত হল।

সিসিলী ও নেপল্‌সে বিদ্রোহ

সিসিলী ও নেপল্‌সের পিড্‌মন্টের সঙ্গে সংযুক্তি

এর পরে পোপের কর্তৃত্বাধীন অঞ্চলগুলিতেও গণভোট নেওয়া হল। এই অঞ্চলের জনসাধারণও পিডমন্টের সঙ্গে সংযুক্তির পক্ষে মত দিল। শুধু ভেনেসিয়া ও রোম ছাড়া সমস্ত ইতালী হল ঐক্যবদ্ধ। পরে ভেনেসিয়া ও রোমও পিডমন্টের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় সমস্ত ইতালী এক ঐক্যবদ্ধ জাতীয় রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল।

ভেনেসিয়া ও রোম

জার্মানীর ঐক্য আন্দোলন

[The Unification of Germany]

পটভূমিকা—(Background): ইতালীর মতই জার্মানীও ছিল বহুবিভক্ত ও দুর্বল। নেপোলিয়নের আগে জার্মানী ছিল ছোট ছোট রাষ্ট্রের সমষ্টি মাত্র। অস্ট্রিয়া সারা জার্মানীর উপর আধিপত্য করত। ক্রমশ জার্মানীতে আরও একটি রাষ্ট্র শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। এই রাষ্ট্রটির নাম প্রাশিয়া।

ভিয়েনা সম্মেলনের পূর্বেকার জার্মানী

নেপোলিয়ন এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলিকে অস্ট্রিয়ার কবল থেকে মুক্ত করেন এবং জার্মানীকে ঐক্যবদ্ধ করেন। নেপোলিয়নের পতনের পরে জার্মান-বাসীদের মনে এক জাতি, এক রাষ্ট্র হিসাবে পরিগণিত হবার আকাঙ্ক্ষা জাগল।

কিন্তু তাদের আশা ভঙ্গ হল ভিয়েনা সম্মেলনের ব্যবস্থায়। মেটারনিক অস্ট্রিয়ার সংকীর্ণ স্বার্থে জার্মানীতে নেপোলিয়ন-পূর্ব অবস্থা ফিরিয়ে আনতে চাইলেন। ভিয়েনার নেতারা জার্মানীকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ৩৮টি রাজ্যে বিচ্ছিন্ন, বিভক্ত করে

ভিয়েনা সম্মেলন ও জার্মানী



জার্মানীর রাষ্ট্রসংঘ (১৮১৫-৬৬)

রাখলেন ; কার্যত এই খণ্ড,বিচ্ছিন্ন জার্মানীতে অস্ট্রিয়ার আধিপত্য পূরাপূরিই বজায় রইল।

ভিয়েনা সম্মেলনের এই বিধানে একমাত্র অস্ট্রিয়া ছাড়া আর কেউই খুশী

হল না। জার্মানীর জনসাধারণের মনে এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে গভীর অসন্তোষ ধূমায়িত হতে থাকল।

১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে ওয়ার্টবুর্গ শহরে মার্টিন লুথারের বিদ্রোহের তিন শত বৎসর অতিক্রান্তির স্মরণে একটি উৎসব উদ্‌যাপিত হল। এই উৎসবে উপস্থিত হয়ে জার্মানীর ছাত্র ও যুবকেরা জাতীয় ঐক্যের দাবি ঘোষণা করলেন। জার্মানীর জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার পথে যে শক্তিগুলি অন্তরায়, তাদের তীব্রভাবে নিন্দাবাদ করা হল। প্রতিক্রিয়াশীল লেখকদের পুস্তক নিয়ে বহ্ন্যুৎসব করা হল।

জার্মানীতে গণ-আন্দোলনের সূচনা

জার্মানীর যুবকদের মধ্যে এই রাজনৈতিক আলোড়ন দেখে মেটারনিক ভয় পেলেন। তিনি জার্মানীর লোকদের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা হরণ করলেন। সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করা হল। ছাত্র ও অধ্যাপকদের পীড়ন আরম্ভ হল। প্রতিবাদের স্বর শোনা গেলেই তাকে গ্রেপ্তার করে জেলে আটক রাখা হল। মেটারনিক যে আইনগুলির সাহায্যে এই সন্ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করলেন সেইগুলি **কার্লসবাড ডিক্রি** (Carlsbad Decrees) নামে পরিচিত।

মেটারনিক ও জার্মানীর আন্দোলন

কিন্তু মেটারনিক কিছুতেই এই ঐক্য আন্দোলন বন্ধ করতে পারলেন না। শুধু সাধারণ লোকেরা কেন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির শাসকেরা পর্যন্ত অনুভব করল যে এই অনৈক্য শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসারের পরিপন্থী।

এই সময় জার্মানীর একটি রাষ্ট্র থেকে আর একটি রাষ্ট্রে পণ্যদ্রব্য চালান দিতে হলে শুল্ক দিতে হত। ফলে, জার্মানীর এক অংশ থেকে আর এক অংশে মাল চালান দিতে হলে বহুবার বণিকদের শুল্ক দিতে হত। বার বার শুল্ক দেওয়ার জন্য বণিকদের খুব লোকসান হত। বাণিজ্যের উন্নতির পথে এই শুল্ক-ব্যবস্থা ছিল একটা বড় অন্তরায়।

প্রাশিয়া প্রস্তাব করল জার্মানীর এক অংশ থেকে আর এক অংশে পণ্যদ্রব্য চালান দেওয়ার জন্য শুল্ক-প্রথা রহিত করা হোক। প্রাশিয়ার প্রস্তাবে ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলিও সায় দিল। এই উদ্দেশ্যে প্রাশিয়া ও অন্যান্য রাষ্ট্র মিলিত হয়ে একটি শুল্ক সমিতি (১৮১৮) গঠন করল। এই শুল্ক সমিতির নাম দেওয়া হল **জোলভেরিন** (Zollverein)। অস্ট্রিয়া এই সমিতির সভ্যভুক্ত হয়

শুল্ক সমিতি : জোলভেরিন

নাই। কাজেই দেখা যায় যে, অস্ট্রিয়াকে বাদ দিয়ে প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জার্মানীর রাষ্ট্রগুলি অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে হলেও ঐক্যবদ্ধ হতে সক্ষম হল।

এইভাবে জার্মানীর ঐক্যবোধ আস্তে আস্তে দানা বাঁধতে লাগল।

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ফরাসী বিপ্লব ও জার্মানী

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ফরাসী বিপ্লবের খবর যখন জার্মানীতে এসে পৌঁছল তখন জার্মানীর দেশপ্রেমিকেরা ঐক্যের দাবিতে বিদ্রোহ সংগঠিত করলেন। কিন্তু অস্ট্রিয়া এই বিদ্রোহ দমন করল।

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ফরাসী বিপ্লব ও জার্মানী: বার্লিনে গণ অভ্যুত্থান

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ফরাসী বিপ্লবের খবর যখন জার্মানীতে এসে পৌঁছল তখন জার্মানীর জনসাধারণ আবার চঞ্চল হয়ে উঠল। একটির পর একটি রাষ্ট্রে জনসাধারণ বিদ্রোহ করতে লাগল। প্রাশিয়ার রাজধানী বার্লিনে ব্যক্তি-স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও জাতীয় ঐক্যের দাবিতে জনসাধারণের এক বিরাট অভ্যুত্থান দেখা দিল। প্রাশিয়ার রাজা এই দাবি কিছুটা মেনে নিতে বাধ্য হলেন।

সারা জার্মানীব্যাপী বিপ্লবের মুখে দাঁড়িয়ে জার্মানীর স্বাধীনতাকামী বুদ্ধিজীবী, বণিক প্রভৃতি একটি জাতীয় সম্মেলনে (১৮৪৮) মিলিত হলেন।

ফ্রাঙ্কফার্ট পার্লামেন্ট (১৮৪৮)

ফ্রাঙ্কফার্ট শহরে এই সম্মেলন বসেছিল। তাই এটি **ফ্রাঙ্কফার্ট পার্লামেন্ট** নামে বিখ্যাত। কিন্তু ফ্রাঙ্কফার্ট পার্লামেন্টে যাঁরা মিলিত হলেন তাঁদের দৃষ্টি স্বচ্ছ ছিল না। তাঁরা একদিকে যেমন অস্ট্রিয়ার আধিপত্য পছন্দ করতেন না, তেমনি আর একদিকে তাঁরা শ্রমিক ও কৃষকদের বিপ্লবী ভাবধারাকেও ভয় করতেন। তাই তাঁদের মনে দেখা দিল দ্বিধা। এই দ্বিধা-চিন্ততার জন্য তাঁরা জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। জার্মানীর ঐক্যবিধানে তাঁরা অক্ষমতা জ্ঞাপন করলেন। কেবল বাগাড়ম্বর সার হল। এইজন্য কার্ল মার্কস ফ্রাঙ্কফার্ট পার্লামেন্টের নিন্দা করে মন্তব্য করেছেন—এটি ছিল বৃদ্ধা কোন্দলরতা রমণীদের বকবকানির আখড়া মাত্র।

ফ্রাঙ্কফার্ট পার্লামেন্টের ব্যর্থতার পরে জার্মানীর ঐক্য গড়ার কাজটি গিয়ে পড়ল প্রাশিয়ার রাজা এবং তাঁর প্রধানমন্ত্রী বিসমার্কের উপর।

প্রাশিয়ার ঐক্য আন্দোলন ও বিসমার্ক (Unification of Germany: Bismarck) জনসাধারণের শক্তিতে বিসমার্কের কোন

বিশ্বাস ছিল না। তিনি ভাবতেন, জার্মানীতে জনসাধারণের শক্তিতে ঐক্য আনা সম্ভব নয়। তিনি বলতেন, জার্মানীতে ঐক্য আসবে বক্তৃতা বা অধিকাংশের ভোটের জোরে নয়—রক্ত ও শক্তির জোরে ; অর্থাৎ তাঁর ধারণা ছিল, প্রাশিয়ার সেনাবাহিনী যদি উদ্যোগ নিয়ে সারা জার্মানীকে ঐক্যবদ্ধ করতে অগ্রসর হয় তবেই জার্মানী ঐক্যবদ্ধ হবে।

প্রাশিয়া ও জার্মানীর ঐক্য আন্দোলন : বিসমার্কের মত

এই সময়ে প্রাশিয়ার রাজা ছিলেন **প্রথম উইলিয়াম (William I)**। তিনিও প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জার্মানীকে ঐক্যবদ্ধ করার নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। সেইজন্য প্রথমেই তিনি সৈন্যবাহিনীর সংস্কার সাধন করে প্রাশিয়ার বাহিনীকে পুনর্গঠিত ও শক্তিশালী করে তুললেন। বস্তুত, প্রাশিয়ার সৈন্যবাহিনীর জোরেই বিসমার্ক জার্মানীকে ঐক্যবদ্ধ করতে পেরেছিলেন। সেইজন্য বিসমার্ক প্রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী হয়েই গড়ে তুলেছিলেন প্রাশিয়ার জন্য একটি শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী।



বিসমার্ক

এই সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলার কাজ যেই সম্পন্ন হল অমনি বিসমার্ক এই সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে পর পর তিনটি যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন—(১) ডেনমার্কের সঙ্গে যুদ্ধ (১৮৬৪), (২) অস্ট্রিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ (১৮৬৬), (৩) ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধ (১৮৭০)। এই তিনটি যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে বিসমার্ক প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জার্মানীকে ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হলেন।

তিনটি যুদ্ধ

ডেনমার্কের সঙ্গে যুদ্ধ : ১৮৬৪ (War with Denmark) : তিনি প্রথমে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন ডেনমার্কের বিরুদ্ধে। এই সময়ে জার্মানীর একটি অংশ—যার নাম ছিল শ্লেশউইগ হোলস্টীন—ডেনমার্কের রাজার অধীনে ছিল। বিসমার্ক এই অঞ্চলটিকে জার্মানীতে ফিরিয়ে আনতে চাইলেন। এই কাজে তিনি অস্ট্রিয়ারও সাহায্য গ্রহণ করলেন। প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া যুক্তভাবে এই অঞ্চলটি ফিরে পাবার দাবিতে ডেনমার্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা

করল। ডেনমার্ক পরাজিত হল এবং শ্লেশউইগ হোলস্টীনকে জার্মানীতে ফিরিয়ে আনা হল।

অস্ট্রিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ : ১৮৬৬ (War with Austria) : অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার মধ্যে শ্লেশউইগ হোলস্টীনের ভাগাভাগি নিয়ে ঝগড়া বাধল। এই ঝগড়া শেষে অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধের কারণ হয়ে দাঁড়ল। এই যুদ্ধে প্রাশিয়া ইতালীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করল। সাত সপ্তাহ ধরে এই যুদ্ধ চলল। তাই এই যুদ্ধের অপর নাম 'সাত সপ্তাহের যুদ্ধ' (Seven Weeks' war)। যুদ্ধে অস্ট্রিয়া প্রাশিয়ার সুগঠিত বাহিনীর কাছে পরাজিত হল। **স্যাডোয়ার** (Sadowa) রণক্ষেত্রে প্রাশিয়া অস্ট্রিয়াকে চূড়ান্তভাব হারিয়ে দিল।

উত্তর জার্মানীতে সম্মিলিত রাষ্ট্র গঠন

এই যুদ্ধে জয়লাভ করে প্রাশিয়া জার্মানীর কর্তৃত্ব থেকে অষ্ট্রিয়াকে বিতাড়িত করতে সচেষ্ট হল। উত্তর জার্মানীর রাষ্ট্রগুলিকে একত্রিত করে প্রাশিয়া গড়ে তুলল একটি ঐক্যবদ্ধ যুক্তরাষ্ট্র (North German Federation)। এই যুদ্ধে ইতালী বিসমার্ককে সাহায্য করায় অস্ট্রিয়ার করতলগত ভেনেসিয়া ইতালীকে দেওয়া হয়েছিল।

বিসমার্ক অস্ট্রিয়াকে পরাজিত করলেও তার প্রতি খুব বেশী নির্দয় ব্যবহার করলেন না। কারণ বিসমার্ক এখন ফ্রান্সের বিরুদ্ধে আর একটি চরম যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন এবং সেই যুদ্ধে পরাজিত অস্ট্রিয়া যাতে ফ্রান্সের সঙ্গে যোগ না দেয় সেই দিকে দৃষ্টি দিয়েই তিনি অস্ট্রিয়ার প্রতি সদয় ব্যবহার করেছিলেন।

প্রাশিয়া ও ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধ ১৮৭০ (War with France) : সর্বশেষে বিসমার্ক ফ্রান্সের সঙ্গে শক্তি-পরীক্ষায় নামলেন। ফ্রান্স ও প্রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হল। এই যুদ্ধেও প্রাশিয়া জয়লাভ করল। ফ্রান্স **সিডানের** যুদ্ধে পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হল। ফ্রান্সের পরাজয়ের পরে প্রাশিয়ার সৈন্যবাহিনী দক্ষিণ জার্মানীর রাষ্ট্রগুলিকে উত্তর জার্মানীর সঙ্গে সংযুক্ত করে নিল। ফলে, উত্তর ও দক্ষিণ জার্মানী প্রাশিয়ার নেতৃত্বে একটি ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত হল। প্রাশিয়ার রাজা হলেন ঐক্যবদ্ধ জাতীয় রাষ্ট্রটির সম্রাট। আর বিসমার্ক হলেন তাঁর প্রধানমন্ত্রী বা চ্যান্সেলর।

জার্মানীতে ঐক্যবদ্ধ জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা

ফ্রান্স ও প্রাশিয়ার যুদ্ধের ফলে ইতালীরও লাভ হয়েছিল। ফ্রান্সের প্রভাবাধীন রোম ইতালীকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

বিসমার্কের নেতৃত্বে পরবর্তীকালে জার্মানীর জাতীয় রাষ্ট্রটি খুব দ্রুত উন্নতির পথে পরিচালিত হয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষে জার্মানী হয়ে উঠেছিল ইউরোপের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে একটি।

ইতালী ও জার্মানীর ঐক্য আন্দোলনের গুরুত্ব

[Significance of the Unification of Italy and the Unification of Germany]

ইতালী ও জার্মানীতে যে ঐক্য আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল তার গুরুত্ব খুব বেশী। ইতালী ও জার্মানীতে এই ঐক্য আন্দোলনের নেতা ছিল উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণী। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ ও ফরাসী বিপ্লবের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এই উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণী ইতালী ও জার্মানীতে মুক্তি আন্দোলন সংগঠিত করেছিল।

এই দুই দেশেই এই মুক্তি আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল ঃ

(১) অস্ট্রিয়ার আধিপত্য থেকে মুক্ত করে বিভক্ত, খণ্ড-বিখণ্ড দেশকে একত্রিত করা। (২) সমগ্র দেশকে একত্রিত করে একটি স্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্র (independent national state) গঠন করা। (৩) এই ঐক্যবদ্ধ জাতীয় রাষ্ট্রে নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা (constitutional government) প্রবর্তন করা।

ইতালী ও জার্মানী উভয় দেশেই ঐক্য আন্দোলনের ফলে স্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্র গঠিত হয়েছিল এবং উভয় দেশেই নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল।

ইতালী ও জার্মানীর নব জাগরণ ইওরোপ ও ইওরোপের বাইরে অর্ধ-স্বাধীন ও পরাধীন দেশগুলির মনে নব নব আশার সঞ্চার করেছিল।

ষষ্ঠ অধ্যায়

পূর্বাঞ্চলের সমস্যা

(১৭৬৩—১৯১৪)

[The Eastern Question]

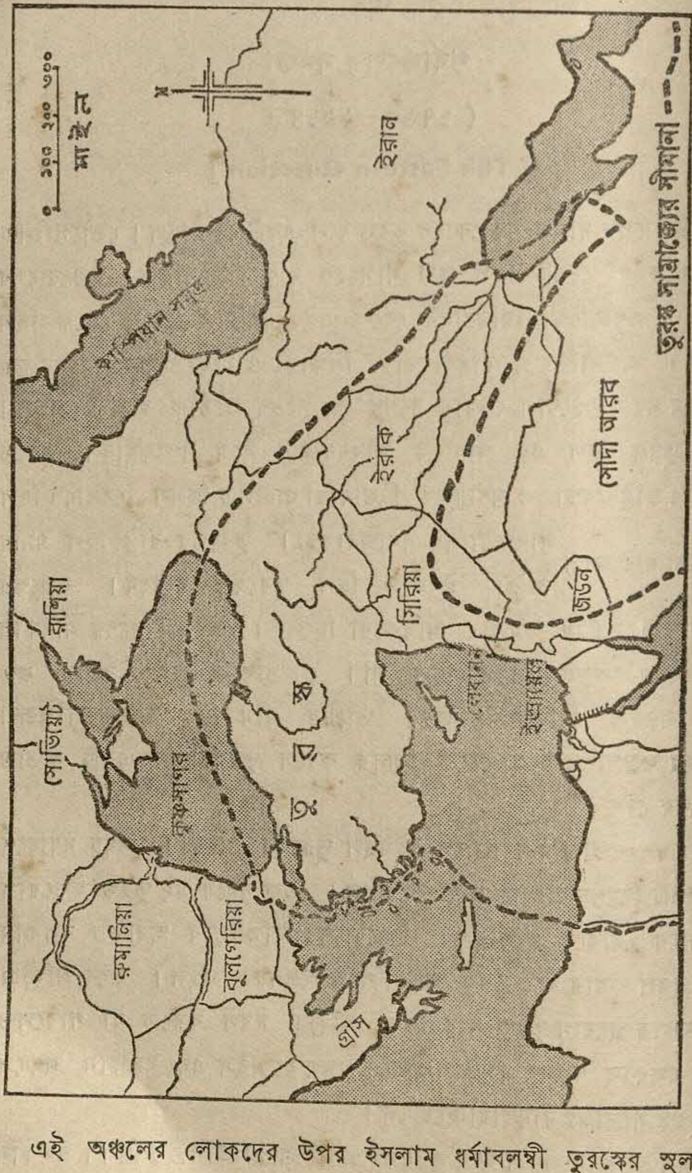
ইউরোপের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে তুরস্ক বলে একটি দেশ ছিল। ভৌগোলিক দিক থেকে এই দেশটি ছিল কৃষ্ণ সাগরের দক্ষিণে অবস্থিত; ইওরোপের সংলগ্ন। অথচ চিন্তাধারার দিক থেকে এই দেশটি ইওরোপ থেকে ছিল বিচ্ছিন্ন। অর্থনীতিতে, রাষ্ট্রব্যবস্থায়, শিক্ষায় ও সংস্কৃতিতে মধ্যযুগের স্তর অতিক্রম করে ইওরোপ বর্তমান যুগের অগ্রগতির প্রতীক হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তুরস্ক ছিল এই আধুনিক জীবনধারার সঙ্গে সম্পর্কহীন। তুরস্কে মধ্যযুগীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা ও মধ্যযুগীয় চিন্তাধারা প্রচলিত ছিল। সেখানে ছিল সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা। তুরস্কের রাষ্ট্র ছিল ধর্মীয় রাষ্ট্র। ইসলাম ছিল তুরস্কের রাষ্ট্রধর্ম। তুরস্কের সুলতানেরা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। জনসাধারণের অধিকার বলে কোন কিছুই তুরস্কে ছিল না। সুলতানকে রক্ষা করার জন্য এক সৈন্যদল হাজির থাকত। তাদের নাম ছিল **জানিজারিজ**। সমাজের অগ্রগতির দিক থেকে বিচার করলে তুরস্ক ছিল একটি অত্যন্ত পশ্চাৎপদ দেশ।

তুরস্ক সাম্রাজ্যের অবস্থা

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই ছিল তুরস্কের অবস্থা। অথচ মধ্যযুগে এই দেশটি বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছিল। এক সময়ে এই তুরস্ক ইওরোপ অভিযানে বেরিয়ে পড়েছিল। ইওরোপের দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত বলকান অঞ্চল দখল করার পরে তুরস্ক অস্ট্রিয়া পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল। তবে অস্ট্রিয়া দখল করার সুযোগ তুরস্ক পায় নি। অস্ট্রিয়া দখল করতে না পারলেও তুরস্ক বলকান অঞ্চল দখলে আনতে সক্ষম হয়েছিল এবং বলকান অঞ্চলে এই তুরস্ক সাম্রাজ্য দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল।

সমগ্র বলকান অঞ্চল জুড়ে তুরস্কের এই সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। বলকান অঞ্চল বলতে বোঝায়—**দানুব** নদী ও **ইজিয়ান** সাগরের মধ্যবর্তী এলাকা।

এই অঞ্চলে বাস করত গ্রীক, সার্ব, বুলগার ও আলবানীয় প্রভৃতি ভিন্ন জাতির লোক। এই অঞ্চলের অধিকাংশ অধিবাসী ছিল খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী।



তুরস্ক সাম্রাজ্য

এই অঞ্চলের লোকদের উপর ইসলাম ধর্মাবলম্বী তুরস্কের সুলতান কর্তৃত্ব করতেন। শক্তির জোরে, সামরিক বাহিনীর সাহায্যে এই অঞ্চলের

লোকদের উপর তুরস্ক অধিকার বজায় রাখত। কাজেই এই অঞ্চলের লোকেরা তুরস্কের শাসন পছন্দ করত না। তারা এই অঞ্চলে তুরস্কের শাসন উচ্ছেদ করে নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠায় ইচ্ছুক ছিল।

এই ছিল তুরস্ক ও বলকান অঞ্চলের সম্পর্ক। এর সঙ্গে মনে রাখতে হবে এই তুরস্ক ও বলকান অঞ্চলের পাশেই একটি বিরাট দেশ ছিল। তার নাম রাশিয়া। লোকসংখ্যার দিক থেকে রাশিয়া ছিল ইওরোপের বৃহত্তম দেশ। এই দেশে জারের শাসন প্রচলিত ছিল। রাশিয়ার জার এশিয়ার একটি অংশে সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিল। ইউরোপের পূর্বাংশেও রাশিয়া পোল্যাণ্ড, দখল করেছিল। রাশিয়া সমগ্র বলকান অঞ্চল থেকে তুরস্ককে বিতাড়িত করে সেই অঞ্চলটি নিজ কর্তৃত্বাধীন করতে সচেষ্ট ছিল। কাজেই তুরস্কের সঙ্গে রাশিয়ার প্রায়ই স্বার্থসংঘাত দেখা দিত।

রাশিয়া ও তুরস্কের সম্পর্ক

দ্বিতীয় ক্যাথারিন ও তুরস্ক—রাশিয়ার জারিনা দ্বিতীয় ক্যাথারিনের সময়ে এই সংঘাত চরমে উঠেছিল। ক্যাথারিন মনে করতেন রাশিয়ার সাম্রাজ্যবিস্তারের উদ্দেশ্যে কৃষ্ণসাগরের উপর আধিপত্য স্থাপন একান্ত অপরিহার্য; অথচ এই কৃষ্ণসাগরের উপর আধিপত্য বিস্তারের পথে তুরস্ক সাম্রাজ্য ছিল সব চেয়ে বড় অন্তরায়। কাজেই ক্যাথারিন অনবরত তুরস্কের কর্তৃত্ব বিনাশের সুযোগ খুঁজছিলেন।

১৭৬৮ খ্রীঃ রাশিয়ার সেনাবাহিনী কোন এক অজুহাতে তুরস্কের সীমানায় প্রবেশ করল। তুরস্ক এর প্রতিবাদে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। কিন্তু রাশিয়ার হাতে তুরস্কের পরাজয় ঘটল। ১৭৭৪ খ্রীঃ **কাচুক কাইনারজির (Katchuk Kainardji) সন্ধিতে** এই যুদ্ধের অবসান ঘটে।

রাশিয়া ও তুরস্কের যুদ্ধ (১৭৬৮)

রুশ-তুরস্ক সম্পর্কের ইতিহাসে এই সন্ধির গুরুত্ব যথেষ্ট। এই সন্ধির সর্ত অনুযায়ী রাশিয়া আজফ বন্দর ও আরও কয়েকটি স্থান লাভ করল। এর ফলে আজফ সাগরের উপর এবং কৃষ্ণসাগরের উত্তর অঞ্চলের উপর রাশিয়ার কর্তৃত্ব স্থাপিত হল। রুশদেশীয় জাহাজগুলি এই অঞ্চলে স্বাধীনভাবে চলাচলের অধিকার পেল। ক্রিমিয়া নামক অঞ্চলটিকে তুরস্কের কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত বলে ঘোষণা করা হল। তাছাড়া, তুরস্ক নিজ রাজ্যভুক্ত খ্রীষ্টান অধিবাসীদের

কাচুক কাইনারজির সন্ধি (১৭৭৪)

মঙ্গলামঙ্গলের ব্যাপারে রাশিয়ার হস্তক্ষেপের অধিকার প্রকারান্তরে মেনে নিল।

কাচুক কাইনারজির সন্ধি প্রমাণ করে দিল যে তুরস্ক একটি দুর্বল রাষ্ট্র এবং রাশিয়া তার চেয়ে অনেক বলশালী। ফলে রাশিয়ার সাম্রাজ্য ক্ষুধা বেড়ে চলল। ১৭৮৭ খ্রীঃ রাশিয়ার সম্রাজ্ঞী দ্বিতীয় ক্যাথারিন ক্রিমিয়া অঞ্চলটিকে জোর করে নিজের সাম্রাজ্যভুক্ত করে নেন। এই ঘটনার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে রাশিয়ার সঙ্গে তুরস্কের পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই যুদ্ধেও তুরস্ক রাশিয়ার যে মোটেই সমকক্ষ নয় তা প্রমাণিত হয়।

রাশিয়া ও তুরস্কের মধ্যে আবার যুদ্ধ (১৭৮৭)

জার্সির সন্ধি (Treaty of Jarsy)—এই সন্ধি অনুযায়ী তুরস্ক রাশিয়া কর্তৃক ক্রিমিয়া অধিকার মেনে নিতে বাধ্য হয়। এইভাবে কৃষ্ণসাগরের উত্তর উপকূল থেকে তুরস্কের প্রভাব দূরীভূত হয় এবং রাশিয়া সেই অঞ্চলে নিজ কর্তৃত্ব স্থাপন করে।

জার্সির সন্ধি

তুরস্ক সাম্রাজ্যের পতন ও রুশ সাম্রাজ্যের ক্রমবিস্তার ইওরোপে নতুন অবস্থার সৃষ্টি করে।

পূর্বাঞ্চলের সমস্যা সম্পর্কে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের উদ্বেগ—রুশ সাম্রাজ্যের এই বিস্তৃতিতে সবচেয়ে বেশী ভয় পেল ইংলণ্ড। ইংলণ্ড দেখল—রাশিয়া কৃষ্ণসাগরের উপর আধিপত্য বিস্তার করলে ভূমধ্যসাগরের পথে ইংলণ্ডের স্বাধীন চলাচল বন্ধ হয়ে যেতে পারে। বিশেষ করে, এর ফলে মিশর (এই সময়ে ছিল ইংলণ্ডের কর্তৃত্বাধীন) এবং ভারতে যাবার পথটি বিপদসঙ্কুল হয়ে উঠতে পারে। ব্রিটেন চাইল তুরস্ককে বাঁচিয়ে রাখতে। তার ভয় ছিল তুরস্কের যদি পতন ঘটে তাহলে রাশিয়ার অগ্রগতি রোধ করা যাবে না। এই উদ্দেশ্যে ইংলণ্ড তুরস্ক সাম্রাজ্যটিকে বাঁচিয়ে রেখে রাশিয়ার অগ্রগতির পথ রোধ করার চেষ্টা করল।

ইংলণ্ডের উদ্বেগ

ফ্রান্সও তুরস্কের সাম্রাজ্যটিকে বাঁচিয়ে রাখার পক্ষপাতী ছিল। ফ্রান্স ভূমধ্যসাগরের উপকূলবর্তী দেশগুলির সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত ছিল। এইজন্য ফ্রান্সের বাণিজ্য জাহাজগুলির পক্ষে ভূমধ্যসাগরে যাতায়াতের প্রয়োজন ছিল। তুরস্কের সঙ্গে বন্ধুত্ব থাকায় ফ্রান্স এই সব অঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্য করার সুবিধা পেত। বিশেষ

ফ্রান্সের উদ্বেগ

করে, তুরস্ক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত মিশর ও সিরিয়ায় ফ্রান্স কতকগুলি বাণিজ্যিক সুবিধা উপভোগ করত। এই সব কারণে ফ্রান্স চাইল তুরস্কের সঙ্গে তার পূর্ব বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখতে। তুরস্ক সাম্রাজ্যের যদি পতন ঘটে, রাশিয়া যদি তুরস্ক সাম্রাজ্যের পতন ঘটিয়ে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে প্রবেশ করে, তাহলে ফ্রান্সের ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের কর্তৃত্ব অনিশ্চিত হয়ে উঠবে এবং ফ্রান্সের বিশেষ সুবিধাগুলি নষ্ট হয়ে যেতে পারে—এই দুর্ভাবনা ফ্রান্সকে চিন্তিত করে তুলল।

পূর্বাঞ্চলের সমস্যাটির চরিত্র—কাজেই দেখা যায়, পূর্বাঞ্চলের সমস্যার সঙ্গে জড়িত ছিল একসঙ্গে অনেকগুলি রাজনৈতিক প্রশ্ন। প্রথম, তুরস্কের পতনোন্মুখ অবস্থা এবং তার থেকে উদ্ভূত নানা সমস্যা। দ্বিতীয়ত, তুরস্ক সাম্রাজ্যভুক্ত বলকান অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলির স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা। তৃতীয়ত, তুরস্কের পতনের সুযোগ নিয়ে রাশিয়ার সাম্রাজ্যবিস্তারের পরিকল্পনা। চতুর্থত, তুরস্কের পতনে ও রাশিয়ার অগ্রগতিতে দুটি বৃহৎ শক্তি ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের উদ্বেগ। এই সব কয়টি প্রশ্নই আবার একটি আর একটির সঙ্গে জড়িত। ফলে, পূর্বাঞ্চলের সমস্যাটি হয়ে উঠেছিল অত্যন্ত জটিল। এই জটিলতার জন্য প্রথম মহাযুদ্ধ পর্যন্ত এই পূর্বাঞ্চলের সমস্যাটির কোন সন্তোষজনক সমাধান সম্ভব হয় নাই।

বলকান অঞ্চলের দেশগুলিতে স্বাধীনতা আন্দোলন (Independence Movement in the Balkans)—ফরাসী বিপ্লবের বাণী—সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা পূর্ব-ইওরোপে মানুষের মনে নব প্রেরণা আনয়ন করে। পূর্ব-ইওরোপের দেশগুলি ছিল তুরস্ক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। তুরস্ক সাম্রাজ্যভুক্ত বলকান অঞ্চলের জনগণ তুরস্কের সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দাবী করল। সার্বিয়ায় কারা জর্জ (Kara George) নামে একজন কৃষকের নেতৃত্বে তুরস্কবিরোধী অভ্যুত্থান আরম্ভ হয়। পূর্ব ইওরোপের এই জাগরণে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল গ্রীস।

সার্বিয়ায় স্বাধীনতা আন্দোলন

গ্রীসে স্বাধীনতার যুদ্ধ
(Greek War of Independence)

এই সময়ে বহুদিনের নিদ্রা থেকে জেগে উঠল গ্রীস। প্রাচীনকালে ইওরোপকে গ্রীসই স্বাধীনতার মন্ত্র গ্রহণ করতে শিখিয়েছিল। কিন্তু ক্রমশ

গ্রীসের সুদিন অস্তমিত হয়। মধ্যযুগে গ্রীস ছিল একটি পরাধীন রাষ্ট্র। তুরস্ক গ্রীসের উপর আধিপত্য করত।

উনবিংশ শতাব্দীতে গ্রীসের নিদ্রাভঙ্গ হল। ফরাসী বিপ্লবের সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার রণধ্বনি গ্রীসের কর্ণকুহরে প্রবেশ করল। গ্রীস স্বাধীনতা ফিরে পাবার জন্য আন্দোলন আরম্ভ করল। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় একটি 'গুপ্ত সমিতি'র (Hitairia Philike) নেতৃত্বে এই আন্দোলন পরিচালিত হয়। গ্রীসে একটি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছিল। তাদের নেতৃত্বে এই জাতীয় অভ্যুত্থানের সূচনা হয়েছিল।

গুপ্ত সমিতি

তুরস্ক তীব্র দমননীতির সাহায্যে এই বিদ্রোহ দমনে সচেষ্ট হল। হাজার হাজার গ্রীক বীরকে তুরস্ক মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করল। কিন্তু কিছুতেই সে গ্রীকদের আন্দোলন বন্ধ করতে পারল না। গ্রীকরা তুরস্ককে নিজ দেশ থেকে হটিয়ে দেবার জন্য মরণপণ সংকল্প গ্রহণ করল।

জাতীয় অভ্যুত্থান

তুরস্ক মরীয়া হয়ে তাঁবেদার রাষ্ট্র মিশরের সাহায্য প্রার্থনা করল। এই সময়ে মিশরের শাসনকর্তা ছিলেন **মেহামত আলি**। মেহামত আলি সৈন্য পাঠিয়ে তুরস্ককে সাহায্য করলেন। মিশরের সাহায্য নিয়ে তুরস্ক গ্রীসের স্বাধীনতাযুদ্ধ দমন করতে অগ্রসর হল। মিশরের সেনাবাহিনী গ্রীসের দেশপ্রেমিক বাহিনীকে পরাজিত করল এবং হাজার হাজার বন্দী দেশপ্রেমিককে মিশরে ক্রীতদাস হিসাবে নির্বাসিত করল।

গ্রীস-তুরস্ক যুদ্ধ—মিশরের তুরস্ককে সাহায্য দান

এই সংবাদ ইওরোপের মানুষের মনে দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল। ব্রিটেনে, ফ্রান্সে, রাশিয়ায় জনসাধারণ এর প্রতিকার দাবি করল। শেষ পর্যন্ত ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়া লণ্ডন চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে তুরস্ককে যুদ্ধ-বিরতি ঘোষণা করতে অনুরোধ জানাল। তুরস্ক এতে সম্মতি না দেওয়ায়, তারা যুক্তভাবে তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। **ন্যাভারিনোর যুদ্ধে** মিলিত বাহিনী তুরস্ককে পরাজিত করল। পরাজিত তুরস্ক শেষ পর্যন্ত গ্রীসের স্বাধীনতার দাবি মেনে নিল। গ্রীস একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করল।

লণ্ডন চুক্তি (১৮২৭)

গ্রীসের স্বাধীনতা স্বীকার

গ্রীসের স্বাধীনতার এই যুদ্ধ সমস্ত ইউরোপের স্বাধীনতাকামী মানুষের মনে নতুন প্রেরণা জাগাল। ইংলণ্ডের আদর্শবাদী কবি **লর্ড বায়রণ** গ্রীসের স্বাধীনতা যুদ্ধে স্বেচ্ছায় অংশ গ্রহণ করেন এবং এই যুদ্ধে তিনি নিজের প্রাণ উৎসর্গ করেন।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধ (১৮৫৪-৫৬)
(The Crimean War)

প্রাচ্য সমস্যাটি ক্রিমিয়া যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে আবার এক নতুন স্তরে গিয়ে পৌঁছায়।

এই সময়ে রাশিয়ার জার ছিলেন প্রথম নিকোলাস। রুশ সাম্রাজ্য বিস্তার নিকোলাসের ছিল প্রধান কামনা। তিনি মনে করতেন—তুরস্ক সাম্রাজ্যের জীবনীশক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে এসেছে। তাই তিনি তুরস্ককে অভিহিত করেছিলেন—ইউরোপের রুগ্ন ব্যক্তি ('sick man' of Europe) বলে। এই রুগ্ন ব্যক্তিটির দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তুরস্ক সাম্রাজ্যের কোন কোন অংশ দখল করে নেওয়াই ছিল তাঁর আকাঙ্ক্ষা। বিশেষ করে, তাঁর দৃষ্টি পড়েছিল রুশ সাম্রাজ্যের সংলগ্ন তুরস্ক সাম্রাজ্যভুক্ত পূর্ব-ইওরোপের রাষ্ট্রগুলির উপর। এই তুরস্ক সাম্রাজ্যভুক্ত ইউরোপীয় অঞ্চলগুলিতে যে খ্রীষ্টান অধিবাসীরা বাস করত রাশিয়া তাদের রক্ষকের ভূমিকা গ্রহণ করল। রাশিয়া বলল—এই খ্রীষ্টান অধিবাসীদের উপর তুরস্ক অকথ্য অত্যাচার করে থাকে। তাদের ধর্মগত নিপীড়নের হাত থেকে রক্ষা করা তার অবশ্য কর্তব্য। খ্রীষ্টান অধিবাসীদের রক্ষা করা ছিল রাশিয়ার একটি অজুহাত মাত্র। এই অজুহাতে রাশিয়া তুরস্ক সাম্রাজ্যের কোন কোন অংশের উপর নিজ কর্তৃত্ব স্থাপনে উদ্যোগী হল। সরাসরি দানিয়ুব নদীর তীরস্থ ওয়ালাচিয়া ও মোলডাভিয়ার উপর রুশ সৈন্যবাহিনী মোতায়েন করা হল। তুরস্ক দাবী করল—রুশ সৈন্য অবিলম্বে ওয়ালাচিয়া ও মোলডাভিয়া থেকে প্রত্যাহার করতে হবে। কিন্তু রাশিয়া এতে কর্ণপাত না করায় তুরস্ক রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ফলে, কৃষ্ণ সাগর অঞ্চলে রাশিয়ার যুদ্ধ জাহাজগুলি তুরস্কের যুদ্ধ জাহাজগুলিকে আক্রমণ করল এবং সাইনোপ (Sinope) নামক স্থানে তুরস্কের যুদ্ধ জাহাজগুলিকে বিধ্বস্ত করে দিল।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধের কারণ

এই অবস্থায়, ইংলণ্ড ও ফ্রান্স উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। তাদের তুরস্ককে বাঁচিয়ে রাখার নীতি ব্যর্থ হয়ে যাবার উপক্রম হল। তারা উভয়ে রাশিয়ার কাছে দাবী জানাল—ওয়ালাচিয়া ও মোলডাভিয়া থেকে রুশ সৈন্য অপসারণ করতে হবে। কিন্তু রাশিয়া এতেও সম্মত হল না। তখন ইংলণ্ড ও ফ্রান্স তুরস্কের পক্ষভুক্ত হয়ে যুদ্ধে যোগদান করল। পরে পিডমণ্ট সার্ডিনিয়ার রাজাও তুরস্কের পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করেন।

কাজেই যে যুদ্ধটি প্রথমে ছিল তুরস্ক ও রাশিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ, তা ক্রমে ক্রমে এখন একাধিক বৃহৎ ইওরোপীয় রাষ্ট্রের যোগদানের ফলে একটি ইওরোপীয় যুদ্ধে পরিণত হল। এইটিই "ক্রিমিয়ার যুদ্ধ" বলে পরিচিত।

রাশিয়ার পরাজয়

তুরস্কের পক্ষে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স যোগ দেওয়ার ফলে যুদ্ধের পরিস্থিতি পরিবর্তিত হয় এবং রাশিয়া ওয়ালাচিয়া ও মোলডাভিয়া পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়। মিত্রপক্ষীয়েরা রাশিয়াকে শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে রুশ সাম্রাজ্যভুক্ত সিবাস্টপোল আক্রমণ করল। দীর্ঘ অবরোধের পর সিবাস্টপোলের পতন ঘটল।

এই সময়ে রাশিয়ার জার প্রথম নিকোলাসের মৃত্যু ঘটে। ফলে রাশিয়া মিত্রপক্ষের সঙ্গে সন্ধি স্থাপনে বাধ্য হয়।

প্যারিসের সন্ধি (১৮৫৬)

প্যারিসের সন্ধি (১৮৫৬)—এই সন্ধি অনুযায়ী স্থির হয়—ওয়ালাচিয়া ও মোলডাভিয়ার উপর রাশিয়ার কর্তৃত্বের অবসান ঘোষণা করা হবে। এই অঞ্চলগুলিকে তুরস্কের কর্তৃত্বে স্বায়ত্ত-শাসনাধীন রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করা হল। কৃষ্ণ সাগর নিরপেক্ষ এলাকা বলে ঘোষিত হল—এই অঞ্চলে রাশিয়া বা অন্য কোন বৃহৎ রাষ্ট্রের পক্ষে যুদ্ধজাহাজ মোতায়েন রাখা নিষিদ্ধ হল। দানিয়ুব নদীটিকে আন্তর্জাতিক কর্তৃত্বের অধীনে আনা হল এবং এই নদীকে সকল দেশের বাণিজ্য জাহাজের জন্য উন্মুক্ত রাখা হল।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধের ফলাফল

ক্রিমিয়ার যুদ্ধ রাশিয়ার পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর হয়েছিল। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে রাশিয়ার আন্তর্জাতিক মর্যাদা অত্যন্ত ক্ষুণ্ন হল। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের হস্তক্ষেপের ফলে রাশিয়াকে পূর্ব ইওরোপে সাম্রাজ্য বিস্তারের বাসনা আপাতত ত্যাগ করতে হল।

এই যুদ্ধে তুরস্কের যথেষ্ট লাভ হয়েছিল। যুদ্ধের পূর্বে তুরস্ক ছিল "ইওরোপের রুগ্ন ব্যক্তি'। এই যুদ্ধের সময়ে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স তার পক্ষে এগিয়ে আসাতে তুরস্কের পক্ষে তার সাম্রাজ্যটিকে অবশ্যম্ভাবী পতনের হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছিল। প্যারিসের সন্ধিতে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স তুরস্কের ঐক্য ও সংহতি রক্ষায় ভবিষ্যতেও সাহায্য করবেন—এই আশ্বাস দেওয়া হল।

কিন্তু প্রাচ্য সমস্যা সমাধানের দিক থেকে যদি বিচার করা যায়, তাহলে ক্রিমিয়ার যুদ্ধের বিশেষ গুরুত্ব লক্ষ্য করা যায় না। পূর্ব ইওরোপের বলকান দেশগুলি তুরস্কের সাম্রাজ্য থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য আগ্রহশীল ছিল। কিন্তু তাদের সমস্যার সমাধানের কথা কেউ চিন্তা করল না। বলকান অঞ্চলে যে সব খ্রীষ্টান অধিবাসী বাস করত, তাদের সমস্যাগুলিরও বাঞ্ছিত সমাধান প্যারিসের সন্ধিতে করা হয় নাই। ফলে, বলকান অঞ্চলের সমস্যা—যা ছিল প্রাচ্য সমস্যার মূলস্বরূপ তা অমীমাংসিতই রয়ে গেল।

প্যারিসের সন্ধি থেকে বার্লিনের সন্ধি

(১৮৫৬—১৮৭৮)

প্যারিসের সন্ধি যে প্রাচ্য সমস্যার সমাধানে ব্যর্থ হয়েছে তার প্রমাণ অতি শীঘ্রই পাওয়া গেল। প্যারিসের সন্ধিতে স্থির হয়েছিল: ওয়ালাচিয়া ও মোলডাভিয়া নামক দুইটি অঞ্চল আলাদা থাকবে। কিন্তু এই দুইটি অঞ্চলের অধিবাসীরা ছিল এক জাতির লোক। তাদের ভাষা ছিল এক, তাদের ঐতিহ্যও এক ছিল। তারা ছিল সকলেই রুমানিয়ান। কাজেই এই অঞ্চলের লোকেদের মধ্যে জাতীয় ঐক্য স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা জাগল। এই দুই অঞ্চলে ঐক্যবদ্ধ জাতীয় আন্দোলন আরম্ভ হল। এই আন্দোলনের ফলে রুমানিয়াতে একটি ঐক্যবদ্ধ জাতীয় রাষ্ট্র গঠিত হল। এইভাবে রুমানিয়া প্যারিস চুক্তির গোড়ায় আঘাত হানল। ক্রমে ক্রমে বলকান অঞ্চলের অন্যান্য স্বাধীনতাকামী রাষ্ট্রও জেগে উঠল। জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলনের তরঙ্গে প্যারিস চুক্তির সর্তগুলি ভেঙ্গে গেল।

পূর্ব ইওরোপে স্বাধীনতা আন্দোলনের শক্তিবৃদ্ধি

১৮৬৫ খ্রীঃ ক্রীট, ১৮৬৭ খ্রীঃ সার্বিয়া, ১৮৭৫ খ্রীঃ বসনিয়া ও

হের্জেগোভিনা জাতীয় স্বাধীনতার দাবীতে তুরস্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করল।

বুলগেরিয়াকেও প্যারিস চুক্তিতে দুইটি ভাগে ভাগ করে রাখা হয়েছিল—বড় বুলগেরিয়া ও ছোট বুলগেরিয়া। বুলগেরিয়াতেও জাতীয় ঐক্যের দাবীতে আন্দোলন আরম্ভ হল এবং বুলগেরিয়ার অধিবাসীরা তুরস্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করল।

বলকান অঞ্চলের অধিবাসীরা ছিল সকলেই শ্লাভ জাতিভুক্ত। তাই শ্লাভ জাতীয়দের মধ্যে যে ঐক্যসূত্র ছিল তা যেন তারা নতুন করে আবিষ্কার করল। বলকান অঞ্চলে শ্লাভ জাতীয়তাবাদের (Panslavism) উদ্ভব হল।

শ্লাভ জাতীয়তাবাদের উদ্ভব

রাশিয়াও ছিল শ্লাভ জাতিভুক্ত। কাজেই রাশিয়া নিজেকে এই শ্লাভ জাতির নেতা বলে মনে করত। রাশিয়া নিজের স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে শ্লাভ জাতিগুলির মধ্যে যে তুরস্ক বিরোধী জাতীয় আন্দোলন চলছিল তার প্রতি সমর্থন জানাল।

তুরস্ক এই জাতীয় আন্দোলনের গুরুত্ব অনুভব করতে পারল না। রক্তের বন্যায় তুরস্ক এই আন্দোলনগুলিকে ডুবিয়ে দিল। শত শত দেশ-প্রেমিককে তুরস্ক হত্যা করল। বুলগেরিয়ার জাতীয় আন্দোলন দমনে তুরস্ক যে নির্মম ব্যবস্থা অবলম্বন করল, রাশিয়া তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাল। তুরস্ক তার প্রতিবাদে কর্ণপাত না করায় রাশিয়া তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল (১৮৭৭ খ্রীঃ)।

রাশিয়া ও তুরস্কের মধ্যে যুদ্ধ (১৮৭৭)

রুশ সেনাবাহিনী দানিয়ুব নদী অতিক্রম করে ইওরোপে ও এশিয়ায় তুরস্কের রাজ্যগুলি আক্রমণ করল। প্লেভনায় তুরস্কবাহিনী যথেষ্ট বিক্রম দেখানো সত্ত্বেও রুশবাহিনীর কাছে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হল। রুশবাহিনী এখন তুরস্কের রাজধানী কনস্তান্তিনোপলের দিকে অগ্রসর হল।

তুরস্কের সুলতান নিরুপায় হয়ে রাশিয়ার কাছে সন্ধির প্রস্তাব করলেন। এইটি **স্যান ষ্টিফানোর সন্ধি (Treaty of San Stefano)** নামে পরিচিত।

স্যান ষ্টিফানোর সন্ধি

স্যান ষ্টিফানোর সন্ধিতে স্থির হল : তুরস্কের সুলতান সার্বিয়া ও মণ্টে-নিগ্রোর স্বাধীনতা মেনে নেবে। রুমানিয়ার স্বাধীনতা স্বীকৃত হল।

রাশিয়ার ইচ্ছা অনুযায়ী ঐক্যবদ্ধ বুলগেরিয়ার দাবী তুরস্ককে মেনে নিতে হল। রাশিয়াকে তুরস্ক এশিয়াতে বাটুম ও কারস এবং ইওরোপে বেসারেবিয়া ছেড়ে দিতে রাজী হল। এক কথায়, স্যান ষ্টিফানোর সন্ধিতে তুরস্কের সাম্রাজ্য ভেঙ্গে দেওয়া হল এবং বলকান অঞ্চলে রাশিয়ার কর্তৃত্ব স্থাপিত হল। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে রাশিয়া যে পরাজয়ের গ্লানি বরণ করতে বাধ্য হয়েছিল সেই গ্লানি থেকে মুক্ত হয়ে এখন রাশিয়া তার অভীপ্সিত পথে অগ্রসর হবার সুযোগ পেল।

স্যান ষ্টিফানোর সন্ধির সর্তগুলি ইংলণ্ড, অষ্ট্রিয়া ও অন্যান্য বৃহৎ রাষ্ট্রের মনঃপূত হল না। রাশিয়ার অগ্রগতিতে ইংলণ্ড বিশেষ উদ্বিগ্ন হল। তাই ইংলণ্ড দাবী করল—স্যান ষ্টিফানোর সন্ধির সর্তগুলি পরিবর্তন করতে হবে। অষ্ট্রিয়াও বলকান অঞ্চলে নিজ রাজ্য বিস্তারের কল্পনা করত। তাই অষ্ট্রিয়া রাশিয়ার অগ্রগতিতে ভীত হল। ইংলণ্ড ও অষ্ট্রিয়া দাবী তুলল—পূর্বাঞ্চলের সমস্যার সমাধানের জন্য বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির একটি সম্মেলন ডাকা হোক এবং স্যান ষ্টিফানোর সন্ধির সর্তগুলি সংশোধন করা হোক।

স্যান ষ্টিফানোর সন্ধির সংশোধন দাবী

বার্লিন বৈঠক (Congress of Berlin)—এই অবস্থায় ১৮৭৮ খ্রীঃ বার্লিন শহরে পূর্বাঞ্চলের সমস্যা নিয়ে একটি বৈঠক বসল। এই বৈঠকে জার্মানীর চ্যান্সেলর বিসমার্ক পৌরোহিত্য করলেন। ইংলণ্ডের ধুরন্ধর রাজনীতিবিদ ও তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী ডিসরেলী এই বৈঠকে যোগ দেন। এই বৈঠকে স্যান ষ্টিফানোর সন্ধির সর্তগুলিকে অনেকাংশে সংশোধন করা হয়। বার্লিন সন্ধিতে সার্বিয়া ও মণ্টেনিগ্রোকে তুরস্কের কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত স্বাধীন রাষ্ট্র বলে স্বীকার করা হয়; স্যান ষ্টিফানোর সন্ধিতে যে ঐক্যবদ্ধ বুলগেরিয়া রাষ্ট্র গঠন করা হয়েছিল তা ভেঙে দেওয়া হয় এবং বুলগেরিয়াকে তিনটি অংশে বিভক্ত করে দুর্বল করে রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়; বসনিয়া ও হের্জেগভিনায় অষ্ট্রিয়ার কর্তৃত্ব কার্যত মেনে নেওয়া হয়; রাশিয়াকে ইউরোপে বেসারেবিয়া ও এশিয়ায় বাটুম ও কারস দখলের অনুমতি দেওয়া হয়; ইংলণ্ডও তুরস্কের সাম্রাজ্যের একটি অংশ সাইপ্রাস দখল করার অধিকার লাভ করে।

বার্লিন বৈঠকের সিদ্ধান্ত

ইংলণ্ডে ফিরে গিয়ে বার্লিনের চুক্তি সম্পর্কে ডিসরেলী বলেছিলেন—

তিনি সম্মানের সঙ্গে শান্তি রক্ষা করে এসেছেন। ("I have brought peace with honour") কিন্তু বার্লিন চুক্তির সর্তাদি আলোচনা করলে দেখা যায় এই চুক্তির এত প্রশংসা করার কোন হেতু নেই।

বার্লিন চুক্তির সমালোচনা

এই বৈঠকে ইংলণ্ড তুরস্ক সাম্রাজ্য ভেঙ্গে দেওয়ার পক্ষে মত দিতে বাধ্য হয়েছিল। এই সন্ধিতে তুরস্কের সাম্রাজ্যভুক্ত (যেমন, সার্বিয়া, রুমানিয়া ও মন্টেনিগ্রো) অনেকগুলি অঞ্চলকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল। তুরস্কের কয়েকটি অঞ্চলকে বৃহৎ শক্তিদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়েছিল (যেমন, ইংলণ্ডকে দেওয়া হয়েছিল সাইপ্রাস, এবং অষ্ট্রিয়াকে দখল করতে দেওয়া হয়েছিল বসনিয়া ও হের্জেগভিনা)।

বস্তুতঃ বৃহৎ শক্তিগুলি প্রাচ্য সমস্যার মূল প্রশ্নটিকে অর্থাৎ বলকান অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলির স্বাধীনতার আকাজ্ক্ষাকে মোটেই গুরুত্ব দেন নি। বুলগেরিয়াকে খণ্ড খণ্ড করে রাখায় বুলগেরিয়াবাসীদের স্বাধীনতা কামনা অতৃপ্ত রয়ে গেল। সার্বিয়ার শক্তিশালী জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের আকাজ্ক্ষাকেও অষ্ট্রিয়ার যুপকাষ্ঠে বলি দেওয়া হয়। এক কথায়, বার্লিন চুক্তির কর্ণধারেরা নিজেদের স্বার্থ নিয়ে এত বেশী ব্যস্ত ছিলেন যে তাঁদের পক্ষে বলকান সমস্যার স্থায়ী সমাধানের দিকে তাকানো সম্ভব হয় নি।

বার্লিন সন্ধি থেকে বলকান যুদ্ধ

কিছুদিন যেতে না যেতেই বার্লিন চুক্তির বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ পেতে লাগল। বার্লিন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করল বুলগেরিয়া। বুলগেরিয়া ঐক্যবদ্ধ জাতীয় রাষ্ট্রের দাবীতে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলল। ১৮৮৫ খ্রীঃ পূর্ব রুমেনিয়া থেকে তুরস্কের শাসনকর্তাকে বিতাড়িত করে বুলগেরিয়ার অধিবাসীরা বুলগেরিয়াতে দুই অংশকে নিয়ে ঐক্যবদ্ধ জাতীয় রাষ্ট্র গঠন করল।

বার্লিন ব্যবস্থা সম্পর্কে অসন্তোষ —বলকান অঞ্চলে স্বাধীনতা আন্দোলন

বুলগেরিয়ার পরেই এল আর্মেনিয়ানদের পালা। তুরস্কের সাম্রাজ্যের মধ্যে অনেক আর্মেনিয়ান প্রজা বাস করত। তাদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালাবার ফলে আর্মেনিয়ান প্রজারা একযোগে তুরস্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। হাজার হাজার আর্মেনিয়ান প্রজাকে হত্যা করে তুরস্ক এই বিদ্রোহ দমন করে।

আর্মেনিয়ানদের পরে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করে ক্রীট (Crete)। ক্রীট একটি দ্বীপ। এই দ্বীপে যারা বাস করত, তারা জাতিতে ছিল গ্রীক। ক্রীটের অধিবাসীরা তুরস্কের কর্তৃত্ব মুক্ত হয়ে গ্রীসের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হতে চেয়েছিল। ১৮৯৬ খ্রীঃ ক্রীটে বিদ্রোহ আরম্ভ হলে গ্রীকরাষ্ট্র তার সমর্থনে এগিয়ে আসে। এতে তুরস্ক গ্রীসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এই যুদ্ধে গ্রীস পরাজিত হয়। কিন্তু তুরস্কের পক্ষে ক্রীটের উপর তার কর্তৃত্ব বজায় রাখা আর সম্ভব হল না। ক্রীট একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করল।

নবীন তুরস্ক আন্দোলন
(Young Turk Movement)

যখন বলকান অঞ্চলে এই ধরণের আলোড়ন চলছিল, তখন তুরস্কে এক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পরিবর্তনের সূচনা হল।

তুরস্ক সাম্রাজ্যের দুর্বলতা যেমন ইওরোপের লোকদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, তেমনি তুরস্কের ভিতরেও একদল যুবক এই দুর্বলতা সম্পর্কে সজাগ হলেন। তাঁরা তুরস্কে রাজনৈতিক সংস্কার প্রবর্তন করে তুরস্ককে একটি আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত করতে চাইলেন।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্কে এক যুবক দল রাজনীতিতে নতুন চিন্তা সঞ্চারের চেষ্টা করেন। এই যুবকদল ছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত। তাঁরা পাশ্চাত্য দেশের পথ অনুসরণ করে তুরস্কে রাজনৈতিক সংস্কার প্রবর্তনে অগ্রণী হলেন। তাঁরা তুরস্কের সুলতানকে একটি গঠনতন্ত্র প্রবর্তন করতে বাধ্য করলেন। একটি পার্লামেণ্টও গঠন করা হল। মধ্যযুগীয় স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের তাঁরা অবসান ঘোষণা করলেন। তাঁরা বৈদেশিক নীতিতে তুরস্কের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখার সংকল্প গ্রহণ করেন। তাঁরা ঘোষণা করলেন—বৃহৎ শক্তির অঙ্গুলিহেলনে তুরস্ক এখন আর পরিচালিত হবে না।

কিন্তু নবীন তুরস্ক আন্দোলন জনসাধারাণর উন্নতির দিকে দৃষ্টি দেয় নাই। তুরস্ক সাম্রাজ্যের মধ্যে যে সমস্ত বিভিন্ন জাতি বাস করত তাদের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার প্রতি এই আন্দোলনের কোন সহানুভূতি ছিল না। বরং তাঁরা বিজিত দেশগুলির উপর জোর করে তুরস্কের আচার—ব্যবহার চাপিয়ে দেবার পক্ষপাতী ছিলেন।

প্রথম বলকান যুদ্ধ—নবীন তুরস্ক আন্দোলন পরিচালিত তুর্কীকরণ

তিনি সম্মানের সঙ্গে শান্তি রক্ষা করে এসেছেন। ("I have brought peace with honour") কিন্তু বার্লিন চুক্তির সর্তাদি আলোচনা করলে দেখা যায় এই চুক্তির এত প্রশংসা করার কোন হেতু নেই।

বার্লিন চুক্তির সমালোচনা

এই বৈঠকে ইংলণ্ড তুরস্ক সাম্রাজ্য ভেঙ্গে দেওয়ার পক্ষে মত দিতে বাধ্য হয়েছিল। এই সন্ধিতে তুরস্কের সাম্রাজ্যভুক্ত (যেমন, সার্বিয়া, রুমানিয়া ও মন্টেনিগ্রো) অনেকগুলি অঞ্চলকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল। তুরস্কের কয়েকটি অঞ্চলকে বৃহৎ শক্তিদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়েছিল (যেমন, ইংলণ্ডকে দেওয়া হয়েছিল সাইপ্রাস, এবং অষ্ট্রিয়াকে দখল করতে দেওয়া হয়েছিল বসনিয়া ও হের্জেগভিনা)।

বস্তুতঃ বৃহৎ শক্তিগুলি প্রাচ্য সমস্যার মূল প্রশ্নটিকে অর্থাৎ বলকান অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলির স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে মোটেই গুরুত্ব দেন নি। বুলগেরিয়াকে খণ্ড খণ্ড করে রাখায় বুলগেরিয়াবাসীদের স্বাধীনতা কামনা অতৃপ্ত রয়ে গেল। সার্বিয়ার শক্তিশালী জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের আকাঙ্ক্ষাকেও অষ্ট্রিয়ার যুপকাষ্ঠে বলি দেওয়া হয়। এক কথায়, বার্লিন চুক্তির কর্ণধারেরা নিজেদের স্বার্থ নিয়ে এত বেশী ব্যস্ত ছিলেন যে তাঁদের পক্ষে বলকান সমস্যার স্থায়ী সমাধানের দিকে তাকানো সম্ভব হয় নি।

বার্লিন সন্ধি থেকে বলকান যুদ্ধ

কিছুদিন যেতে না যেতেই বার্লিন চুক্তির বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ পেতে লাগল। বার্লিন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করল বুলগেরিয়া। বুলগেরিয়া ঐক্যবদ্ধ জাতীয় রাষ্ট্রের দাবীতে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলল। ১৮৮৫ খ্রীঃ পূর্ব রুমেনিয়া থেকে তুরস্কের শাসনকর্তাকে বিতাড়িত করে বুলগেরিয়ার অধিবাসীরা বুলগেরিয়াতে দুই অংশকে নিয়ে ঐক্যবদ্ধ জাতীয় রাষ্ট্র গঠন করল।

বার্লিন ব্যবস্থা সম্পর্কে অসন্তোষ —বলকান অঞ্চলে স্বাধীনতা আন্দোলন

বুলগেরিয়ার পরেই এল আর্মেনিয়ানদের পালা। তুরস্কের সাম্রাজ্যের মধ্যে অনেক আর্মেনিয়ান প্রজা বাস করত। তাদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালাবার ফলে আর্মেনিয়ান প্রজারা একযোগে তুরস্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। হাজার হাজার আর্মেনিয়ান প্রজাকে হত্যা করে তুরস্ক এই বিদ্রোহ দমন করে।

আর্মেনিয়ানদের পরে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করে ক্রীট (Crete)। ক্রীট একটি দ্বীপ। এই দ্বীপে যারা বাস করত, তারা জাতিতে ছিল গ্রীক। ক্রীটের অধিবাসীরা তুরস্কের কর্তৃত্ব মুক্ত হয়ে গ্রীসের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হতে চেয়েছিল। ১৮৯৬ খ্রীঃ ক্রীটে বিদ্রোহ আরম্ভ হলে গ্রীকরাষ্ট্র তার সমর্থনে এগিয়ে আসে। এতে তুরস্ক গ্রীসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এই যুদ্ধে গ্রীস পরাজিত হয়। কিন্তু তুরস্কের পক্ষে ক্রীটের উপর তার কর্তৃত্ব বজায় রাখা আর সম্ভব হল না। ক্রীট একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করল।

নবীন তুরস্ক আন্দোলন
(Young Turk Movement)

যখন বলকান অঞ্চলে এই ধরণের আলোড়ন চলছিল, তখন তুরস্কে এক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পরিবর্তনের সূচনা হল।

তুরস্ক সাম্রাজ্যের দুর্বলতা যেমন ইওরোপের লোকদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, তেমনি তুরস্কের ভিতরেও একদল যুবক এই দুর্বলতা সম্পর্কে সজাগ হলেন। তাঁরা তুরস্কে রাজনৈতিক সংস্কার প্রবর্তন করে তুরস্ককে একটি আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত করতে চাইলেন।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্কে এক যুবক দল রাজনীতিতে নতুন চিন্তা সঞ্চারের চেষ্টা করেন। এই যুবকদল ছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত। তাঁরা পাশ্চাত্য দেশের পথ অনুসরণ করে তুরস্কে রাজনৈতিক সংস্কার প্রবর্তনে অগ্রণী হলেন। তাঁরা তুরস্কের সুলতানকে একটি গঠনতন্ত্র প্রবর্তন করতে বাধ্য করলেন। একটি পার্লামেণ্টও গঠন করা হল। মধ্যযুগীয় স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের তাঁরা অবসান ঘোষণা করলেন। তাঁরা বৈদেশিক নীতিতে তুরস্কের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখার সংকল্প গ্রহণ করেন। তাঁরা ঘোষণা করলেন—বৃহৎ শক্তির অঙ্গুলিহেলনে তুরস্ক এখন আর পরিচালিত হবে না।

কিন্তু নবীন তুরস্ক আন্দোলন জনসাধারণের উন্নতির দিকে দৃষ্টি দেয় নাই। তুরস্ক সাম্রাজ্যের মধ্যে যে সমস্ত বিভিন্ন জাতি বাস করত তাদের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার প্রতি এই আন্দোলনের কোন সহানুভূতি ছিল না। বরং তাঁরা বিজিত দেশগুলির উপর জোর করে তুরস্কের আচার—ব্যবহার চাপিয়ে দেবার পক্ষপাতী ছিলেন।

প্রথম বলকান যুদ্ধ—নবীন তুরস্ক আন্দোলন পরিচালিত তুর্কীকরণ

(Turkification) নীতি ম্যাসিডোনিয়ার লোকদের মধ্যে গভীর অসন্তোষ সৃষ্টি করল। ম্যাসিডোনিয়ার ধর্মগত, জাতিগত ঐতিহ্য বিনষ্ট হবার উপক্রম হল। এই অবস্থায়, বলকান অঞ্চলের চারটি রাষ্ট্র সার্বিয়া, বুলগেরিয়া, গ্রীস ও মন্টেনিগ্রো—মিলিত হয়ে একটি সংঘ গঠন করল এবং তুরস্কের বিরুদ্ধে সংযুক্ত প্রতিরোধের সংকল্প গ্রহণ করল। তারা তুরস্কের কাছে ম্যাসিডোনিয়ার অধিবাসীদের ধর্মীয় ও জাতিগত ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রাখার দাবী পেশ করল। কিন্তু তুরস্ক কর্ণপাত না করায় তারা তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। এইটি **প্রথম বলকান যুদ্ধ** (১৯১২) বলে পরিচিত। এই যুদ্ধে তুরস্ক বলকান রাষ্ট্রগুলির হাতে চূড়ান্ত পরাজয়ের সম্মুখীন হয়। ১৯১৩ খ্রীঃ তুরস্ক লণ্ডনের সন্ধি মেনে নিলে যুদ্ধের অবসান হয়।

লণ্ডনের সন্ধি (১৯১৩)

লণ্ডনের সন্ধির (১৯১৩) ফলে কনস্তান্তিনোপল ছাড়া প্রায় সমস্ত বলকান অঞ্চল তুরস্কের কর্তৃত্ব থেকে চলে যায়। তুরস্ক গ্রীসকে ক্রীট দ্বীপটি ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। আলবানিয়া নামে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত হয়।

দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধ—কিন্তু তুরস্কের বিরুদ্ধে যে মিলিত সংযুক্ত ফ্রন্ট গড়ে উঠেছিল তা বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। প্রথম বলকান যুদ্ধে জয়লাভ করে বলকান লীগের অন্তর্ভুক্ত চারটি রাষ্ট্র পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া করতে থাকে। ম্যাসিডোনিয়ার বিভিন্ন অংশ নিয়ে তাদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। সার্বিয়া ম্যাসিডোনিয়ার একটি অংশ দখল করে নেওয়ার সম্ভাবনা দেখা গেলে বুলগেরিয়া ঈর্ষান্বিত হয়। বুলগেরিয়া এই অগ্রগতি রোধের ইচ্ছা নিয়ে সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। বুলগেরিয়ার এই অতর্কিত আক্রমণে অন্যান্য বলকান রাষ্ট্রগুলি অসন্তুষ্ট হয়। গ্রীসও রুমানিয়া সার্বিয়ার পক্ষ সমর্থন করে বুলগেরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। তুরস্ক লণ্ডনের চুক্তির অপমান ভুলতে পারে নাই। তাই এই যুদ্ধের মধ্য দিয়ে নিজের হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের বাসনা নিয়ে তুরস্ক সার্বিয়া, গ্রীস ও রুমানিয়ার পক্ষভুক্ত হয়ে বুলগেরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এইটি **দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধ** (১৯১৩) বলে পরিচিত। এই যুদ্ধে বুলগেরিয়া মিলিত শক্তিগুলির হাতে পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয়। **বুখারেষ্টের সন্ধি** (১৯১৩) অনুযায়ী যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে।

বুখারেষ্টের সন্ধি (১৯১৩)

বুখারেষ্টের সন্ধিতে (১৯১৩) বুলগেরিয়া তার দখলীকৃত অনেক অঞ্চল ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। সার্বিয়া ও গ্রীসকে বুলগেরিয়া ম্যাসিডোনিয়ার একটি অংশ ছেড়ে দেয়। রুমানিয়া বুলগেরিয়ার একটি অংশ লাভ করে। তুরস্ক স্পেনের একটি অংশের উপর এবং এড্রিয়ানোপলের উপর কর্তৃত্ব লাভ করে।

বলকান যুদ্ধের ফলে ইওরোপের রাজনীতিতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন লক্ষিত হয়। এই যুদ্ধের পরে তুরস্ক সাম্রাজ্য ছায়ামাত্রে পর্য্যবসিত হয়। একে একে সমগ্র বলকান অঞ্চল তুরস্ক সাম্রাজ্যের ভিতর থেকে বেরিয়ে যায়।

বল্কানযুদ্ধের ফলাফল

কিন্তু তুরস্ক সাম্রাজ্যের পতনের ফলে প্রাচ্য সমস্যার সমাধান হল না। বলকান অঞ্চলের জাতি সমস্যার কোনো সন্তোষজনক সমাধান না হওয়ায় বলকান অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলির মধ্যে মনোমালিন্য বেড়ে চলে। বুলগেরিয়ার সঙ্গে সার্বিয়ার বিরোধ এই অঞ্চলের শান্তির পক্ষে বিঘ্নস্বরূপ হয়ে দাঁড়াল।

তাছাড়া, সার্বিয়ার উন্নতি ও অগ্রগতিতে অস্ট্রিয়া ঈর্ষান্বিত হল। অস্ট্রিয়ার ইচ্ছা ছিল বলকান অঞ্চলে সাম্রাজ্য বিস্তার করা। কিন্তু সার্বিয়ার অগ্রগতি তার সাম্রাজ্য বিস্তারের পথে অন্তরায়স্বরূপ হয়ে উঠল। তাই অস্ট্রিয়া ও সার্বিয়ার মধ্যে মনোমালিন্য বেড়ে চলল। এই মনোমালিন্য থেকে ১৯১৪ খ্রীঃ এই দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ বাধে এবং এই যুদ্ধ থেকেই প্রথম মহাযুদ্ধের সূত্রপাত হয়।

কাজেই একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে প্রাচ্য সমস্যার মধ্যেই প্রথম মহাযুদ্ধের বীজ নিহিত ছিল।

সপ্তম অধ্যায়

ইওরোপ (১৮৭৮—১৯১৪)

জার্মানীর উত্থান (১৮৭০—৯০) : বিসমার্ক

[Rise of Germany : Bismarck]

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে অন্যতম প্রধান ঘটনা—জার্মানীর উত্থান। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীর সমস্ত অঞ্চল মিলে একটি অখণ্ড জাতীয় রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল। ১৮৭১-১৯১৮ পর্যন্ত জার্মানীর কর্ণধার ছিলেন দুজন, বিসমার্ক (১৮৭১-১৮৯০) এবং কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ম (১৮৮৮-১৯১৮)।

আভ্যন্তরীণ শাসন (Domestic Policy) : বিসমার্ক ছিলেন এই যুগের ইওরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ ; কূটনীতিতে তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিল না। বিসমার্ক স্বৈরাচারী শাসনের পক্ষপাতী ছিলেন। গণতন্ত্রের প্রতি তাঁর কোন আস্থা ছিল না। তাঁর শক্তির প্রধান স্তম্ভ ছিল জার্মানীর সুগঠিত সেনাবাহিনী। তিনি অস্ত্রবলের জোরে দেশ শাসন করতেন। সেইজন্য বলা হয়ে থাকে যে তাঁর শাসন ছিল রক্তাপ্লুত ও লৌহদৃঢ়। বিসমার্ককে বলা হয়ে থাকে—'a statesman of blood and iron'.

বিসমার্ক ও ক্যাথলিকদের মধ্যে বিরোধ

বিসমার্কের সঙ্গে প্রথম বিরোধ দেখা দিল ক্যাথলিক চার্চের সঙ্গে। ক্যাথলিক চার্চের কার্যকলাপ বিসমার্ক পছন্দ করতেন না। তার কারণ, ক্যাথলিক চার্চ জার্মানীর সম্রাটের কর্তৃত্বকে চূড়ান্ত বলে মেনে নিতে রাজী ছিল না। বিসমার্ক ক্যাথলিক চার্চকে তিরস্কার করলেন এই বলে যে তোমরা বাস করবে জার্মানীতে, অথচ তোমরা জার্মানীর রাজাকে মানবে না—এটা অন্যায়। তিনি বললেন—রাষ্ট্রের মধ্যে থেকেও একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের মত চলতে চাইছে ক্যাথলিক চার্চ (a state within a state)। এইজন্য তিনি ক্যাথলিকদের উপর পীড়ন-নীতি প্রয়োগ করলেন ; **মে-আইন** নামে কতকগুলি আইন পাস করে তিনি ক্যাথলিকদের অধিকাংশ অধিকার হরণ করলেন। যারা মে-আইন লঙ্ঘন করবে তাদের তিনি কঠোর সাজা দেবার ব্যবস্থা করলেন।

কিন্তু ক্যাথলিকদের সঙ্গে যখন বিসমার্কের বিরোধ চলছিল, সেই সময়ে জার্মানীতে আরও একটি দুর্ধর্ষ শক্তির আবির্ভাব ঘটল। এই শক্তি ছিল জার্মানীর সমাজতন্ত্রী বা সোস্যালিস্ট দল।

জার্মানীতে সোস্যালিস্ট দলের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন **কার্ল মার্কস ও ল্যাসাল**। এই সমাজতন্ত্রী দল ছিল সব দিকেই বিসমার্কের বিরোধী। বিসমার্ক ছিলেন স্বৈরাচারী; এঁরা ছিলেন স্বৈরাচারের বিরোধী। বিসমার্ক ছিলেন বড় বড় জমিদার ও শিল্পপতিদের বন্ধু, আর এঁরা ছিলেন শ্রমিক, কৃষক ও নির্যাতিত জনতার সংগঠক। বিসমার্ক ছিলেন জার্মানীর সাম্রাজ্যবিস্তারের পক্ষপাতী, আর এঁরা ছিলেন সাম্রাজ্যবাদ ও সমরবাদের বিরোধী। কাজেই বিসমার্কের সঙ্গে সমাজতন্ত্রীদের ছিল পদে পদে পার্থক্য।

বিসমার্ক ও সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে বিরোধ

বিসমার্ক অনুভব করলেন—ক্যাথলিকদের চেয়েও সমাজতন্ত্রীরা তাঁর বড় শত্রু। তাই তিনি ক্যাথলিকদের সঙ্গে আপস করে সমাজতন্ত্রীদের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করলেন।

বিসমার্ক সমাজতন্ত্রীদের প্রভাব নাশের জন্য দুটি উপায় অবলম্বন করলেন। প্রথম, তিনি প্রচণ্ড দমন-নীতি চালিয়ে সমাজতন্ত্রীদের প্রভাব লুপ্ত করতে চাইলেন। সমাজতন্ত্রীদের সভা-সমিতির অধিকার তিনি হরণ করলেন, তাদের দ্বারা পরিচালিত সংঘগুলি ও সংবাদপত্রগুলি তিনি নিষিদ্ধ করলেন। সমাজতন্ত্রীদের প্রভাব লোপ করার উদ্দেশ্যে তিনি আরও একটি নূতন উপায়ের আশ্রয় নিলেন। তিনি 'শ্রমিক কল্যাণে'র কিছুটা ব্যবস্থা করে শ্রমিকদের সহানুভূতি সংগ্রহের চেষ্টা করলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি শ্রমিকদের রোগের চিকিৎসার জন্যে সাহায্যদান, দুর্ঘটনার জন্য ক্ষতিপূরণ এবং বৃদ্ধ বয়সে পেনসনের ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু এত চেষ্টা করেও বিসমার্ক জার্মানীতে সমাজতন্ত্রীদের ক্ষমতা ও প্রভাব নষ্ট করতে সক্ষম হন নাই।

সমাজতন্ত্রীদল

শ্রমিকতোষণ

বিসমার্কের সময়ে জার্মানীর যে শক্তিবৃদ্ধি হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই সময়ে জার্মানীতে প্রভূত শিল্পোন্নতি হয়েছিল। তাঁর সময়ে জার্মানী ইওরোপের বাইরে উপনিবেশ বিস্তারেও মনোযোগী হয়েছিল।

আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও বিসমার্ক (Bismarck and International Politics) : ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে প্রাশিয়ার হাতে ফ্রান্সের পরাজয় বরণ—আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। এই সময় থেকে ইওরোপের রাজনীতিতে জার্মানী ও জার্মানীর কর্ণধার বিসমার্কের

কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। বিসমার্ক চাইলেন জার্মান রাষ্ট্রকে ইওরোপের মধ্যে সব চেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করতে। এই উদ্দেশ্যে তিনি অনুভব করলেন যে জার্মানীর পক্ষে শান্তি অপরিহার্য। তিনি জার্মানীর শত্রুদের বিশেষ করে ফ্রান্সকে একঘরে করার নীতি অবলম্বন করলেন। তিনি ঘোষণা করলেন—জার্মানী সাম্রাজ্য বিস্তারে মনোযোগী নয়। বিসমার্ক জানতেন যে সাম্রাজ্য বিস্তারে মন দিলে তাঁকে শেষ পর্যন্ত ব্রিটেনের বিরাগভাজন হতে হবে। অপরপক্ষে, তিনি যদি সাম্রাজ্য বিস্তারে মন না দেন, তাহলে ব্রিটেনের সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় থাকবে এবং এই বন্ধুত্ব ফ্রান্সকে একঘরে করার নীতির পক্ষে অত্যন্ত সহায়ক হবে। তাছাড়া, তিনি আরও ঘোষণা করলেন যে, পূর্ব ইওরোপের রাজনীতিতেও জার্মানী হস্তক্ষেপ করবে না। এইভাবে ইওরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রকে—জার্মানীর যে আক্রমণাত্মক কোন উদ্দেশ্য নাই—এই বিষয়ে আশ্বস্ত করে এখন তিনি ফ্রান্সকে একঘরে করার নীতির দিকে অগ্রসর হতে থাকলেন।

বিসমার্কের নীতি

ড্রাইকাইজারবণ্ড (১৮৭২)

১৮৭২ খ্রীঃ বিসমার্কের উদ্যোগে তিন সম্রাটের (জার্মানী, রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী) এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। এইটি ড্রাইকাইজারবণ্ড (Dreikaiser-bund) নামে পরিচিত।

বার্লিন কংগ্রেস (১৮৭৮)

কিন্তু রাশিয়ার সঙ্গে জার্মানীর চুক্তি বেশীদিন স্থায়ী হল না। ১৮৭৮ খ্রীঃ বার্লিন শহরে বিসমার্কের সভাপতিত্বে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই সম্মেলনটি বার্লিন কংগ্রেস (Congress of Berlin) বলে পরিচিত। এই সম্মেলনে অস্ট্রিয়া, ব্রিটেন ও রাশিয়া যোগ দিয়েছিল। এই সম্মেলনে বিসমার্ক ইংলণ্ডকে সাইপ্রাস দ্বীপ অধিকার করার সুযোগ দিলেন। পূর্ব ইওরোপে অস্ট্রিয়াকে তিনি বসনিয়া ও হের্জেগোভিনা নামে একটি অঞ্চল দখল করার অধিকার দিলেন। পূর্ব ইওরোপে অস্ট্রিয়া অগ্রসর হবার যে সুযোগ পেল তাতে রাশিয়া ঈর্ষান্বিত হল। রাগের আরও কারণ—রাশিয়া পূর্ব ইওরোপে বেসারাবিয়া নামে একটি অঞ্চল মাত্র দখল করার সুযোগ পেল। এর ফলে রাশিয়া ও জার্মানীর মধ্যে মন কষাকষি আরম্ভ হল এবং এর পূর্বে

জার্মানী ও রাশিয়ার মধ্যে মনোমালিন্য

তাদের মধ্যে যে ড্রাইকাইজারবণ্ড চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল রাশিয়া তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করল।

দ্বিপক্ষীয় চুক্তি : জার্মানী ও অস্ট্রীয়া (১৮৭৯)

১৮৭৯ খ্রীঃ বিসমার্কের উদ্যোগে জার্মানী ও অস্ট্রীয়ার মধ্যে একটি দ্বিপক্ষীয় চুক্তি (Dual Alliance) স্বাক্ষরিত হল।

ত্রিপক্ষীয় চুক্তি : জার্মানী, অষ্ট্রিয়া ও ইতালী (১৮৮২)

১৮৮২ খ্রীঃ বিসমার্ক ইতালীর সঙ্গেও একটি চুক্তি স্বাক্ষর করায় দ্বিপক্ষীয় চুক্তিটি ত্রিপক্ষীয় চুক্তিতে (Triple Alliance) পরিণত হল। রাশিয়ার সঙ্গে চুক্তি ভেঙে গেলেও বিসমার্ক জার্মানীর সঙ্গে রাশিয়ার তিক্ততার সম্পর্ক যাতে গড়ে না উঠে তার দিকে নজর দিলেন। তিনি রাশিয়াকে এই বলে আশ্বস্ত করলেন যে নিকট প্রাচ্যে রাশিয়া যদি সাম্রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করে তাহলে জার্মানী তাতে বাধা দেবে না। এই আশ্বাসের ভিত্তিতে জার্মানী ও রাশিয়ার মধ্যে Reinsurance Treaty নামে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। কিন্তু বিসমার্কের পদত্যাগের পরে কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ম যখন জার্মানীর কর্ণধার হলেন তখন থেকে জার্মানী ও রাশিয়ার মধ্যে আবার মনোমালিন্য আরম্ভ হয়।

রাশিয়ার সঙ্গে জার্মানীর চুক্তি (১৮৮৭)

কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়মের উগ্র সাম্রাজ্যবাদী নীতি

(Aggressive Imperialist Policy of Caizer William II) : কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়মের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পর থেকে জার্মানীর বৈদেশিক নীতিতে আমূল পরিবর্তন লক্ষিত হয়। দ্বিতীয় উইলিয়াম ছিলেন উগ্র জাতীয়তাবাদী। তিনি সারা বিশ্বে জার্মানীর সাম্রাজ্য-বিস্তারের জন্য ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন। তিনি বললেন—পৃথিবীতে জার্মানী স্থান চায় (Germany wants a place under the sun)। কাইজার



কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম

দেখলেন শিল্পোন্নত জার্মানীর কাঁচামাল সংগ্রহের জন্য এশিয়া ও আফ্রিকায় উপনিবেশ স্থাপন প্রয়োজন। তাই তিনি এশিয়া ও আফ্রিকায় জার্মানীর সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য উৎসুক হয়ে উঠলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি চীনের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করলেন। চীনে কিয়াচো প্রদেশে ও সানটুঙ্ অঞ্চলে তিনি জার্মানীর প্রভাব স্থাপন করলেন। পূর্ব আফ্রিকা, পশ্চিম আফ্রিকা ও কঙ্গো প্রদেশে জার্মানী বিস্তৃত অঞ্চল দখল করল। প্রশান্ত মহাসাগরে অনেকগুলি দ্বীপও জার্মানী অধিকার করল। আফ্রিকায় বুয়ার বিদ্রোহ আরম্ভ হলে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে বুয়ারদের জার্মানী সাহায্য করল। জার্মানীর সাম্রাজ্য বিস্তারে ব্রিটেন রীতিমত আতঙ্কিত হয়ে উঠল।

ইঙ্গ-জার্মান মনোমালিন্য

ব্রিটেনের সব চেয়ে আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়াল পূর্ব ইওরোপে ও নিকট প্রাচ্যে জার্মানীর কার্যকলাপ। জার্মানী তুরস্ককে সামরিক সাহায্য দিতে লাগল। বার্লিন থেকে বাগদাদ পর্যন্ত একটি রেলপথ স্থাপন করা হল। কাইজার ৩০ কোটি মুসলমানের বন্ধু ও আশ্রয় দাতা বলে নিজেকে জাহির করলেন। এর পাশাপাশি তিনি জার্মানীর সৈন্যবাহিনী ও নৌবাহিনীর আয়তন ক্রমেই বাড়িয়ে যেতে থাকলেন। জার্মানীর আক্রমণাত্মক নীতির বিরুদ্ধে আত্মরক্ষামূলক চুক্তি গঠনের প্রয়োজনীয়তা ব্রিটেন অনুভব করতে থাকল।

ইঙ্গ-ফরাসী মনোমালিন্য

ফ্রান্সের সঙ্গেও জার্মানীর মনোমালিন্য আরম্ভ হল। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র হিসাবে ইংলণ্ডের পরেই ছিল ফ্রান্সের স্থান। আফ্রিকার উত্তরে ভূমধ্যসাগরের উপকূলে ফ্রান্সের কতকগুলি উপনিবেশ ছিল। জার্মানীর শক্তিবৃদ্ধিতে ফ্রান্সের ভয় হল।

মিত্রশক্তিগুলির প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা (Defensive Alliance of the Allies): শুধু ব্রিটেনে ও ফ্রান্সে নয়, ক্রমে ক্রমে জার্মানীর আক্রমণাত্মক কাজকর্মের বিরুদ্ধে সারা ইওরোপে সাজ সাজ রব উঠল।

জার্মানী পূর্ব ইওরোপে অস্ট্রীয়ার অগ্রগতিতে সাহায্য দান করায় রাশিয়া অসন্তুষ্ট ছিল। জার্মানীর সামরিক প্রস্তুতি, তুরস্কের সঙ্গে জার্মানীর সামরিক সম্পর্ক স্থাপন, নিকট প্রাচ্যে জার্মানীর সাম্রাজ্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি রাশিয়াকে সন্ত্রস্ত করে তুলল। ১৮৯৩ খ্রীঃ শেষ পর্যন্ত রাশিয়া ফ্রান্সের সঙ্গে

রাশিয়া ও ফ্রান্সের মধ্যে চুক্তি (১৮৯৩)

একটি মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হল। এই চুক্তি অনুযায়ী স্থির হল : রাশিয়া জার্মানী কর্তৃক আক্রান্ত হলে ফ্রান্স জার্মানীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে। তেমনি আবার ফ্রান্স জার্মানী কর্তৃক আক্রান্ত হলে রাশিয়া জার্মানীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে।

ক্রমশ ব্রিটেনও মৈত্রীচুক্তির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করল। এতদিনে ব্রিটেন ইওরোপের রাজনীতিতে 'নির্লিপ্ততা নীতি' (policy of isolation) অনুসরণ করে চলত। কিন্তু এখন ব্রিটেন অনুভব করল নির্লিপ্ততার নীতি পরিবর্তন করা আবশ্যক। তাই ব্রিটেন এশিয়ায় জার্মানীর অগ্রগতি রোধ করার জন্য জাপানের সঙ্গে মৈত্রী চুক্তিতে (১৯০২) আবদ্ধ হল।

ইঙ্গ-জাপান চুক্তি (১৯০২)

১৯০৪ খ্রীঃ জার্মানীর ভয়ে ব্রিটেন এবং ফ্রান্সও পুরানো মনোমালিন্য ভুলে নিজেদের মধ্যে একটি আঁতাত (Entente) গঠন করল। এই আঁতাত অনুযায়ী ফ্রান্স ব্রিটেনকে মিশর অধিকারের সুযোগ দান করল, আর ব্রিটেন ফ্রান্সকে মরক্কো ও শ্যামদেশ অধিকারের সুযোগ দিল।

ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে আঁতাত (১৯০৪)

১৯০৭ খ্রীঃ ব্রিটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়া জার্মানীর বিরুদ্ধে একটি আত্মরক্ষামূলক ত্রিপক্ষীয় চুক্তিতে আবদ্ধ হল।

ব্রিটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে ত্রিপক্ষীয় আঁতাত (১৯০৭)

দুই সশস্ত্র শিবির : ত্রিশক্তি চুক্তি বনাম ত্রিশক্তি আঁতাত

Two Armed Camps : Triple Alliance Vs Triple Entente

এইভাবে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের আগে ইওরোপে পরস্পর বিরোধী দুই চুক্তি-সংস্থা গড়ে উঠল—একদিকে ত্রিপক্ষীয় চুক্তি (জার্মানী, অস্ট্রিয়া ও ইতালী) —যার নেতা ছিল জার্মানী; আর একদিকে ত্রিপক্ষীয় আঁতাত (ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়া)—যার নেতা ছিল ইংলণ্ড।

এক কথায় বলা চলে ইওরোপ দুটি সশস্ত্র শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ল। দুই পক্ষই অস্ত্র প্রতিযোগিতায় মেতে উঠল। এই অস্ত্র প্রতিযোগিতা যত তীব্র হতে থাকল ততই তাদের মধ্যে অবিশ্বাস ও তিক্ততা বেড়ে চলল। ছোটখাট ঘটনা নিয়ে এই দুই সশস্ত্র শিবিরের মধ্যে প্রায়ই বিরোধ বাধতে

লাগল। সকলেই অনুভব করতে লাগল—যে-কোন সময়ে একটি বড় রকমের বিরোধ বেধে যেতে পারে।

প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বাভাষ—(The prelude to the First World War) : এইভাবে ইওরোপ যখন দুটি পরস্পর বিরোধী চুক্তি-ব্যবস্থায় বিভক্ত, তখন প্রধানত দুটি সমস্যা দুই পক্ষের মধ্যে ঝগড়ার প্রধান সূত্র হয়ে উঠল। সেই দুটি হল : (১) মরক্কোর সমস্যা, (২) পূর্ব ইওরোপের সমস্যা।

মরক্কো সমস্যা (The Moroccan Crisis)—আফ্রিকার উত্তরাংশে অবস্থিত মরক্কো ছিল একটি স্বাধীন দেশ। এই দেশের লোকেরা ছিল মুসলমান। মরক্কোর পার্শ্ববর্তী দেশ আলজিরিয়া ছিল ফ্রান্সের উপনিবেশ। তাই ফ্রান্স মরক্কো দেশটির উপর নিজ প্রাধান্য স্থাপনে উৎসুক ছিল। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইতালী, স্পেন ও ইংলণ্ড মরক্কোতে ফ্রান্সের বিশেষ প্রাধান্যের অধিকার মেনে নেয়। এই অধিকারের বলে ফ্রান্স মরক্কোর অর্থনীতি ও রাজনীতিতে প্রবেশের অধিকার পায়।

জার্মানী মরক্কোতে ফ্রান্সের এই আধিপত্য পছন্দ করত না। তাই জার্মানী ফ্রান্সকে জানিয়ে দিল—মরক্কোতে ফ্রান্সের বিশেষ অধিকার সে মেনে নিতে রাজি নয়। জার্মানী দাবী করল মরক্কো সমস্যাটিকে নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন ডাকা হোক। ফ্রান্স এটা পছন্দ করল না ; কিন্তু শেষ পর্যন্ত অবস্থার চাপে পড়ে ফ্রান্সকে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সম্মতি দিতে হয়েছিল।

১৯০৬ খ্রীঃ স্পেনের অন্তর্গত এলজেকিরাস নামক স্থানে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন বসে। এই সম্মেলনে জার্মানীর আপত্তি সত্ত্বেও মরক্কোতে ফ্রান্সের বিশেষ অধিকার স্বীকৃত হয়।

তাই, মরক্কো নিয়ে জার্মানী ও ফ্রান্সের মধ্যে মনোমালিন্য রয়ে গেল। ১৯১১ খ্রীঃ আগাদির নামক বন্দরে এই দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধের পূর্ব অবস্থা সৃষ্টি হয়। কিন্তু ইংলণ্ড হস্তক্ষেপ করায় জার্মানী ফ্রান্সকে সরাসরি আক্রমণ করতে বিরত থাকে। জার্মানী মরক্কোকে ফ্রান্সের রক্ষিত রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকার করে নেয়। কিন্তু ফ্রান্স এর পরিবর্তে আফ্রিকায় ফরাসী কঙ্গোর একটি অংশ জার্মানীকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

মরক্কোর ঘটনা প্রমাণ করল বৃহৎ শক্তিগুলির মধ্যে মনোমালিন্য থেকে যে কোন সময়ে একটি যুদ্ধ বাধার সম্ভাবনা রয়েছে।

বলকান যুদ্ধ (Balkan Wars)—বলকান অঞ্চলের সমস্যা নিয়ে ইওরোপের দুটি সশস্ত্র শিবিরের মধ্যে মনোমালিন্য চরমে উঠ্‌ল।

এই সময়ে বলকান রাষ্ট্রগুলি ছিল আইনত তুরস্ক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু এই তুরস্ক সাম্রাজ্য ছিল পতনোন্মুখ। তাই অষ্ট্রিয়া ও রাশিয়া তুরস্ক সাম্রাজ্যের পতনের সুযোগ নিয়ে এই অঞ্চলে নিজ নিজ আধিপত্য বিস্তারে তৎপর ছিল। অষ্ট্রিয়া ও রাশিয়ার দ্বন্দ্বে জার্মানী অষ্ট্রিয়াকে সমর্থন জানাতে অগ্রসর হল। এতে রাশিয়া বিক্ষুব্ধ হয়ে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সাহায্যপ্রার্থী হল।

১৯০৮ খ্রীঃ অষ্ট্রিয়া তুরস্ক সাম্রাজ্যভুক্ত বসনিয়া ও হের্জেগভিনা দখল করে নেয়। এতে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র সার্বিয়া বিশেষ ক্ষুব্ধ হয়। সার্বিয়া রাশিয়ার সাহায্যে অষ্ট্রিয়াকে এই অঞ্চল থেকে বিতাড়িত করতে চায়। কিন্তু জার্মানী অষ্ট্রিয়ার পাশে এসে দাঁড়ানোর ফলে সার্বিয়া ও রাশিয়া উভয়েই এই ব্যবস্থা মেনে নিতে বাধ্য হয়।

১৯১২-১৩ খ্রীঃ বলকান সমস্যা নিয়ে আবার একটি যুদ্ধ বাধে। বুলগেরিয়া ও সার্বিয়ার মধ্যে রেষারেষি এই যুদ্ধের অন্যতম কারণ। এই যুদ্ধে বুলগেরিয়া পরাজিত হয়। সার্বিয়ার জয়লাভে অষ্ট্রিয়া ঈর্ষান্বিত হয়। অষ্ট্রিয়া সার্বিয়ার হাত থেকে বুলগেরিয়া কেড়ে নেবার চেষ্টা করে। জার্মানীর সমর্থন থাকার জন্যই অষ্ট্রিয়া এই ধরনের আক্রমণাত্মক কাজে অগ্রসর হতে সাহসী হয়। কিন্তু ইংলণ্ড ও রাশিয়ার হস্তক্ষেপের ফলে সার্বিয়া ও অষ্ট্রিয়ার মধ্যে মনোমালিন্য যুদ্ধের পর্যায়ে উঠে নাই।

অষ্ট্রিয়া ও সার্বিয়ার মধ্যে তিক্ততা ক্রমে বৃদ্ধি পায় এবং অবশেষে ১৯১৪ খ্রীঃ অষ্ট্রিয়া ও সার্বিয়ার মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই যুদ্ধ থেকেই প্রথম মহাযুদ্ধের সূত্রপাত।

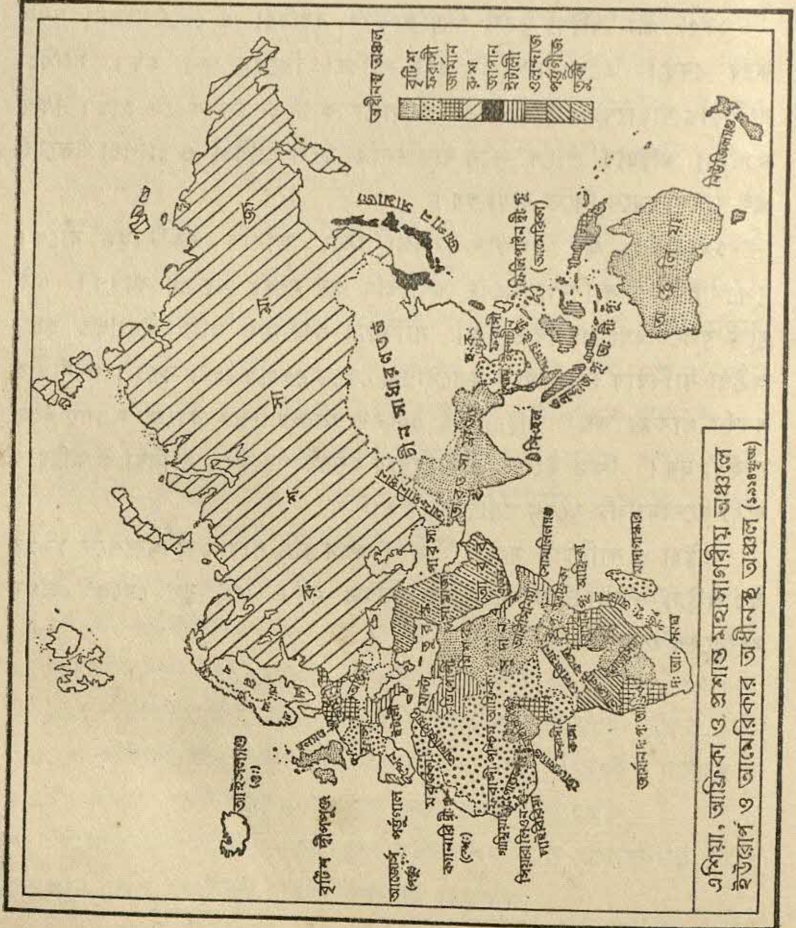
অষ্টম অধ্যায়

[১]

ইওরোপের সাম্রাজ্য বিস্তার

(Expansion of Europe)

বহির্বিশ্বের সঙ্গে ইওরোপের সম্পর্ক আরম্ভ হয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে। পর্তুগাল, স্পেন, হল্যাণ্ড ও ফ্রান্স—এই রাষ্ট্রগুলি সর্বপ্রথম বহির্বিশ্বের



এশিয়া, আফ্রিকা ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ইওরোপ ও আমেরিকার অধীনস্থ অঞ্চল (১৯১৪খৃঃ)

সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছিল। সমুদ্রপথে দুঃসাহসিক অভিযানের মধ্য দিয়ে ইওরোপের ঐ রাষ্ট্রগুলি এশিয়া ও আমেরিকার কয়েকটি দেশে নিজ নিজ উপনিবেশ স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিল। এইভাবে ইংলণ্ড কর্তৃত্ব স্থাপন করেছিল ভারতবর্ষে; হল্যাণ্ড আধিপত্য বিস্তার করেছিল ইন্দোনেশিয়ায়; রাশিয়া নিজ প্রভুত্ব স্থাপন করেছিল মধ্য এশিয়ায়।

আফ্রিকা বণ্টন
(Partition of Africa)

উনবিংশ শতাব্দীতে ঔপনিবেশিকতাবাদের সবচেয়ে উদগ্র প্রকাশ দেখা গেল আফ্রিকায়।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে আফ্রিকা বহির্বিশ্বের কাছে ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, অন্ধকারময় এক মহাদেশ। এই মহাদেশের কেবলমাত্র ইওরোপের সংলগ্ন উপকূলবর্তী অঞ্চলের সঙ্গে ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলির কিছু পরিচয় ছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কয়েকটি বৈজ্ঞানিক অভিযানের পরে ধীরে ধীরে এই অন্ধকার অপসারিত হতে থাকে। কয়েকজন অসম সাহসী ব্যক্তির অভিযানের ফলে মধ্য আফ্রিকায় কয়েকটি অন্ধকারাচ্ছন্ন স্থান আবিষ্কৃত হয়। এই অভিযাত্রীদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন বিখ্যাত অভিযাত্রী

আফ্রিকা অভিযান: লিভিংস্টোন ও স্টানলি

স্কটল্যাণ্ডবাসী **ডেভিড লিভিংস্টোনের** নাম। তিনি খ্রীস্টান মিশনারী ও পর্যটক হিসাবে ব্রিটেনের আনুকূল্যে দুর্গম আফ্রিকার মধ্যভাগে গিয়ে উপস্থিত হন। তাঁর পরে **স্টানলি** নামে আর একজন ব্যক্তি আবিষ্কারের কাজে আরও অগ্রসর হন। তিনি বহু দুর্গম স্থান অতিক্রম করে কঙ্গো নদীর গতিপথ ও মধ্য আফ্রিকার হ্রদবহুল অঞ্চলগুলি বিশ্বের সামনে উদ্ঘাটিত করেন।

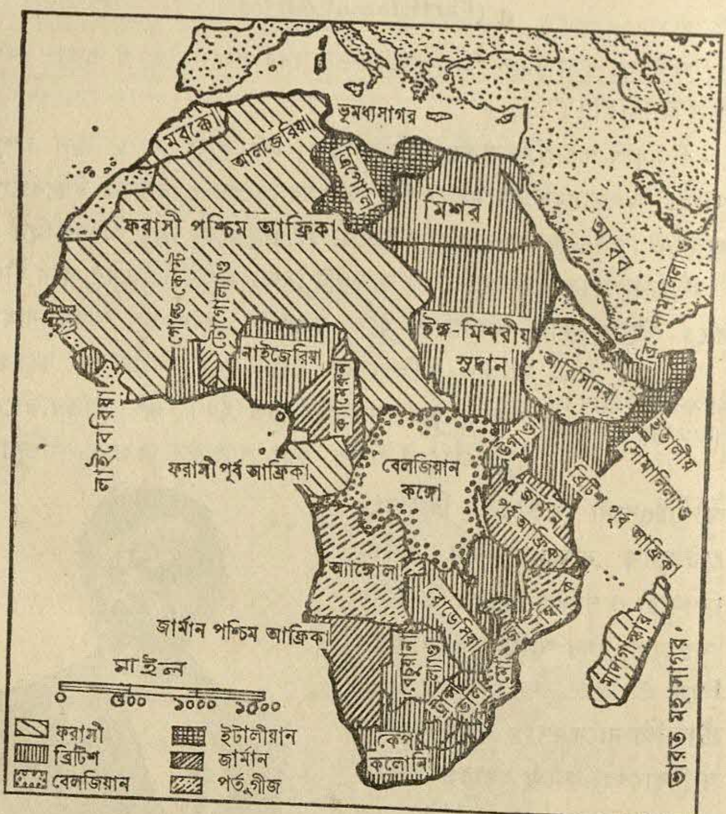


ডেভিড্ লিভিংস্টোন

লিভিংস্টোন ও স্টানলীর আবিষ্কারের ফলে ইওরোপের প্রধান প্রধান

রাষ্ট্রগুলি জানতে পারল যে, আফ্রিকার নবাবিষ্কৃত অঞ্চলগুলি অফুরন্ত খনিজ সম্পদ ও কাঁচামালে সমৃদ্ধ। সঙ্গে সঙ্গে এই অঞ্চলগুলি দখল করার জন্য তাদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা আরম্ভ হল। আফ্রিকা অনুপ্রবেশের কাজে ইওরোপের রাষ্ট্রগুলি উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ থেকে বিশেষ ভাবে মনোযোগ দেয় এবং উনবিংশ শতাব্দী শেষ হবার আগেই একে একে সমগ্র মহাদেশে ইওরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। বৃটেন, ফ্রান্স, ইতালী, বেলজিয়াম,

আফ্রিকা বণ্টনের পালা



আফ্রিকা বণ্টনের মানচিত্র

জার্মানী—ইওরোপের এই রাষ্ট্রগুলি আফ্রিকা বণ্টনের ব্যাপারে প্রথম থেকেই খুব উদ্যোগী হয়ে উঠেছিল।

ইংলণ্ড ঃ ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্রিটেনের কর্তৃত্ব ছিল

শুধু কেপ কলোনির উপর। একশ বছরের মধ্যে ইংলণ্ড নাটাল, রোডেসিয়া ও ট্যাঙ্গানাইকা দখল করল। পশ্চিম আফ্রিকায় ব্রিটেন সাম্রাজ্যভুক্ত করে নিল নাইজেরিয়া ও গোল্ডকোস্ট। পূর্ব আফ্রিকায় সোমালিল্যাণ্ড, উগাণ্ডা ও মিশর। এইভাবে কেপ কলোনি থেকে কাইরো পর্যন্ত প্রায় একটানা এক বিরাট ভূখণ্ডের উপর ব্রিটেনের আধিপত্য বিস্তৃত হল।

ফ্রান্স ঃ ইংলণ্ডের মত ফ্রান্সও আফ্রিকা বণ্টনে শরিক হয়ে উঠল। ফ্রান্স উত্তর আফ্রিকার উপকূলে অবস্থিত মরক্কো থেকে টিউনিস পর্যন্ত এক বিশাল অংশ দখল করল। তারপরে পশ্চিম আফ্রিকার কতকাংশ ও মধ্য আফ্রিকার সমগ্র সাহারা মরুভূমি অঞ্চল ফ্রান্সের অধিকারভুক্ত হল। দক্ষিণ আফ্রিকার নিকটস্থ মাদাগাস্কার দ্বীপটিও সে দখল করে নিল।

জার্মানী ঃ জার্মানীও আফ্রিকা বণ্টনের ব্যাপারে পিছিয়ে থাকতে রাজী হল না। সে ক্যামেরুন ও টোগোল্যাণ্ড দখল করল। তাছাড়া, আফ্রিকার দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের বিস্তৃত ভু-ভাগের খণ্ড খণ্ড অংশ একত্র করে জার্মানী জার্মান দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা ও পূর্ব অঞ্চলে জার্মান দক্ষিণ-পূর্ব আফ্রিকা নামে রাষ্ট্র গঠন করল।

ইওরোপের অন্যান্য রাষ্ট্র ঃ ইওরোপের ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বেলজিয়াম আফ্রিকার মধ্য ভাগে অবস্থিত কঙ্গো প্রদেশে নিজ প্রাধান্য বিস্তার করল। ইতালী আফ্রিকার পূর্বাঞ্চলে ও উত্তর উপকূলস্থিত ট্রিপোলি, এরিট্রিয়া ও সোমালিল্যাণ্ডে নিজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করল।

আফ্রিকা বণ্টনের কাহিনী এখানেই শেষ নয়। আফ্রিকা বণ্টনের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হল মিশর অধিকারের কাহিনীটি।

মিশর অধিকারের কাহিনী (The Story of the Subjugation of Egypt) ঃ মিশর হল আফ্রিকার সবচেয়ে প্রাচীন ও সভ্য অঞ্চল। এই মিশরেই মানবজাতি প্রথম সভ্যতা বিস্তারের অঙ্গীকার করেছিল। মধ্য যুগে তুরস্কের যে বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল মিশর তার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

মিশরের উপর আধিপত্য বিস্তারে সবচেয়ে উদ্যোগী ছিল ইংলণ্ড ও ফ্রান্স। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে মিশরের জমিতে একজন ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার সুয়েজ খাল খনন করেন। এই খাল খননের জন্য মিশরের শাসনকর্তা ব্রিটেন ও ফ্রান্সের কাছে প্রচুর অর্থ ঋণ হিসাবে নিতে

সুয়েজ খাল খনন

বাধ্য হল। এই ঋণ আদায়ের অজুহাতে ব্রিটেন ও ফ্রান্স মিশরের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে সচেষ্ট হয়।

সুয়েজ খাল ও মিশরের উপর আধিপত্য বিস্তার ইংলণ্ডের কাছে অপরিহার্য বলে মনে হল। ইংলণ্ড দেখল ভারতের উপর ও প্রাচ্যখণ্ডের উপর তার আধিপত্য বজায় রাখতে হলে সুয়েজ খালের উপর আধিপত্য একান্ত প্রয়োজন। তাই ইংলণ্ড ফ্রান্সকে বিতাড়িত করে একাই মিশরের উপর প্রভুত্ব বিস্তারে অগ্রণী হল। দীর্ঘ দিনের বিরোধের পরে শেষ পর্যন্ত ইংলণ্ড ফ্রান্সকে মিশর থেকে বিতাড়িত করতে সক্ষম হয়েছিল।

মিশরে ইঙ্গ-ফরাসী আধিপত্য

মিশর কাগজে-কলমে তুরস্ক সাম্রাজ্যের অংশ বলে অভিহিত হতে লাগল। প্রকৃতপক্ষে ব্রিটেনের অঙ্গুলি হেলনে মিশরের খেদিভ (মিশরের শাসনকর্তাকে খেদিভ বলা হত) চলতে বাধ্য হলেন। মিশরে ব্রিটেনের এই আধিপত্য স্বাধীনতাকামী মিশর-বাসীদের কাছে অসহ্য হয়ে উঠতে লাগল। ক্রমে **আরাবি পাশা** নামক জনৈক গরীব বংশসম্ভূত সৈনিকের নেতৃত্বে মিশর বিদ্রোহ ঘোষণা করল (১৮৮২ খ্রীঃ)। আরাবি পাশা মিশরবাসীদের মনে জাতীয়তাবোধ জাগিয়ে তুললেন। তিনি ঘোষণা করলেন—'মিশর মিশরবাসীদের জন্য।' ইংলণ্ড এই বিদ্রোহ দমনের নামে মিশরে ব্রিটিশ সৈন্য মোতায়েন করল এবং এই ব্রিটিশ সৈন্যের আধিপত্য থেকে মিশর আর মুক্তি পেল না। এইভাবেই আরম্ভ হয়েছিল মিশরের উপর ব্রিটেনের প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক আধিপত্য। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটেন সরাসরি মিশরকে 'রক্ষিত রাজ্য' বলে ঘোষণা করেছিল।

মিশরের স্বাধীনতা আন্দোলন: আরাবি পাশার বিদ্রোহ

মিশর দখল করার পর ব্রিটেন মিশরের নিকটস্থ সুদান দখল করে নিল। সুদানে একটি বিদ্রোহ দমনের নামে ব্রিটেন সৈন্য পাঠাল। কিন্তু ব্রিটেনের সেনাপতি গর্ডন বিদ্রোহীদের হাতে নিহত হন। তখন ব্রিটেন কিচেনার নামে এক সেনাপতির নেতৃত্বে আরও সেনাবাহিনী পাঠিয়ে এই বিদ্রোহ দমন করে এবং এই সুযোগে সুদানের উপর নিজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে নেয় (১৯০০ খ্রীঃ)। সুদানের এই বিদ্রোহ 'মাহ্‌দি বিদ্রোহ' নামে পরিচিত।

সুদানে মাহ্‌দি বিদ্রোহ

বুয়ার বিদ্রোহ
(The Boer Revolt)

শুধু মিশর ও সুদানেই ব্রিটেনকে বিদ্রোহের সম্মুখীন হতে হয় নাই, দক্ষিণ আফ্রিকাতেও ব্রিটেনকে একটি বড় রকমের বিদ্রোহের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এইটি 'বুয়ার বিদ্রোহ' বলে প্রসিদ্ধ।

কেপ কলোনি দখলের কথা আগেই বলেছি। নেপোলিয়নীয় যুদ্ধের সময়ে ইংলণ্ড এই কেপ কলোনি ওলন্দাজদের অধিকার থেকে কেড়ে নিয়েছিল। ইংলণ্ড এই দ্বীপটি কেড়ে নেওয়ার পরে এখানে ইংরেজ ঔপনিবেশিকরা গিয়ে বাস করতে থাকে। কিন্তু পুরানো ওলন্দাজ ঔপনিবেশিকরাও এখানে থেকে গিয়েছিল। প্রায় ৩০ হাজার ওলন্দাজ অধিবাসী এখানে বাস করত এবং তারা ছিল অধিকাংশই কৃষক। এই ওলন্দাজ কৃষকদের বলা হত 'বুয়ার' (বুয়ার কথাটার অর্থ হল কৃষক)। ইংরেজ অধিবাসীদের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে ওলন্দাজ কৃষকেরা আরও উত্তরে চলে যায় এবং সেখানে অরেঞ্জ ফ্রি স্টেট ও ট্রান্সভাল নামে দুটি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। ব্রিটেন প্রথমে অরেঞ্জ ফ্রি স্টেট দখল করে নিতে অগ্রসর হয়। কিন্তু ওলন্দাজ কৃষকদের আন্দোলনের ফলে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে তাকে অরেঞ্জ ফ্রি স্টেটকে স্বাধীন রাস্ট্র হিসাবে স্বীকার করে নিতে হয়। প্রায় পঁচিশ বছর পরে ব্রিটেন ট্রান্সভাল প্রজাতন্ত্র দখল করতে অগ্রসর হয়। কিন্তু ট্রান্সভালের কৃষকদের কাছেও বৃটেনকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে বুয়ার প্রজাতন্ত্রের এলাকায় স্বর্ণখনি আবিষ্কৃত হয়। ফলে, দলে দলে ইংরেজ ঔপনিবেশিকরা বুয়ার অঞ্চলে গিয়ে ভিড় করে। ইংরেজ অধিবাসীদের অত্যাচারে উৎপীড়িত বুয়ারেরা নিজ দেশ থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত করতে সংঘবদ্ধ হয়। ইংরেজ সরকার ঔপনিবেশিকদের পক্ষ অবলম্বন করে। ফলে বুয়ারদের সঙ্গে ইংলণ্ডের যুদ্ধ বাধে। এইটিই 'বুয়ার যুদ্ধ' (১৮৮৯-১৯০২) নামে পরিচিত।

অরেঞ্জ ফ্রি স্টেট

বুয়ার যুদ্ধ

এই যুদ্ধের সময় ইংলণ্ডের প্রতিদ্বন্দ্বী জার্মানী বুয়ারদের সমর্থন জানিয়েছিল। বুয়ারেরা ইংলণ্ডের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হল বটে (১৯০২), কিন্তু ইংলণ্ড বুঝল স্বাধীনতাকামী বুয়ারদের দমন করে রাখা কঠিন। তাই ১৯০৯ খ্রীঃ সমগ্র দক্ষিণ আফ্রিকা নিয়ে ব্রিটেন

একটি সংযুক্ত রাষ্ট্র গঠন করল এবং বুয়ারদের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দিল।

কাজেই দেখা যায় এশিয়ার মত আফ্রিকাতেও ব্রিটেনকে প্রথম থেকেই স্বাধীনতা আন্দোলনের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তবে স্বাধীনতা আন্দোলনের শক্তি তখনও দুর্বল থাকায় শেষ পর্যন্ত আফ্রিকাতে সাম্রাজ্যবাদীদেরই সেই সময়ে জয় হয়েছিল।

[২]

চীন ও জাপানের নবজাগরণ

(The Awakening of China & Japan)

চীন ও জাপান বর্তমান এশিয়ার দুটি প্রধান দেশ। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ পর্যন্ত বহির্বিশ্বের সঙ্গে এই দুটি দেশের কোন সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু তারা না চাইলেও ক্রমশ এই দুটি দেশের দরজায় গিয়ে উপস্থিত হল ইওরোপের কয়েকটি রাষ্ট্র। ইংলণ্ড উন্মুক্ত করল চীনের দরজা, আর আমেরিকা জাপানের।

চীনে ইওরোপীয় অনুপ্রবেশ : ১৮৪০-৬৫

(European Penetration into China : 1840-65)

চীনে ইংলণ্ডের আফিমের ব্যবসা

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইংলণ্ড বাণিজ্যের নেশায় চীনের উপকূলে এসে হানা দেয়। এই সময়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারত থেকে চীনে প্রচুর আফিম চালান দিত। চীন সরকার ইংলণ্ডকে এই আফিমের ব্যবসা চালাতে দিতে স্বীকৃত হল না। আফিম সেবনের ফলে চীনের জনসাধারণের কর্মক্ষমতা লোপ পাচ্ছিল। তাই চীনের রাজা এই কুপ্রথা বন্ধ করার জন্য আফিম আমদানি নিষিদ্ধ করে আইন প্রবর্তন করলেন। অর্থলোলুপ ইংরেজ বণিকেরা স্থানীয় চীনা কর্মচারীদের ঘুষ দিয়ে অন্যায়ভাবে আফিম চালান দিতে লাগল। চীন সরকার এই অন্যায় ব্যবসার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালে দুই পক্ষে বিরোধ বাধল। ইংরেজরা যুদ্ধজাহাজ থেকে কামানের গোলা বর্ষণ করে এই বে-আইনী বাণিজ্যের অধিকার শক্তির জোরে প্রতিষ্ঠিত

করতে চাইল। ফলে দুই পক্ষে যুদ্ধ বাধল (১৮৪০ খ্রীঃ)। আফিম নিয়ে এই যুদ্ধ বেধেছিল বলে এই যুদ্ধটি **প্রথম অহিফেন যুদ্ধ** (First Opium War) নামে পরিচিত। মধ্যযুগীয় অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত চীন আধুনিক অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত ইংলণ্ডের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হল। যুদ্ধের অবসানে দুই দেশের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হল।

প্রথম অহিফেন যুদ্ধ

নানকিং-এর সন্ধিতে (১৮৪২ খ্রীঃ) স্থির হল—(১) চীন ইংলণ্ডকে হংকং ছেড়ে দেবে। তাছাড়া, চীন ইংলণ্ডের জন্য ক্যাণ্টন সমেত আরো পাঁচটি বন্দরের দরজা উন্মুক্ত করবে। এই বন্দরে বসবাসকালে ব্রিটিশ নাগরিকেরা বিশেষ সুবিধাভোগের প্রতিশ্রুতি পেল।

নানকিং-এর সন্ধি

চীনে ইংলণ্ডের এই সাফল্যে ইওরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রগুলি উৎসাহিত হল। প্রথমেই সুযোগ নিতে অগ্রসর হল ফ্রান্স। ফ্রান্স চীনের বাণিজ্যে অংশগ্রহণের নামে চীন-বিরোধী আক্রমণাত্মক কাজকর্মে লিপ্ত হল। চীন-বিরোধী এই সমস্ত কাজে ফ্রান্স ও ইংলণ্ড হাত মিলিয়ে চলল। ক্রমশ এই আক্রমণাত্মক কাজকর্ম নিয়ে চীনের সম্রাটের সঙ্গে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের প্রচণ্ড বিরোধ বাধল। এই বিরোধ থেকে আরম্ভ হল **দ্বিতীয় অহিফেন যুদ্ধ** (Second Opium War, ১৮৫৭-৫৮)। এই যুদ্ধে চীনকে আবার পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল। **তিয়েনসিনের সন্ধিতে** (১৮৫৮ খ্রীঃ) আরও এগারোটি বন্দর চীনকে উন্মুক্ত করে দিতে হল।

দ্বিতীয় অহিফেন যুদ্ধ ও তিয়েনসিনের সন্ধি

প্রথম ও দ্বিতীয় অহিফেন যুদ্ধ থেকে প্রমাণিত হল যে চীন অত্যন্ত দুর্বল রাষ্ট্র। এই যুদ্ধ কাজে কাজেই বিদেশী রাষ্ট্রগুলিকে চীন আক্রমণে আরও উৎসাহিত করল। এই দুর্বলতার সুযোগ পেয়ে আমেরিকাও চীনের কাছ থেকে একটি বিশেষ সুবিধা আদায় করল। পরে অবশ্য তা বিদেশী রাষ্ট্রমাত্রেই আদায় করেছিল। এইটি **এক্স্ট্রাটেরি-টোরিয়াল রাইট্স** (Extra territorial rights) নামে পরিচিত। এই অধিকার অনুযায়ী স্থির হল—ইওরোপীয় অধিবাসীদের যারা চীনে বাস করবে তাদের উপর চীনের আইন কার্যকরী হবে না, তারা হবে নিজ নিজ দেশের আইনের কর্তৃত্বাধীন। চীনে বাস করব, কিন্তু চীনের আইন মানবো না—এইরকমের আবদার করল ইওরোপের রাষ্ট্রগুলি ; আর শক্তিহীন চীনকে তাদের এই দাবিই মেনে নিতে হল।

এক্স্টাটেরিটোরিয়াল রাইট্স

এইভাবে চীন যখন পশ্চিমী শক্তিগুলির কাছে আত্মসমর্পণ করতে লাগল, তখন চীনদেশের জনসাধারণের মনে দারুণ বিক্ষোভ জমা হতে লাগল। জনসাধারণ দেখল যে চীনের এই অবমাননাকর পরিস্থিতির জন্য দায়ী পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলি আর তাদের নিজ দেশের রাজশক্তি—যার দুর্বলতার সুযোগে পশ্চিমীরা এত সুবিধা আদায় করতে পেরেছিল।

মাঞ্চু রাজাদের দুর্বলতা

চীনে এই সময়ে রাজত্ব করত মাঞ্চু রাজারা। তাঁরা ছিলেন স্বৈরাচারী। তাঁদের সঙ্গে জনসাধারণের কোন যোগাযোগ ছিল না। চীনের অধিকাংশ লোক অর্থাৎ সমগ্র কৃষকসমাজ অত্যন্ত দুঃখের মধ্যে জীবনযাপন করত।

বিদেশীদের কাছে মাঞ্চু রাজাদের বারবার আত্মসমর্পণে কৃষকেরা বড় বিক্ষুব্ধ হল। তারা শেষ পর্যন্ত পশ্চিমী আধিপত্য ও মাঞ্চু স্বেচ্ছাতন্ত্রের বিরুদ্ধে একযোগে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। এইটি **তাইপিং বিদ্রোহ** নামে ইতিহাসে পরিচিত। এই বিদ্রোহ আরম্ভ হয় ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে এবং ১৫ বছর ধরে এই বিদ্রোহ চীনে চলেছিল। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা উচিত চীনে যখন জনসাধারণ মাঞ্চু রাজা ও ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল সেই সময়ে (১৮৫৭-৫৯ খ্রীঃ) ভারতেও "সিপাহী বিদ্রোহ" বলে পরিচিত একটি ব্রিটিশ-বিরোধী অভ্যুত্থান দেখা দিয়েছিল। যাই হোক, তাইপিং বিদ্রোহ চীনের পশ্চিমী আধিপত্য ও মাঞ্চু স্বেচ্ছাতন্ত্র উভয়েরই ভিত্তিমূলে আঘাত হানল। বিদ্রোহীরা নিজস্ব সরকার স্থাপন করল। তারা আইন পাস করে চীনের সামন্তপ্রভুদের অন্যায় সুবিধাগুলি কেড়ে নিল। বিদেশী শক্তিগুলিকে মাঞ্চু রাজারা যে বিশেষ 'অধিকারগুলি' দিয়েছিল তারা সেইগুলিকে স্বীকার করল না। সমস্ত চীনে তারা নতুন সমাজের পত্তন করতে চাইল।

তাইপিং বিদ্রোহ

তাইপিং বিদ্রোহের নেতা ছিলেন হুং সিউ চুয়ান। তিনি ছিলেন একজন দরিদ্র শিক্ষক। তাইপিং বিদ্রোহের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে মাঞ্চু রাজারা ভয়ে কাঁপতে লাগল। তারা পশ্চিমের রাষ্ট্রগুলি, বিশেষ করে, আমেরিকা ও ইংলণ্ডের শরণাপন্ন হল। আমেরিকা ও ইংলণ্ডের সাহায্য নিয়ে মাঞ্চু রাজারা বিদ্রোহ দমন করল।

মাঞ্চু রাজবংশ রক্ষা পেল বটে, তবে চীনের দুর্বলতা ও মাঞ্চু রাজাদের অসহায় অবস্থা পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির কাছে আরও পরিষ্কার হয়ে উঠল। এখন

থেকে চীনের উপর আরম্ভ হল পশ্চিমী শক্তিগুলির আরও আক্রমণাত্মক কাজকর্ম।

চীনে যখন এইভাবে পশ্চিমের রাষ্ট্রগুলি নিজ নিজ কর্তৃত্ব স্থাপনে ব্যস্ত, তখন আমেরিকার বিশেষ নজর পড়ল জাপানের দিকে।

জাপানের জাগরণ
(The Awakening in Japan)

মধ্যযুগীয় ব্যবস্থা : মিকাডো

চীনের মত জাপানেরও উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বহির্বিশ্বের সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিল না। সেখানেও সমাজ ও রাষ্ট্র-নীতির ক্ষেত্রে মধ্যযুগীয় ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। জাপানের সম্রাট 'মিকাডো' নামে মাত্র রাজা ছিলেন। দেশের সর্বময় কর্তা ছিলেন সম্রাটের প্রধান মন্ত্রী; তাঁকে শোগুন (Shogun) বলা হত।

শোগুন

শোগুন দেশের সামন্তপ্রভুদের স্বার্থরক্ষা করে চলতেন এবং তাঁদের স্বার্থের অনুকূলে রাষ্ট্র-পরিচালনা করতেন। সামন্তপ্রভুদের স্বার্থরক্ষার জন্য 'সামুরাই' নামক সৈন্যদল সর্বসময়ে প্রস্তুত থাকত।

সামুরাই

এই ধরনের সামন্ত তান্ত্রিক ও সামরিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থার ফলে জাপানের অগ্রগতির পথ একেবারে রুদ্ধ ছিল।

জাপানে আমেরিকার অনুপ্রবেশ

এই রকমের যখন অবস্থা সেই সময়ে ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে **কমোডোর পেরী** নামে একজন আমেরিকাবাসী নাবিক যুদ্ধজাহাজ নিয়ে জাপানের উপকূলে উপস্থিত হলেন। পেরীর আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত রণোপোতগুলি দেখে জাপানীদের মনে ত্রাসের সঞ্চার হল। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে জাপানের দুর্বলতা বুঝে আমেরিকা তার কাছ থেকে কয়েকটি সুবিধা আদায় করে নিল। জাপান আমেরিকার নাবিকদের জন্য দুটি বন্দর ছেড়ে দিতে রাজী হল।

অন্যান্য ইওরোপীয় শক্তি : জাপানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ

আমেরিকার শক্তিবৃদ্ধিতে ইওরোপের অন্যান্য শক্তি ঈর্ষান্বিত হল। তারাও দলে দলে জাপানে আসতে আরম্ভ করল। ক্রমশ চীনের মত জাপানেও পশ্চিমের শক্তিগুলির ঘোর অত্যাচার শুরু হয়ে গেল। এই বিদেশী শক্তিগুলি জাপানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে আরম্ভ করল। বৈদেশিক

বাণিজ্যের নামে তারা অন্যায় সুযোগ দাবি করতে লাগল। জাপানেও তারা আদায় করল সেই বিশেষ সুবিধাটি—যাকে বলা হয় 'এক্‌স্ট্রা-টেরিটোরিয়াল রাইট্‌স'।

এই সমস্ত অত্যাচার ক্রমে জাপানীদের মনে গভীর অসন্তোষ সৃষ্টি করল। জাপানের জনসাধারণ বুঝতে পারল যে, পুরানো সমাজব্যবস্থা অব্যাহত থাকলে ইওরোপীয় শক্তিদের এই দেশ থেকে বিতাড়ন সম্ভব হবে না। তাই তারা পাশ্চাত্যের জ্ঞানবিজ্ঞান, শিল্প-চাতুর্য প্রভৃতি শিক্ষায় মন দিল এবং পাশ্চাত্যের শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে পাশ্চাত্যকে পরাজিত করার সংকল্প গ্রহণ করল।

জাপানে আরম্ভ হল এক **জাতীয় আন্দোলন**। এই আন্দোলনের দুটো দিক ছিল। এক দিকে মধ্যযুগীয় ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করা, আর এক দিকে পশ্চিমের অনুসরণে দেশে শিল্পায়নের ব্যবস্থা করা।

জাপানে জাতীয় আন্দোলন

প্রথম উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দেশীয় সামন্ততন্ত্রের প্রতিভূ শোগুনের ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হল। জাপানের সম্রাট 'মিকাডো'র ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হল। মধ্যযুগীয় 'সামুরাই'দের শক্তি নষ্ট করা হল। এইভাবে মধ্যযুগীয় কুপ্রথার উচ্ছেদ করে দেশে রাষ্ট্রীয় ঐক্যের পথ সুগম করা হল।

মধ্যযুগীয় ব্যবস্থার সংস্কার

আর এক দিকে পাশ্চাত্যকরণের নীতি অনুসৃত হল। ইওরোপের বিভিন্ন রাজধানীতে গিয়ে ঐ সকল দেশের গঠনতন্ত্র, শিল্পপদ্ধতি প্রভৃতি শিখে আসার জন্য জাপানের বহু ছাত্রকে বিদেশে পাঠানো হল। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এই ছাত্রেরা দেশে ফিরে এসে নানা প্রকার সংস্কার প্রবর্তনে অগ্রণী হলেন। জাপানে ইওরোপীয় পদ্ধতিতে গঠনতন্ত্র প্রস্তুত হল। ইওরোপীয় পদ্ধতিতে আইন-ব্যবস্থার সংস্কার করা হল। ইওরোপীয় পদ্ধতিতে জাতীয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হল। সামরিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও ইওরোপীয় পদ্ধতি অনুসরণ করা হল। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত এক সেনাবাহিনীর উদ্ভব হল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, উরোপীয় পদ্ধতি অনুযায়ী জাপানে এই প্রথম যন্ত্র শিল্পের প্রবর্তন হল। তার সঙ্গে রেলপথ, টেলিগ্রাফ, পোষ্ট অফিস, বন্দর প্রভৃতি নির্মাণের ফলে জাপানে এক শিল্প-বিপ্লবের উদ্বোধন হল। ইওরোপের

পাশ্চাত্যকরণ নীতি

কাছে জাপান যে কেবল সামরিক, বৈজ্ঞানিক ও শিল্প সম্বন্ধীয় শিক্ষাই অর্জন করল তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্য বিস্তারের পদ্ধতিও আয়ত্ত করল।

শিল্প বিপ্লবের ফলে ইওরোপীয় দেশগুলির মত জাপানেও কারখানার জন্য কাঁচামালের প্রয়োজন দেখা দিল। তাছাড়া, জাপানে প্রস্তুত প্রচুর পণ্যদ্রব্যের বিরাট বিক্রয়ক্ষেত্রেরও প্রয়োজন দেখা গেল।

জাপানে সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব

জাপানের চোখ পড়ল প্রথম চীনের উপর। কাজেই জাপানে সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভবের ফলে চীনের সামনে নতুন এক বিপদ এসে উপস্থিত হল।

ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলি কর্তৃক চীন-বণ্টন ঃ ১৮৬৫-১৯০০

["Cutting the Chinese Melon"]

মাঞ্চু রাজাদের দুর্বলতার সুযোগে চীনে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা কি ভাবে আক্রমণাত্মক কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছিল সে-কথা আগেই বলেছি। জাপান সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র হিসাবে এখন এই বিদেশী রাষ্ট্রদের সঙ্গে যোগ দিয়ে চীনের উপর জুলুম করতে অগ্রসর হল।

চীন ও ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধ (War between France and China) ঃ এই সময়ে চীনের মাঞ্চু রাজাদের যে বিরাট সাম্রাজ্য ছিল কিংবা মাঞ্চু রাজাদের যে সমস্ত রক্ষিত রাজ্য ছিল সেইগুলি বিদেশী রাষ্ট্রগুলি দখল করে নিতে অগ্রসর হল। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স চীন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ভিয়েৎনাম দখল করতে অগ্রসর হয়। এই নিয়ে চীন ও ফ্রান্সের মধ্যে একটি যুদ্ধ বাধে। এই যুদ্ধে চীন পরাজিত হয় এবং ভিয়েৎনামের উপর চীনের যে আধিপত্য ছিল তা দূরীভূত হয়।

চীন-জাপান যুদ্ধ ঃ ১৮৯৪-৯৫ (Sino-Japanese War) ঃ ফ্রান্সের পরেই জাপান চীনকে আক্রমণ করে। এই আক্রমণের উপলক্ষ ছিল কোরিয়া। কোরিয়ার উপর চীন সম্রাটের আধিপত্য ছিল। জাপান কোরিয়ার উপর চীনের আধিপত্য অস্বীকার করল।

কোরিয়া ছিল জাপানের সন্নিকটবর্তী। কোরিয়া থেকে দূরপাল্লার কামান ছুঁড়লে জাপানের উপকূল পর্যন্ত গুলি পৌঁছতে পারে। জাপান

তাই বলল যে তার 'আত্মরক্ষা'র জন্য কোরিয়া দখল করা প্রয়োজন। রাশিয়া এই সময়ে মাঞ্চুরিয়া দখল করার পরে কোরিয়ার দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করছিল। কাজেই আত্মরক্ষার অজুহাতে জাপান কোরিয়াতে সৈন্য পাঠাল। ফলে চীন ও জাপানের মধ্যে যুদ্ধ বাধল (১৮৯৪-৯৫)। এই যুদ্ধে চীন জাপানের কাছে পরাজিত হল। **সিমনোসেকির সন্ধিতে** (১৮৯৫ খ্রীঃ) কোরিয়ার উপর থেকে চীনের আধিপত্যের অবসান ঘোষণা করা হল। চীন জাপানকে ফরমোসা দ্বীপটি ছেড়ে দিতে বাধ্য হল।

চীন-জাপান যুদ্ধের কারণ

সিমনোসেকির সন্ধি (১৮৯৫)

চীন-জাপান যুদ্ধটি চীনের অসহায় অবস্থাটা আরও স্পষ্ট করে তুলল। এর পর থেকে পশ্চিমের শক্তিগুলি চীনের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে চীনের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে আরও বেশী বেশী হস্তক্ষেপ আরম্ভ করল। এক কথায় বলা চলে, তারা নিজেদের মধ্যে চীনের এক একটি অংশ ভাগ করে নেবার মতলব আঁটল। তাদের কাছে মনে হল—চীন যেন একটি তরমুজ। যার যেমন খুশি এক একটি অংশ কেটে নিলেই হয়!

চীন-জাপান যুদ্ধের ফলাফল: (১) চীনের দুর্বলতা

একদিকে যেমন চীনের দুর্দিন আরম্ভ হল, তেমনি অন্যদিকে প্রাচ্য দেশে একটি নবশক্তির অভ্যুদয় হল। পশ্চিমের শক্তিগুলি বুঝতে আরম্ভ করল যে জাপানকে আর ক্ষুদ্র ও দুর্বল বলে উপেক্ষা করা যায় না। ক্রমে ক্রমে পশ্চিমের শক্তিগুলি জাপানের সঙ্গে সমতার ভিত্তিতে নতুন চুক্তিতে আবদ্ধ হল। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে জাপান ও ইংলণ্ডের মধ্যে সমতার ভিত্তিতে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

(২) জাপানের শক্তিবৃদ্ধি

তাছাড়া, জাপান ও রাশিয়ার মধ্যে এখন থেকে তীব্র রেষারেষি আরম্ভ হল। জাপান চাইল কোরিয়া ও উত্তর চীনে নিজ আধিপত্য বিস্তার করতে। এই অঞ্চলে রাশিয়ার উপস্থিতি তার বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়াল। রুশ-জাপান তিক্ততা শেষ পর্যন্ত ১৯০৪-৫ খ্রীষ্টাব্দে রুশ-জাপান যুদ্ধে পরিণত হয়েছিল।

(৩) রুশ-জাপান যুদ্ধের পরিবেশ সৃষ্টি

চীন বণ্টনের পালা (Partition of China): ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানী চীনের একটি অংশ কিয়াচো দখল করল। নিরুপায় হয়ে চীন

একশত বছরের জন্য কিয়াচো প্রদেশটি জার্মানীকে ইজারা দিল। রাশিয়া অনুরূপভাবে চীনের কাছ থেকে পোর্ট আর্থার ইজারা পেল। ফ্রান্স দক্ষিণ ও মধ্য চীনের কয়েকটি প্রদেশে অর্থনৈতিক অনুপ্রবেশের অধিকার লাভ করল। ইংলণ্ড হংকং ছাড়া চীনের আরও একটি অঞ্চলে (উই হাই-উই) আধিপত্য স্থাপন করল।

আমেরিকার 'দরজা খোল নীতি'

এই সময়ে আমেরিকা ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ দখল করেছিল। এখন প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে আরও প্রভাব বিস্তারের আশায় আমেরিকা দাবি করল যে, চীনের দরজা বিদেশীদের জন্য খুলে দেওয়া হোক (Open Door Policy)। অর্থাৎ আমেরিকা বলতে চাইল—চীন অন্যদের জন্য দরজা খুলে দিয়েছে, আমার জন্যও দরজা খুলে দিক। এইভাবে বৃহৎ শক্তিগুলি একে একে নিজেদের মধ্যে চীন-বণ্টনের জন্য অগ্রসর হল।

বক্সার বিদ্রোহ (Boxer Rising) : ঠিক এই সময়ে চীনের এই ঘোর জাতীয় বিপর্যয় জাতির মনে দারুণ বিক্ষোভ জাগিয়ে তুলল। বিদেশী-দের কবল থেকে চীনকে মুক্ত করার জন্য এই সময়ে এক বিরাট গণ-আন্দোলন আরম্ভ হয়। এই আন্দোলনটি **বক্সার বিদ্রোহ** (১৮৯৯-১৯০১) বলে পরিচিত।

এই বিদ্রোহটির মূল লক্ষ্য ছিল চীনের মাটি থেকে বিদেশীদের কর্তৃত্ব উৎখাত করা। ই-হো-টুযান বা শরীরচর্চামূলক একটি গুপ্ত সমিতি (এইজন্য এটিকে বক্সার বিদ্রোহ বলা হয়) ছিল এই আন্দোলনের সংগঠক। এই আন্দোলনের নেতারা সুষ্ঠু কর্মপন্থা উপস্থিত করতে পারেন নাই। বিদেশীদের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসাই এই বিদ্রোহের ছিল মূল চালক শক্তি। এই বিদ্রোহের মুখে জনসাধারণ বিদেশীদের আবাসস্থলগুলি আক্রমণ করল এবং বহু ইওরোপীয়কে হত্যা করল। জাপান, রাশিয়া, জার্মানী, ফ্রান্স, ব্রিটেন ও আমেরিকা মিলিত হয়ে একযোগে একটি সৈন্যবাহিনী নিয়োগ করে এই বিদ্রোহ দমন করল। বক্সার বিদ্রোহ দমনের ফলে চীনে বিদেশীদের কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ থাকল। তবে বৃহত্তর বিদ্রোহের ভয়ে বিদেশীরা চীন-বণ্টনে অধিকতর অগ্রসর হতে আর সাহস পেল না।

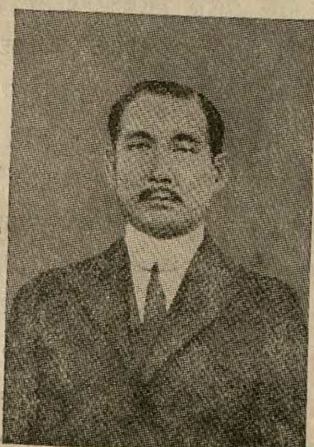
চীনে জাতীয় বিপ্লব
[The Nationalist Revolution in China]

এইভাবে চীনের উপর দিয়ে একটার পর একটা ঝড় বয়ে যেতে লাগল। ১৮৯৪-৯৫ খ্রীষ্টাব্দে জাপানের কাছে চীনের পরাজয়ের পর থেকে একদল লোক চীনের নবজাগরণের সম্ভাব্য পথ নিয়ে ভাবতে আরম্ভ করল। তাইপিং বিদ্রোহ ও বক্সার বিদ্রোহের ব্যর্থতা চীনকে এই নবজাগরণের জন্য নতুন পথের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আরও ভাবিয়ে তুলল।

চীনে জাতীয় জাগরণ

ক্রমশ চীনের সমাজে পরিবর্তন অনুভূত হল। উনবিংশ শতাব্দী থেকে চীনে কিছুটা শিল্পের প্রসার হওয়ায় শিল্পপতি শ্রেণী, মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও শ্রমিক শ্রেণীর আবির্ভাব হয়েছিল। নতুন শ্রেণীগুলি নতুনভাবে চিন্তা শুরু করল।

ক্রমশ পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নেতৃত্বে চীনে একটি জাতীয় নবজাগরণের আন্দোলন আরম্ভ হল। এই আন্দোলনের মধ্যে আবার দুটি ধারা ছিল। একদল ছিল নরমপন্থী, সংস্কারবাদী। তারা মাঞ্চু বংশ ধ্বংস না করে মাঞ্চু রাজতন্ত্রকে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে পরিণত করতে পারলেই খুশী হত। আর একটি দল ছিল চরমপন্থী, বিপ্লববাদী। তারা মাঞ্চু রাজবংশ ধ্বংস করে চীনে একটি বিদেশী কর্তৃত্বমুক্ত আধুনিক প্রজাতন্ত্র গড়ে তুলতে চাইল।



ডক্টর সান ইয়াৎ সেন

ডক্টর সান ইয়াৎ-সেন

এই বিপ্লববাদী আন্দোলনের প্রভাব ছিল খুব বেশী। এই আন্দোলনের প্রধান নেতা ছিলেন **ডক্টর সান ইয়াৎ-সেন।**

ডক্টর সান ইয়াৎ-সেন ছিলেন পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত। পশ্চিমের গণতান্ত্রিক বিপ্লবের আদর্শের প্রতি তাঁর ছিল গভীর নিষ্ঠা। তিনি 'চীনকে জাগিয়ে তোল' (Revive China) এই নামে একটি সমিতি গঠন করলেন। এইসমিতি চীনের জনসাধারণের কাছে সর্বপ্রথম একটি আধুনিক কর্মসূচী

উপস্থিত করল। সান ইয়াৎ-সেনের কর্মসূচীতে তিনটি বিষয় প্রধান স্থান লাভ করেছিল। এই তিনটি হল—(১) চীনকে বিদেশীর কবল থেকে মুক্ত করতে হবে, (২) চীন থেকে মাঞ্চু রাজাদের বিতাড়িত করে চীনে স্বাধীন প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে, (৩) চীনের জনগণের জন্য জীবিকার সংস্থান করতে হবে। এইগুলি সান ইয়াৎ-সেনের **তিন নীতি** (Three Principles) নামে ইতিহাসে বিখ্যাত।

সান ইয়াৎ-সেনের তিন নীতি'

সান ইয়াৎ-সেনের নেতৃত্বে এই তিনটি প্রধান দাবিতে বিরাট এক জাতীয় আন্দোলন গড়ে উঠল। চীনের জনসাধারণ ১৯০৪ খ্রীঃ আমেরিকার পণ্য বয়কটের আন্দোলন আরম্ভ করল। মনে রাখা দরকার, বাংলা বিভাগের প্রতিবাদে এই সময়ে বাংলা দেশের জনসাধারণও বিলাতী কাপড় বয়কট করেছিল। ১৯০৬ খ্রীঃ চীনে কয়লার খনির শ্রমিক ও কৃষকেরা একযোগে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। হাঙ্কাওতে সৈন্যবাহিনী বিদ্রোহ করল। কোয়ানটুং প্রদেশে কৃষকেরা ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলন আরম্ভ করল। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এই বিদ্রোহ দক্ষিণ থেকে ছড়িয়ে পড়ল চীনের প্রায় প্রত্যেকটি অঞ্চলে। এই বিদ্রোহের মুখে শেষে ১৯১২ খ্রীঃ ১লা জানুয়ারী সান ইয়াৎ-সেনের নেতৃত্বে নানকিং-এ চীনের প্রথম প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল। **ডক্টর সান ইয়াৎ-সেন** হলেন এই প্রজাতন্ত্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি।

চীনে জাতীয় বিপ্লব

প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা

কিন্তু জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে যাঁরা সংস্কারপন্থী ছিলেন, তাঁরা সান ইয়াৎ-সেনের প্রজাতন্ত্রকে সারা চীনের প্রতিনিধিস্থানীয় বলে মানতে চাইলেন না। ডক্টর সান ইয়াৎ-সেনের সঙ্গে তাঁদের আলোচনা চলল। এই আলাপ-আলোচনার ফলে চীন থেকে মাঞ্চু বংশের শাসন উচ্ছেদ করা হল। ডক্টর সান ইয়াৎ-সেন ঐক্য বজায় রাখার জন্য রাষ্ট্রপতি পদ থেকে পদত্যাগ করলেন। ভূতপূর্ব মাঞ্চু রাজাদের একজন অফিসার **ইয়ান সি-কাই** রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হলেন।

ইয়ান সি-কাই

ডক্টর সান ইয়াৎ-সেনের পদত্যাগ চীনের জনগণের পক্ষে শুভ হয় নাই, কেন না ইয়ান সি-কাই রাষ্ট্রপতি হবার পরেই বিশ্বাসঘাতকতা করলেন। তিনি চীনে একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করলেন এবং বিদেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে হাত মিলিয়ে নিজ শাসন অক্ষুণ্ণ রাখতে চাইলেন। ডক্টর সান ইয়াৎ-

সেনকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হল। ইয়ান সি-কাই ১৯১৬ খ্রীঃ মারা গেলেন।

ডক্টর সান ইয়াৎ-সেন ইতিমধ্যে নিজের ভুল বুঝতে পারলেন এবং ইয়ান সি-কাইয়ের মৃত্যুর পরে চীনে ফিরে এলেন। তিনি আবার চীনে গণতান্ত্রিক শাসন ফিরিয়ে আনার জন্য সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করলেন। ১৯২৫ খ্রীঃ তাঁর মৃত্যুর দিন পর্যন্ত সান ইয়াৎ-সেন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন। এইজন্য ডক্টর সান ইয়াৎ-সেনকে চীনের জনগণ 'জাতীয়তাবাদের পিতা' বলে সম্মান করে থাকে।

বৃহৎ শক্তি হিসাবে জাপানের আত্মপ্রতিষ্ঠা
[Rise of Japan as a Great Power]

১৮৯৪-৯৫ খ্রীষ্টাব্দে চীন-জাপানের যুদ্ধে জাপানের জয়লাভের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে।

এশিয়ার রাজনীতি ক্ষেত্রে জাপানের এই অভ্যুদয় সত্যই এক আশ্চর্য ঘটনা। জাপানের শক্তিকে পশ্চিমের রাষ্ট্রগুলির পক্ষেও আর উপেক্ষা করার উপায় থাকল না।

জাপানে অনুপ্রবেশের নীতি পশ্চিমের রাষ্ট্রগুলিকে চিরতরে পরিত্যাগ করতে হল। জাপানে বিদেশী রাষ্ট্রগুলি যে 'একস্ট্রা টেরিটোরিয়াল রাইট্স' উপভোগ করত, এখন অবস্থা বুঝে পশ্চিমের রাষ্ট্রগুলিকে স্বেচ্ছায় সেগুলি প্রত্যাহার করতে হল।

জাপানের সঙ্গে ইংলণ্ডের সন্ধি (Anglo-Japanese Alliance) : ১৯০২ খ্রীঃ জাপানের শক্তিকে স্বীকার করে নিয়ে সমতার ভিত্তিতে জাপানের সঙ্গে ইংলণ্ড সন্ধি স্থাপন করল। সমতার ভিত্তিতে এশিয়ার রাষ্ট্রের সঙ্গে ইওরোপের কোন রাষ্ট্রের সন্ধি এই প্রথম।

অবশ্য জাপানের সঙ্গে এই সন্ধির পিছনে ইংলণ্ডের একটি বিশেষ মতলব ছিল। ইংলণ্ডের এই সময়ে প্রাচ্য দেশে সবচেয়ে বড় শত্রু ছিল রাশিয়া। সেই রাশিয়ার ভারতের সাম্রাজ্যের উপরে দৃষ্টি ছিল। আবার চীন সাম্রাজ্যের উত্তর অংশের দিকেও তার বিশেষ নজর ছিল। ইংলণ্ড ভাবল রাশিয়া চীনে বেশী অগ্রসর হলে তার শক্তি বাড়বে। তাই ইংলণ্ড রাশিয়ার শক্তিহ্রাসের জন্য চঞ্চল হয়ে উঠল।

রুশ-জাপান যুদ্ধ : ১৯০৪—৫ (Russo-Japanese War) : জাপান ও রাশিয়ার মধ্যে বিবাদ দেখা দিয়েছিল মাঞ্চুরিয়া ও কোরিয়া নিয়ে। মাঞ্চুরিয়াতে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হত। এইজন্য মাঞ্চুরিয়াকে বলা হত চীনের শস্যভাণ্ডার। তাছাড়া, মাঞ্চুরিয়ায় ছিল কাঠ ও খনিজ সম্পদের প্রাচুর্য। শিল্পোন্নত জাপানের মাঞ্চুরিয়ার শিল্প-সম্পদের দিকে নজর পড়ল। জাপান চাইল মাঞ্চুরিয়াকে কাঁচামাল সংগ্রহের ক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহার করতে।

যুদ্ধের কারণ

কিন্তু রাশিয়া আগে থেকেই মাঞ্চুরিয়াতে নিজ প্রভাব বিস্তার করেছিল। রাশিয়ার সৈন্যবাহিনী মাঞ্চুরিয়া দখল করেছিল। পোর্ট আর্থারে রাশিয়ার নৌ-বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল এবং মাঞ্চুরিয়া থেকে সাইবেরিয়া পর্যন্ত রাশিয়া একটি রেলপথ খুলেছিল। জাপান এই সমস্ত দেখে বুঝেছিল যে, রাশিয়া সমস্ত উত্তর চীন দখল করতে চায় এবং তার সম্ভাব্য পরিণতি হিসাবে কোরিয়াতেও রাশিয়া অগ্রসর হতে পারে। জাপান বলল—কোরিয়া হল তার বুকে ছোরার মত। রাশিয়া কোরিয়ায় এলে তার নিরাপত্তা হবে বিঘ্নিত। জাপান দাবি করল—রাশিয়াকে মাঞ্চুরিয়া ছেড়ে চলে যেতে হবে। এই নিয়ে জাপান ও রাশিয়ার মধ্যে ক্রমেই তিক্ততা বাড়তে লাগল। শেষে ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে জাপান রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। এইভাবে আরম্ভ হল **রুশ-জাপান যুদ্ধ** (১৯০৪-৫)।

যুদ্ধে দেখা গেল যে, রাশিয়ার নৌ-বাহিনী জাপানের নৌ-বাহিনী থেকে অনেক দুর্বল। 'সুষিমা'র যুদ্ধে জাপান রাশিয়ার নৌ-বাহিনীকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করল। **পোর্টস-মাউথের সন্ধিতে** (১৯০৫) স্থির হল যে, রাশিয়া কোরিয়াকে জাপানের 'প্রভাবাধীন অঞ্চল' বলে স্বীকার করবে। লিয়াটং পেনিনসুলা (আগে রাশিয়া এই অঞ্চলটি ইজারা নিয়েছিল) অঞ্চলের ইজারা পেল এখন জাপান। জাপান ও রাশিয়া উভয়েই মাঞ্চুরিয়া থেকে সরে যাবার প্রতিশ্রুতি দিল।

রাশিয়ার পরাজয় : পোর্টসমাউথের সন্ধি

রুশ-জাপান যুদ্ধের ফলাফল অনেক দিক থেকেই গুরুত্বপূর্ণ।

জাপানের দিক থেকে বিচার করলে এই যুদ্ধটি তার প্রভাব ও প্রতিপত্তি বাড়াবার কাজে সবচেয়ে বেশী সহায়ক হয়েছিল। চীন-জাপান যুদ্ধে

প্রমাণিত হয়েছিল যে, বৃহৎ চীনের থেকে ক্ষুদ্র জাপান শক্তিশালী। রুশ-জাপান যুদ্ধে প্রমাণ হয়ে গেল জাপান শুধু চীন নয়, ইওরোপের অন্যতম প্রধান সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র রাশিয়া অপেক্ষাও শক্তিশালী। এই প্রথম একটি এশীয় শক্তি ইওরোপীয় শক্তিকে পরাজিত করতে সক্ষম হল। জাপান এখন থেকে ইংলণ্ডের সঙ্গে সমকক্ষ হয়ে এশিয়ায় নিজ সাম্রাজ্য বিস্তারে অগ্রসর হল। জাপানী সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভবে এশিয়ায় ইওরোপীয় শক্তিগুলির ভারসাম্য নষ্ট হতে চলল।

রুশ-জাপান যুদ্ধের ফলাফল

জাপানের জয় পরোক্ষভাবে চীন ও এশিয়ার সকল দেশকেই উৎসাহিত করল। জাপানের জয়কে তারা এশিয়ার জয় হিসাবে দেখল এবং এশিয়ার পরাধীন দেশগুলি এই শিক্ষালাভ করল যে তাদের দেশকেও জাপানের মত আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত করতে পারলে পশ্চিমকে তাদের নিজ নিজ দেশ থেকে হটিয়ে দেওয়া সম্ভব। এইজন্য জাপানের এই উন্নতি সমগ্র এশিয়ায় এক নবজাগরণ সৃষ্টি করল।

কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে এশিয়ার দেশগুলির পক্ষে কোন লাভ হল না। কেন না জাপান সাম্রাজ্যবাদের পথ গ্রহণ করল। পশ্চিমের রাষ্ট্রগুলিকে সরিয়ে জাপান দখল করতে চাইল সেই স্থান।

১৯১০ খ্রী জাপান সরাসরি কোরিয়াকে নিজ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নিল।

প্রথম মহাযুদ্ধ ও জাপান (Japan and the First World War) : তারপরেই ১৯১৪ খ্রীঃ প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হল। এই মহাযুদ্ধটিতে জাপান নিজ প্রয়োজন হাসিল করে নিতে সচেষ্ট হল। জাপান ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতির সঙ্গে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। জাপানের উদ্দেশ্য হল যুদ্ধের সুযোগে চীনে নিজ আধিপত্য বিস্তার করা এবং যুদ্ধের পরে সে এশিয়ায় জার্মানীর সাম্রাজ্যটি দখল করল।

এই সময়ে চীনের কর্তৃত্ব ছিল বিশ্বাসঘাতক ইয়ান সি-কাই-এর হাতে। জাপানের অনুগ্রহের উপর ইয়ান সি-কাই-এর কর্তৃত্ব নির্ভরশীল ছিল। তাই জাপান সুযোগ বুঝে ১৯১৫ খ্রীঃ চীনের উপর 'একুশ দফা'র (Twentyone Demands) এক দাবি পেশ করে। চীনকে জাপানের আজ্ঞাবহ একটি ভৃত্যে পরিণত করাই ছিল

একুশ দফা দাবি

এই দাবির সারমর্ম। কিছুদিন টালবাহানা করার পর চীন শেষে এই দাবি মেনে নিল। ফলে, চীন জাপানের অর্ধ-উপনিবেশে পরিণত হল।

জাপানের সাম্রাজ্যবাদী ক্ষুধা ক্রমশ বেড়েই চলল। ভার্সাই সন্ধিতে জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা আরও শক্তিবৃদ্ধির দাবি নিয়ে উপস্থিত হল।

চীনও প্রথম মহাযুদ্ধে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের পক্ষে যোগ দিয়েছিল। ভার্সাই সন্ধির রচয়িতারা আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের কথা ঘোষণা করলেন। চীন এই অধিকার তার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হোক—এই অনুরোধ জানাল।

ভার্সাই সন্ধি ও জাপানের ক্ষমতাবৃদ্ধি

কিন্তু ভার্সাই সন্ধির রচয়িতারা চীনের এই কাতর ক্রন্দনে কান দিল না। তারা সমর্থন জানাল জাপানের সাম্রাজ্য বিস্তারের দাবিতে। তারা জাপানকে জার্মানীর প্রভাবাধীন শানটুং প্রদেশটি দখল করে নেবার অনুমতি দিল।

ফলে, জাপানী সাম্রাজ্যবাদ ভার্সাই সন্ধির পরে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠল। ভার্সাই সন্ধির পরে জাপান বৃহৎ শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করল। সারা এশিয়া থেকে ইওরোপীয়দের বিতাড়িত করে নিজ সাম্রাজ্য বিস্তারের সুখ-স্বপ্নে জাপান বিভোর হয়ে উঠল।

নবম অধ্যায়

আমেরিকার ইতিহাস

[History of the United States of America]

আমেরিকার গঠনতন্ত্র

[The American Constitution]

কিভাবে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের ভিতর দিয়ে ১৭৭৬-৭৯ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা স্বাধীনতা অর্জন করেছিল তা আগে বলা হয়েছে।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র : প্রজাতান্ত্রিক শাসন-পদ্ধতি

স্বাধীনতালাভের পর তেরোটি উপনিবেশ মিলিত হয়ে একটি যুক্তরাষ্ট্র (Union) গঠন করল। এই সম্মিলিত রাষ্ট্রটিই **আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র** বলে পরিচিত। ইংলণ্ডের রাজার অধীন থাকাকালে রাজার শাসন সম্বন্ধে আমেরিকাবাসীর মনে এক তিক্ত ধারণা জন্মেছিল। এই জন্য নবগঠিত রাষ্ট্রে কোন রাজা থাকল না। জনসাধারণের প্রতিনিধিদের দ্বারা শাসনের ব্যবস্থা প্রচলিত হল। এইভাবে আমেরিকায় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শাসিত একটি যুক্তরাষ্ট্রের প্রবর্তন হল।

যুক্তরাষ্ট্রের গঠনতন্ত্রে বৈশিষ্ট

যুক্তরাষ্ট্রের শাসনের জন্য একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গঠনতন্ত্রও রচিত হল। আমেরিকার বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভিন্ন ভাষাভাষী লোক বাস করত। যেখানে ইংরেজ ঔপনিবেশিকরা বাস করত সেখানে ইংরেজী ভাষা প্রচলিত ছিল। ফরাসী ঔপনিবেশিকরা ফরাসী ভাষায় কথা বলত। তাছাড়া, অনেক অঞ্চলে স্পেনীয় ভাষারও প্রচলন ছিল। কাজেই আমেরিকা দেশটা ছিল বহু বৈচিত্রে ভরা। প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের (State) এই বৈচিত্র্য ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য একটা তাগিদ দেখা গেল। তাই বহু ভাষাভাষী এই যুক্তরাষ্ট্রটির জন্য একটি নতুন গঠনতন্ত্র তৈরী হল। এই যুক্তরাষ্ট্রটি হল আটচল্লিশটি রাষ্ট্রের সমষ্টি। প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের নিজস্ব আইনসভা থাকল। এই আইনসভায় প্রতিটি রাষ্ট্রের উপযোগী নিজস্ব আইন তৈরী হত। অর্থাৎ প্রত্যেকটি রাষ্ট্রই আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা ভোগ করত। আবার এই রাষ্ট্রগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন

ছিল না। সব কয়টি রাষ্ট্র মিলিত হয়ে একটি কেন্দ্রীয় শাসন স্বীকার করে নিল। একটি সবল শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসনের নেতৃত্বে প্রতিটি রাষ্ট্রের স্বাতন্ত্র্য বিধান—এই গঠনতন্ত্রটির প্রধান বৈশিষ্ট্য।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র (১৭৮৯-১৮৫০)

[The United States of America : 1789-1850]

নবগঠিত আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি হলেন **জর্জ ওয়াশিংটন** (George Washington, ১৭৮৯-৯৭)। ওয়াশিংটন আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধে ছিলেন সর্বাগ্রগণ্য নেতা। তিনি 'দেশের পিতা' ('Father of his Country') বলে পরিচিত ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন প্ল্যাণ্টার ; রাষ্ট্রগত জীবনে তিনি ছিলেন কেন্দ্রীয়করণের পক্ষপাতী। তাঁর গঠনমূলক ক্ষমতা খুব বেশী ছিল না। এই বিষয়ে তাঁর দক্ষিণহস্ত-স্বরূপ ছিলেন **আলেকজাণ্ডার হ্যামিলটন** (Alexander Hamilton)। হ্যামিলটন বলতেন—আর্থিক ও অর্থনৈতিক প্রশ্নের আশু সমাধানই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উন্নতির একমাত্র উপায়। এই দিক থেকে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক জীবনে স্থায়িত্ব আনয়নে অগ্রণী হয়েছিলেন। তিনিও ওয়াশিংটনের মত রাষ্ট্রের স্বাধিকার খর্ব করে কেন্দ্রীয়করণের অধিক পক্ষপাতী ছিলেন।

জর্জ ওয়াশিংটন রাষ্ট্রপতি (১৭৮৯-৯৭)

কিন্তু জর্জ ওয়াশিংটন ও আলেকজাণ্ডার হ্যামিলটন অনুসৃত কেন্দ্রীয়করণ নীতির বিরোধিতা করলেন একজন বিশিষ্ট নেতা। তাঁর নাম **টমাস জেফারসন** (Thomas Jefferson)। টমাস জেফারসন ছিলেন রাষ্ট্রের স্বাধিকার অক্ষুণ্ণ রাখার পক্ষপাতী। এই মতবিরোধ থেকে শেষ পর্যন্ত দুটি মত ও দুটি দলের উদ্ভব হল—একটি : ফেডারেলিস্ট (Federalists), অপরটি রিপাবলিকান ডেমোক্রাট (Republican Democrats)। যাঁরা যুক্তরাষ্ট্রের ঐক্যের উপর অত্যধিক জোর দিলেন তাঁদের ফেডারেলিস্ট বলা হত ; আর যাঁরা প্রতিটি রাষ্ট্রের স্বাতন্ত্র্যরক্ষার উপর জোর দিলেন তাঁদের বলা হত রিপাবলিকান-ডেমোক্রাট। আলেকজাণ্ডার হ্যামিলটন হলেন

আলেকজাণ্ডার হ্যামিলটন ও ফেডারেলিস্ট দল

টমাস জেফারসন ও রিপাবলিকান-ডেমোক্রাট দল

ফেডারেলিস্ট দলের নেতা। আর টমাস জেফারসন হলেন রিপাবলিকান-ডেমোক্রাট দলের নেতা।

তাছাড়া, আরও একটি প্রশ্ন নিয়ে ফেডারেলিস্ট ও ডেমোক্রাটদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল। প্রশ্নটি হল; ফরাসী বিপ্লব ও নেপোলিয়ন সম্পর্কে আমেরিকার কি দৃষ্টিভঙ্গী হওয়া উচিত? ফেডারেলিস্টরা ফরাসী বিপ্লব বা নেপোলিয়নের বিপ্লবী চিন্তাধারার সমর্থক ছিল না। ইংলণ্ডের রক্ষণশীলদের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে তাদের দৃষ্টিভঙ্গীর মিল ছিল। অপর পক্ষে, ডেমোক্রাটরা, বিশেষ করে টমাস জেফারসন ফরাসী বিপ্লবের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন।

১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে জর্জ ওয়াশিংটন রাষ্ট্রপতির পদ থেকে পদত্যাগ করলে ফেডারেলিস্ট নেতা **জন এ্যাডমস্** (John Adams) রাষ্ট্রপতির পদে নির্বাচিত হলেন। তাঁর সময়ে ফ্রান্স-বিরোধী নীতির চরম অভিব্যক্তি দেখা গেল। ফরাসী আক্রমণের ভয় দেখিয়ে তিনি আমেরিকাবাসীর গণতান্ত্রিক অধিকার সংকোচন করলেন, সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করলেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধি করলেন।

জন এ্যাডমস্ (রাষ্ট্রপতি ১৭৯৭-১৮০১)

এর ফলে আমেরিকায় গণতন্ত্রবাদীদের মধ্যে দারুণ উত্তেজনা দেখা দিল। ফেডারেলিস্টদের রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে দেশজোড়া আন্দোলন আরম্ভ হল।

এই আন্দোলনের অবিসংবাদী নেতা ছিলেন **জেফারসন**। আমেরিকায় গণতন্ত্রের সৌধ রচনার কাজে যে দুজন জীবন-মন উৎসর্গ করেছিলেন তাঁরা ছিলেন জেফারসন ও আব্রাহাম লিঙ্কন। জেফারসন ছিলেন 'আমেরিকার স্বাধীনতা সনদের' রচয়িতা। ফেডারলিস্ট-রক্ষণশীলদের আক্রমণ থেকে তিনিই গণতন্ত্রকে রক্ষা করেন। তিনি জন এ্যাডমসের পরে আমেরিকার রাষ্ট্রক্ষমতা অধিকার করেন। তাঁর সময়ে আমেরিকা ইংলণ্ডের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব গ্রহণ করেছিল।

টমাস জেফারসন (রাষ্ট্রপতি, ১৮০১-৯)

আমেরিকা ও ইংলণ্ডের মধ্যে এই সময়ে দারুণ মনোমালিন্যের কারণ ঘটেছিল। নেপোলিয়নের আমলে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে পরস্পর বাণিজ্য ধ্বংস করে দেবার জন্য খুব রেষারেষি চলেছিল। এই রেষারেষির ফলে

নিরপেক্ষ দেশগুলির নিরাপত্তা প্রায়ই বিঘ্নিত হত। ইংলণ্ডের নৌবাহিনী আমেরিকার জাহাজ আটক করে তা তল্লাসী করতে লাগল। এতে আমেরিকাবাসীরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হল। আমেরিকা ও ইংলণ্ডের মধ্যে ক্রমে ক্রমে তিক্ততা চরমে উঠল।

ইংলণ্ড ও আমেরিকার মধ্যে যুদ্ধ (১৮১২-১৪)

১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে **জেমস ম্যাডিসন** (James Maddison) যখন আমেরিকার রাষ্ট্রপতি তখন ইংলণ্ড ও আমেরিকার মধ্যে একটি যুদ্ধ বাধল। ইংলণ্ড আমেরিকার রাজধানী ওয়াশিংটন নগর আক্রমণ করল এবং পুড়িয়ে দিল। আমেরিকাবাসীদের মধ্যে নতুন করে দেশপ্রেমের প্রেরণা জাগল। শেষ পর্যন্ত আমেরিকাবাসীরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে ইংলণ্ডকে পরাজিত করতে সক্ষম হয়েছিল।

জেফারসনের অব্যবহিত পরে খ্যাতনামা রাষ্ট্রপতিদের মধ্যে প্রধান ছিলেন **এ্যাণ্ডরু জ্যাকসন** (Andrew Jackson)। জ্যাকসনকে গণতন্ত্রবাদীরা সমর্থন জানাল। জ্যাকসন ছিলেন সৈনিক এবং পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসী। তিনি দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির দিকে নজর দিলেন। তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল—দেশের মধ্যে বিভেদমূলক শক্তিগুলিকে খর্ব করে দেশের ঐক্য অক্ষুণ্ণ রাখা।

এ্যাণ্ডরু জ্যাকসন (রাষ্ট্রপতি, ১৮২৯-৩৭)

মোট কথা জর্জ ওয়াশিংটন, টমাস জেফারসন, এ্যাণ্ডরু জ্যাকসন—এঁদের চেষ্টায় আমেরিকা একটি উন্নতিশীল রাষ্ট্রে উন্নীত হয়েছিল। অবশ্য, এর জন্য আমেরিকাকে মূল্য কম দিতে হয় নি। আগেই বলেছি, ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড ও আমেরিকার মধ্যে একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। এই যুদ্ধে জয়লাভের পর থেকে আমেরিকার উন্নতির দরজা খুলে যায়।

এই যুদ্ধের পর থেকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সীমানা ক্রমশ বর্ধিত হতে থাকে। এই যুদ্ধের আগেই আমেরিকা ফ্রান্সের কাছ থেকে **লুসিয়ানা** উপনিবেশটি কিনে নিয়েছিল। এই যুদ্ধের পরে আমেরিকা স্পেনের কাছ থেকে **ফ্লোরিডা** নামে আর একটি উপনিবেশ কিনে নেয়। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে মেক্সিকোর সঙ্গে যুদ্ধ করে আমেরিকা **ক্যালিফোর্নিয়া** দখল করে।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সীমানা বৃদ্ধি

এইভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র কি

আয়তনে, কি লোকসংখ্যায় ক্রমশ বড় হতে থাকে। স্বাধীনতা লাভের সময়ে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের লোকসংখ্যা ছিল চল্লিশ লক্ষেরও কম। এখন সেখানে হল বার কোটি পঞ্চাশ লক্ষ লোকের বাস। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমের বিস্তীর্ণ অঞ্চলেও বসতি স্থাপিত হল এবং ক্রমে ক্রমে ৩৫টি নতুন রাষ্ট্র গড়ে উঠল। এই সকল অঞ্চল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে মিলিত হওয়ায় এই সম্মিলিত রাষ্ট্রটির সীমানা প্রশান্ত মহাসাগরের তটভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত হল।

আমেরিকার গৃহযুদ্ধ ও এব্রাহাম লিংকন
[The American Civil War & Abraham Lincoln]

গৃহযুদ্ধের কারণ (Causes of the Civil War): যে রাষ্ট্রগুলিকে নিয়ে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র গড়ে উঠল সেগুলি অর্থনৈতিক বিকাশের দিক থেকে এক রকমের ছিল না। উত্তর অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলি ছিল শিল্প-প্রধান, আর দক্ষিণ অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলি ছিল কৃষিপ্রধান। উত্তর অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলিতে যন্ত্রচালিত শিল্পের প্রাধান্যের ফলে দাসপ্রথার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু দক্ষিণের বাগিচা ও খামারের কাজে দাস-শ্রমের প্রচলন থাকায় এই অঞ্চলের অধিবাসীরা দাসপ্রথা অপরিহার্য বলে মনে করত। ফলে, দুটি অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে অর্থনৈতিক স্বার্থ নিয়ে বিরোধ উপস্থিত হল।

আমেরিকার অর্থনৈতিক অবস্থা : উত্তর অঞ্চল শিল্পপ্রধান : দক্ষিণ অঞ্চল কৃষিপ্রধান

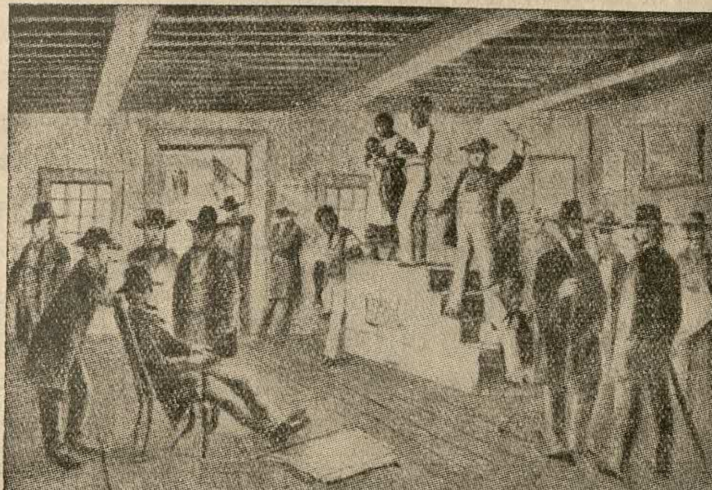
কিছুদিন পরে পশ্চিম অঞ্চলে বসতি স্থাপিত হলে সেখানে দাসপ্রথার প্রচলন সংগত কিনা এই নিয়ে উত্তরাঞ্চলের কারখানার মালিকদের সঙ্গে দক্ষিণাঞ্চলের দাস-মালিকদের বিরোধ আরও তীব্র হয়ে উঠল। উত্তর অঞ্চলের লোকেরা মনে করত দাসপ্রথা হল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের একটি কলঙ্ক। দক্ষিণের বাগিচার মালিকেরা আফ্রিকা থেকে হাজারে হাজারে নিগ্রো ক্রীতদাসদের কিনত এবং তাদের দ্বারা বাগিচার কাজ চালাত। এই ক্রীতদাসদের উপর তারা অমানুষিক ব্যবহার করত। ক্রমশ দাসপ্রথার বিলোপের দাবিতে আমেরিকায় একটি আন্দোলন আরম্ভ হল। এই আন্দোলনের নেতা ছিলেন **উইলিয়ম লয়েড গ্যারিসন।** দাসপ্রথার

দাসপ্রথা নিয়ে বিতর্ক

দাসপ্রথা বিলোপের দাবিতে আন্দোলন

বর্বরতা উন্মোচন করে হ্যারিয়েট বীচার স্টো, 'আংকল টমস্ কেবিন' বা 'টম কাকার কুটির' নামে একখানি বই লিখলেন।

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে একটি হিসাবে দেখা গেল যে আমেরিকায় ক্রীতদাসের সংখ্যা ৪০ লক্ষ। কাজেই ক্রীতদাস প্রথার ব্যাপকতার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হল।



আমেরিকার দাস বিক্রয়

এই সময়ে দাসপ্রথা-বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম নেতা **এব্রাহাম লিঙ্কন** আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলেন। লিঙ্কন দাসপ্রথার তীব্র নিন্দা করতেন। তিনি বলতেন—"If slavery is not wrong, then nothing is wrong."

কিন্তু লিংকন দাসপ্রথার বিরোধী হলেও আশ্বাস দিলেন—যে অঞ্চলে দাসপ্রথা প্রচলিত আছে সেখানে তা তুলে দেবার জন্য তিনি আইন প্রবর্তন করবেন না। কেননা, লিঙ্কনের ধারণা ছিল যে দাসপ্রথা অদূর ভবিষ্যতে কোন আইন ছাড়া এমনই অবলুপ্ত হবে। কিন্তু দক্ষিণ অঞ্চলের লোকেরা তাঁর এই আশ্বাসবাক্যে মোটেই সন্তুষ্ট হল না।

লিংকনের মতামত

তাঁরা ভাবলেন লিংকনের আমলে দাস-প্রথা বিলোপ করার জন্য আইন

পাস করা হবে এবং গঠনতন্ত্র সংশোধন করা হবে। তাঁরা দাবি করলেন—আমেরিকা যখন যুক্তরাষ্ট্র, তখন যুক্তরাষ্ট্রভুক্ত প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের অধিকার আছে, নিজেদের স্বার্থ সুরক্ষিত হতে না দেখলে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার। কিন্তু উত্তর অঞ্চলের লোকেরা বলল—আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র অবিচ্ছেদ্য, কোন রাষ্ট্র খুশীমত যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হবার অধিকার (the right of secession) দাবি করতে পারে না। এইভাবে গঠনতন্ত্রের মর্মার্থ নিয়ে উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে আরম্ভ হল আর একদফা বিতর্ক।

ক্রমে ক্রমে দুটি প্রশ্ন নিয়ে উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে মতপার্থক্য চরমে উঠল—একটি, দাসপ্রথার অবসান উচিত কিনা, দ্বিতীয়টি, কোন রাষ্ট্র ইচ্ছা করলে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে কিনা? অবশ্য এই দুটি প্রশ্ন ছিল ওতপ্রোতভাবে জড়িত। দাসপ্রথা বিলোপের প্রশ্ন না উঠলে দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলি বিচ্ছিন্ন হবার অধিকার দাবি করত কিনা সন্দেহ। আবার অনেকে ছিলেন যাঁদের কাছে দাসপ্রথা বিলোপের প্রশ্নটি জরুরি হলেও তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ছিল যুক্তরাষ্ট্রের ঐক্য রক্ষার প্রশ্নটি।

গৃহযুদ্ধের ঘটনা (Events of the Civil War) : আব্রাহাম লিংকনের রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনের ছ সপ্তাহ পরে দক্ষিণ ক্যারোলিনা নামে একটি রাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্র থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন বলে ঘোষণা করে। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে অ্যালবামা, ফ্লোরিডা, মিসিসিপি, লুসিয়ানা টেক্সাস, জর্জিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রও নিজেদের যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তার পরে এপ্রিল মাসে ভার্জিনিয়া, টেনেসি, উত্তর ক্যারোলিনা এবং আরকানসাসও যুক্তরাষ্ট্র থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে।

যুক্তরাষ্ট্রের ঐক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠায় লিংকনের চেষ্টা

এইভাবে ক্রমে ক্রমে দক্ষিণের এগারোটি রাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটি পৃথক রাষ্ট্রসংঘ (Confederacy) গঠন করে। এই নতুন রাষ্ট্রসংঘটির সভাপতি নির্বাচিত হন **জেফারসন ডেভিস** (Jefferson Davis)। লিঙ্কন দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলির এই ঐক্যনাশা কাজে বিরক্ত হলেন এবং স্থির করলেন যে-কান উপায়েই হোক যুক্তরাষ্ট্রের ঐক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবেন।

কিন্তু দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলি ঐক্য না চাওয়ায় ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হল। চার বছর ধরে এই গৃহযুদ্ধ চলেছিল।

লিংকন কর্তৃক ক্রীতদাসদের মুক্তিদান

এই গৃহযুদ্ধ যখন চলছিল সেই সময়ে লিংকন দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলিকে বিপদে ফেললেন। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী তিনি ক্রীতদাসদের মুক্তি ঘোষণা করলেন। এই ঘোষণার ফলে চল্লিশ লক্ষ ক্রীতদাস মুক্তিলাভ করল। ক্রীতদাসেরা



দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলির পরাজয় স্বীকার ও গৃহযুদ্ধের অবসান

মুক্তি পাবার পরে এব্রাহাম লিংকনের অনুরাগী হয়ে উঠল। তারা দক্ষিণ অঞ্চলের মালিকদের যুদ্ধের আয়োজনে ভিতর থেকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করল। ভিতর ও বাহিরের এই বাধার সম্মুখীন হয়ে দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলি অবশেষে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হল (১৮৬৫ খ্রী:)। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের অবসান হল। লিংকন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ঐক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হলেন।

গৃহযুদ্ধের ফলাফল (Effects of the Civil War) : আমেরিকার ইতিহাসে গৃহযুদ্ধ ছিল এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই গৃহযুদ্ধের পরে কয়েকটি বড় পরিবর্তন লক্ষিত হয়। এইগুলি : (১) আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র গৃহযুদ্ধের পরে সমাজবিন্যাসের দিক থেকে সুসংহত হল। এতদিন আমেরিকা ছিল অর্ধদাস ও অর্ধস্বাধীন। এখন আমেরিকায় নিগ্রোরা নাগরিকের

অধিকার পাওয়ায় নাগরিকে নাগরিকে যে ভেদাভেদ ছিল তা দূরীভূত হল। (২) গৃহযুদ্ধের ফলে একটি গঠনতন্ত্রগত জটিল সমস্যারও সমাধান হল। এখন থেকে এই কথা স্পষ্ট হয়ে উঠল যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ঐক্য অবিচ্ছেদ্য। কোন রাষ্ট্র ইচ্ছা করলেই যুক্তরাষ্ট্র হেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না—এই কথাটি তর্কাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত হল। (৩) উত্তর ও দক্ষিণের গৃহযুদ্ধ মিটল বটে, তবে তাদের মধ্যে তিক্ততা রয়ে গেল। দক্ষিণ অঞ্চলের প্ল্যান্টার শ্রেণীর লোকেরা সাদা-কালোর বৈষম্য ভুলতে পারল না। তাদের উদ্যোগে দক্ষিণে কতকগুলি গুপ্ত সমিতি গড়ে উঠল। এই সমিতির নাম কু-ক্লুক্স-ক্লান (Ku Klux Klan)। এই সমিতির কাজ ছিল—নিগ্রোদের যে রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার দান করা হল তা কার্যত নাকচ করে দেওয়া। তারা নানা অজুহাতে নিগ্রোদের নির্যাতন করত। প্রকাশ্য দিবালোকে রাজপথে নিগ্রো হত্যা বা নিগ্রো লিঞ্চিং (lynching) চালিয়ে যেত। এইভাবে বর্ণবিদ্বেষ জাগিয়ে রেখে দক্ষিণ অঞ্চলের কায়েমী স্বার্থবাদীরা নিজেদের একাধিপত্য বজায় রাখতে চেষ্টা করেছিল।

এব্রাহাম লিংকনের কৃতিত্ব (Success of Abraham Lincoln) : এব্রাহাম লিংকনের নাম আমেরিকার ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে আছে।



এব্রাহাম লিংকন

তিনি দরিদ্রের সন্তান ছিলেন। ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে কেণ্টুকি নামক রাষ্ট্রে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। নিজের চেষ্টায় বিদ্যাভ্যাস করে তিনি একজন বিখ্যাত রাজনীতিবিদ ও বক্তা হিসাবে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইলিওনয়েস রাষ্ট্রের আইনসভায় নির্বাচিত হন। ঐ আইনসভায় স্টিফেন ডগলাসের সঙ্গে তিনি যে রাজনৈতিক বিতর্কে অবতীর্ণ হন তাতেই তিনি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হন এবং অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময়ে তিনি যুক্তরাষ্ট্র পরিচালনা করেন। দাসপ্রথার

তিনি চরম বিরোধী হলেও তাঁর কাছে দাসপ্রথার চেয়েও দেশের বড় শত্রু বলে মনে হয়েছিল দক্ষিণ অঞ্চলের বিভেদমূলক শক্তিগুলিকে। তাই তিনি চোখের মণির মত আমেরিকার ঐক্য রক্ষা করেছিলেন।

আমেরিকার শ্রেষ্ঠ মনীষীদের মধ্যে লিংকন অন্যতম। আমেরিকার এক গভীর সংকটের মুহূর্তে তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল এবং এই সংকট থেকে দেশকে ও রাষ্ট্রকে রক্ষা করে তিনি আমেরিকাবাসীর চিরস্মরণীয় হয়েছেন। নিগ্রোদের নাগরিক অধিকার দান করে তিনি আমেরিকার গণতন্ত্রের বনিয়াদকে আরও শক্ত করে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। গণতন্ত্র সম্পর্কে তাঁর ছিল গভীর অনুভূতি ও পরম শ্রদ্ধা। তিনি দেশের ঐক্যের জন্য এবং গণতন্ত্রের জন্য নিজ প্রাণ উৎসর্গ করেন। তিনি স্বপ্ন দেখতেন—এমন এক আমেরিকার যেখানে মানুষ মুক্তির নব আস্বাদন লাভ করবে। তিনি বলতেন—"That this nation, under God, shall have a new birth of freedom, and that Government of the people, by the people, for the people shall not perish from the earth,"

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাঁর এই ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ হয় নাই। পরবর্তীকালে নিগ্রো ক্রীতদাসদের অধিকারগুলি কাগজে-কলমেই সীমাবদ্ধ হয়ে রইল। আমেরিকায় নিগ্রো নির্যাতন তাই আজও অব্যাহত রয়েছে। আমেরিকার নিগ্রো অধিবাসীরা আজও বলতে পারে—'মানুষেরি হাতে হায় রে মানুষ কত লাঞ্ছনা সয়!'

আমেরিকার বৈদেশিক নীতি
[Foreign Policy of the U. S. A.]

গৃহযুদ্ধ কিছুদিনের জন্য আমেরিকার জীবনে গভীর সংকট সৃষ্টি করলেও আমেরিকার উন্নতির পথ বন্ধ হল না। গৃহযুদ্ধের আগুনে পুড়ে আমেরিকা যেন বেশ শক্ত হয়ে উঠল। ঐক্যবদ্ধ আমেরিকা এখন উত্তরোত্তর উন্নতির পথে ধাবিত হল।

আমেরিকার শিল্পোন্নতি (The Industrial Development of U. S. A.) : উন্নতির পক্ষে প্রয়োজনীয় মালমশলার অভাব আমেরিকায় ছিল না। জনসাধারণ ছিলেন উদ্যমশীল ও পরিশ্রমী। কয়লা, ইস্পাত ও

আমেরিকায় আধুনিক শিল্পের প্রসার

তৈল—আধুনিক শিল্পকরণের পক্ষে উপযোগী এই তিনটি দ্রব্যের ছিল প্রাচুর্য। বিদ্যুৎশক্তির আধার জলরাশিও যথেষ্ট ছিল। আমেরিকার পরিশ্রমী নাগরিকেরা প্রকৃতির দেওয়া এই সম্পদের সদ্ব্যবহার করলেন। আমেরিকায় গড়ে উঠল বৃহৎ বৃহৎ যন্ত্রচালিত আধুনিক শিল্প। উনবিংশ শতাব্দী শেষ হওয়ার আগেই আমেরিকা পৃথিবীর শিল্পোন্নত দেশগুলির মধ্যে নিজের স্থান করে নিল।

শিল্পোন্নত এই নতুন দেশটি ইওরোপের প্রধান প্রধান শিল্পোন্নত দেশ যেমন ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী প্রভৃতির সঙ্গে প্রতিযোগিতা আরম্ভ করল।

শিল্পোন্নত আমেরিকা অন্যত্র নিজের বিক্রয়ক্ষেত্র খুঁজতে আরম্ভ করল। এই সময়ে আমেরিকার পুঁজিপতিরা অন্যান্য দেশে পুঁজি নিয়োগের জন্যও ব্যস্ত হয়ে পড়ল। দক্ষিণ আমেরিকা ও মধ্য আমেরিকায় যে বড় বড় দেশ রয়েছে, সেগুলির দিকেই তাদের প্রথম নজর পড়ল। অর্থাৎ আমেরিকা দেখল—তার উন্নতির জন্য প্রয়োজন সমগ্র আমেরিকা মহাদেশটার উপর কর্তৃত্ব। এইভাবে আমেরিকা ইওরোপের রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতা এড়িয়ে দক্ষিণ আমেরিকাতে একচেটিয়া প্রভুত্ব স্থাপনে উদ্যোগী হল।

ফলাফল

মনরো নীতি—(Monroe Doctrine) **:** দক্ষিণ আমেরিকার দিকে আমেরিকার নজর পড়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে। দক্ষিণ আমেরিকায় স্পেনের সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল পঞ্চদশ শতাব্দীতে। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় ফরাসী বিপ্লব ও আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রভাবে দক্ষিণ আমেরিকায় স্পেনের উপনিবেশগুলিতে মহা আলোড়ন সুরু হয়। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনের উপনিবেশগুলি বিদ্রোহ ঘোষণা করে। মেটারনিক এই সময়ে ইওরোপে বিপ্লব-বিরোধী অভিযান পরিচালনা করতেন কনসার্ট অব ইওরোপের মাধ্যমে। তিনি স্পেনের উপনিবেশে এই বিপ্লবের খবর পেয়ে স্থির করলেন বিপ্লব দমন করবার জন্য দক্ষিণ আমেবিকায় একটি অভিযান প্রেরণ করবেন।

মনরো-নীতি

এই সময় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ছিলেন মনরো (Monroe)। তিনি বললেন—দক্ষিণ আমেরিকার স্পেনীয় উপনিবেশগুলির স্বাধীনতা ঘোষণার অধিকার আছে। তিনি আরও বললেন যে—ইওরোপীয় শক্তি-

গুলির বিপ্লব দমনের অজুহাতে আমেরিকায় অভিযান পাঠাবার কোনো অধিকার নাই। তিনি ঐ শক্তিগুলিকে হুঁশিয়ার করে দিলেন যে, এই ধরনের হস্তক্ষেপ যুক্তরাষ্ট্র সহ্য করবে না। তিনি ঘোষণা করলেন যে আমেরিকায় ইওরোপীয় শক্তিদের হস্তক্ষেপ অন্যায়। তিনি বললেন—আমেরিকা আমেরিকাবাসীদের জন্য (America for the Americans)। আমেরিকা আমেরিকাবাসীদের জন্য—এইটি ক্রমশ হয়ে উঠল আমেরিকার বৈদেশিক নীতির প্রধান কথা। এইটি **মনরো-নীতি** বলে পরিচিত।

মনরো-নীতির তাৎপর্য

এইভাবে যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ আমেরিকার বিদ্রোহী উপনিবেশগুলিকে ইওরোপের আক্রমণ থেকে রক্ষা করল। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ আমেরিকার সদ্য স্বাধীন প্রজাতন্ত্রগুলির রক্ষক হিসাবে সুখ্যাতি অর্জন করল। কিন্তু রক্ষক ক্রমশ ভক্ষক হয়ে উঠল। মনরো-নীতির মধ্যে রয়ে গেল আমেরিকার সাম্রাজ্য বিস্তারের বীজ। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রই যে আমেরিকা মহাদেশের নেতা—এইটি ছিল মনরো-নীতির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য। এই নীতির সুযোগ নিয়ে পরবর্তী যুগে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ আমেরিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে একাধিপত্য স্থাপন করেছিল। তাছাড়া, মনরো নীতির ফলে যুক্তরাষ্ট্র ইওরোপের রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে আমেরিকা মহাদেশেই নিজের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ খুঁজতে আরম্ভ করল। মনরো-নীতির প্রবর্তনের পর থেকে প্রায় একশো বছর ধরে আমেরিকা ইওরোপের রাজনীতি থেকে নিজেকে দূরে রেখেছিল।

দক্ষিণ আমেকার যুক্ত-রাষ্ট্রের অদৃশ্য সাম্রাজ্য

দক্ষিণ আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্রের অদৃশ্য সাম্রাজ্য (The Invisible Empire of U. S. A.) ক্রমশ যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ আমেরিকায় পণ্যদ্রব্যের বাজার চাইল। এইসব দেশের রেল, টেলিগ্রাফ, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি গড়ার কাজে আমেরিকার পুঁজিপতিরা অর্থ নিয়োগ করল। তারা এই অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলিকে টাকাও ধার দিতে থাকল। একে একে অর্থনৈতিক দিক থেকে এই অঞ্চলে গড়ে উঠল আমেরিকার কর্তৃত্ব। এই অর্থনৈতিক কর্তৃত্বের জোরে আমেরিকা এই রাষ্ট্রগুলিকে নিজের প্রভাবাধীন করে ফেলল। এইভাবে ক্রমশ অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব স্থাপনের মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ আমেরিকায় গড়ে তুলল অদৃশ্য এক সাম্রাজ্য।

তাছাড়া, মনরো-নীতির দোহাই দিয়ে আমেরিকা এই অঞ্চলে নিজের

আমেরিকায় আধুনিক শিল্পের প্রসার

তৈল—আধুনিক শিল্পকরণের পক্ষে উপযোগী এই তিনটি দ্রব্যের ছিল প্রাচুর্য। বিদ্যুৎশক্তির আধার জলরাশিও যথেষ্ট ছিল। আমেরিকার পরিশ্রমী নাগরিকেরা প্রকৃতির দেওয়া এই সম্পদের সদ্ব্যবহার করলেন। আমেরিকায় গড়ে উঠল বৃহৎ বৃহৎ যন্ত্রচালিত আধুনিক শিল্প। উনবিংশ শতাব্দী শেষ হওয়ার আগেই আমেরিকা পৃথিবীর শিল্পোন্নত দেশগুলির মধ্যে নিজের স্থান করে নিল।

শিল্পোন্নত এই নতুন দেশটি ইওরোপের প্রধান প্রধান শিল্পোন্নত দেশ যেমন ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী প্রভৃতির সঙ্গে প্রতিযোগিতা আরম্ভ করল।

ফলাফল

শিল্পোন্নত আমেরিকা অন্যত্র নিজের বিক্রয়ক্ষেত্র খুঁজতে আরম্ভ করল। এই সময়ে আমেরিকার পুঁজিপতিরা অন্যান্য দেশে পুঁজি নিয়োগের জন্যও ব্যস্ত হয়ে পড়ল। দক্ষিণ আমেরিকা ও মধ্য আমেরিকায় যে বড় বড় দেশ রয়েছে, সেগুলির দিকেই তাদের প্রথম নজর পড়ল। অর্থাৎ আমেরিকা দেখল—তার উন্নতির জন্য প্রয়োজন সমগ্র আমেরিকা মহাদেশটার উপর কর্তৃত্ব। এইভাবে আমেরিকা ইওরোপের রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতা এড়িয়ে দক্ষিণ আমেরিকাতে একচেটিয়া প্রভুত্ব স্থাপনে উদ্যোগী হল।

মনরো নীতি—(Monroe Doctrine) : দক্ষিণ আমেরিকার দিকে আমেরিকার নজর পড়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে। দক্ষিণ আমেরিকায় স্পেনের সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল পঞ্চদশ শতাব্দীতে। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় ফরাসী বিপ্লব ও আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রভাবে দক্ষিণ আমেরিকায় স্পেনের উপনিবেশগুলিতে মহা আলোড়ন সুরু হয়। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনের উপনিবেশগুলি বিদ্রোহ ঘোষণা করে। মেটারনিক এই সময়ে ইওরোপে বিপ্লব-বিরোধী অভিযান পরিচালনা করতেন কনসার্ট অব ইওরোপের মাধ্যমে। তিনি স্পেনের উপনিবেশে এই বিপ্লবের খবর পেয়ে স্থির করলেন বিপ্লব দমন করবার জন্য দক্ষিণ আমেবিকায় একটি অভিযান প্রেরণ করবেন।

মনরো-নীতি

এই সময় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ছিলেন মনরো (Monroe)। তিনি বললেন—দক্ষিণ আমেরিকার স্পেনীয় উপনিবেশগুলির স্বাধীনতা ঘোষণার অধিকার আছে। তিনি আরও বললেন যে—ইওরোপীয় শক্তি-

গুলির বিপ্লব দমনের অজুহাতে আমেরিকায় অভিযান পাঠাবার কোনো অধিকার নাই। তিনি ঐ শক্তিগুলিকে হুঁশিয়ার করে দিলেন যে, এই ধরনের হস্তক্ষেপ যুক্তরাষ্ট্র সহ্য করবে না। তিনি ঘোষণা করলেন যে আমেরিকায় ইওরোপীয় শক্তিদের হস্তক্ষেপ অন্যায়। তিনি বললেন—আমেরিকা আমেরিকাবাসীদের জন্য (America for the Americans)। আমেরিকা আমেরিকাবাসীদের জন্য—এইটি ক্রমশ হয়ে উঠল আমেরিকার বৈদেশিক নীতির প্রধান কথা। এইটি **মনরো-নীতি** বলে পরিচিত।

মনরো-নীতির তাৎপর্য

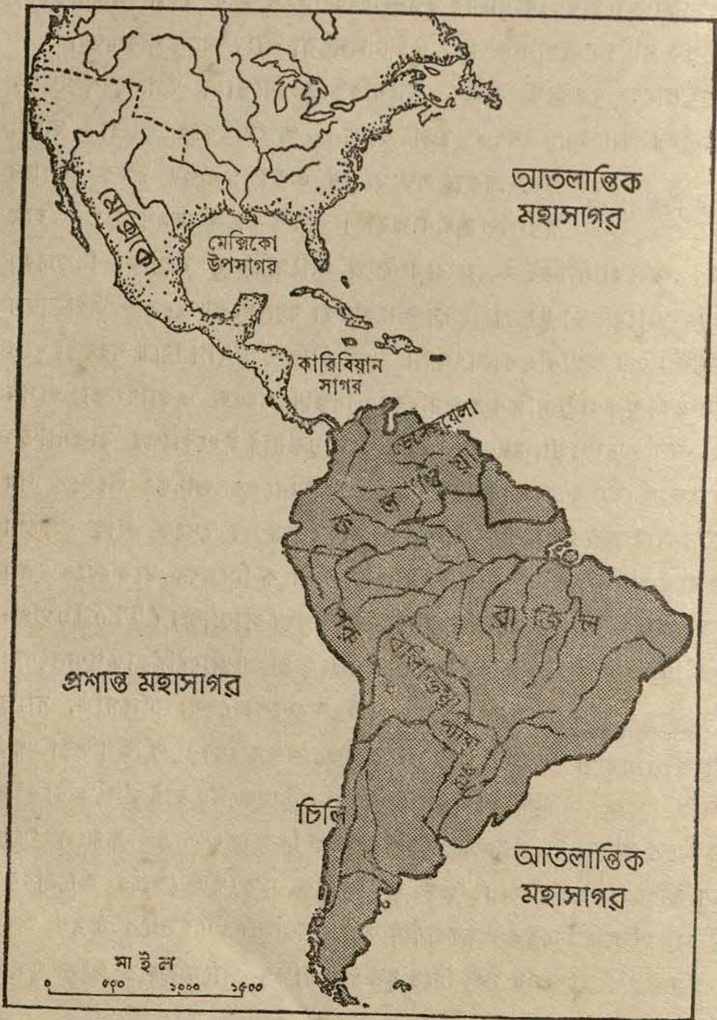
এইভাবে যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ আমেরিকার বিদ্রোহী উপনিবেশগুলিকে ইওরোপের আক্রমণ থেকে রক্ষা করল। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ আমেরিকার সদ্য স্বাধীন প্রজাতন্ত্রগুলির রক্ষক হিসাবে সুখ্যাতি অর্জন করল। কিন্তু রক্ষক ক্রমশ ভক্ষক হয়ে উঠল। মনরো-নীতির মধ্যে রয়ে গেল আমেরিকার সাম্রাজ্য বিস্তারের বীজ। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রই যে আমেরিকা মহাদেশের নেতা—এইটি ছিল মনরো-নীতির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য। এই নীতির সুযোগ নিয়ে পরবর্তী যুগে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ আমেরিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে একাধিপত্য স্থাপন করেছিল। তাছাড়া, মনরো নীতির ফলে যুক্তরাষ্ট্র ইওরোপের রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে আমেরিকা মহাদেশেই নিজের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ খুঁজতে আরম্ভ করল। মনরো-নীতির প্রবর্তনের পর থেকে প্রায় একশো বছর ধরে আমেরিকা ইওরোপের রাজনীতি থেকে নিজেকে দূরে রেখেছিল।

দক্ষিণ আমেকায় যুক্ত-রাষ্ট্রের অদৃশ্য সাম্রাজ্য

দক্ষিণ আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্রের অদৃশ্য সাম্রাজ্য (The Invisible Empire of U. S. A.) ক্রমশ যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ আমেরিকায় পণ্যদ্রব্যের বাজার চাইল। এইসব দেশের রেল, টেলিগ্রাফ, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি গড়ার কাজে আমেরিকার পুঁজিপতিরা অর্থ নিয়োগ করল। তারা এই অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলিকে টাকাও ধার দিতে থাকল। একে একে অর্থনৈতিক দিক থেকে এই অঞ্চলে গড়ে উঠল আমেরিকার কর্তৃত্ব। এই অর্থনৈতিক কর্তৃত্বের জোরে আমেরিকা এই রাষ্ট্রগুলিকে নিজের প্রভাবাধীন করে ফেলল। এইভাবে ক্রমশ অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব স্থাপনের মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ আমেরিকায় গড়ে তুলল অদৃশ্য এক সাম্রাজ্য।

তাছাড়া, মনরো-নীতির দোহাই দিয়ে আমেরিকা এই অঞ্চলে নিজের

রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারেও সমর্থ হল। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন যখন আমেরিকা মহাদেশের অন্তর্গত মেক্সিকো আক্রমণ করেন তখন যুক্তরাষ্ট্র মেক্সিকোকে রক্ষা করল এবং মেক্সিকোর প্রজাতান্ত্রিক সরকার তখন থেকে যুক্তরাষ্ট্রের নির্দেশ অনুসারে চলতে আরম্ভ করল।



উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দক্ষিণ আমেরিকা

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটেন ও ভেনেজুয়েলার মধ্যে যখন ঝগড়া হয় তখন আমেরিকা ভেনেজুয়েলার পক্ষ সমর্থন করে এবং এইভাবে সে এই অঞ্চলে নিজের কর্তৃত্ব বিস্তার করল।

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে কিউবা ও স্পেনের মধ্যে ঝগড়া বাধলে যুক্তরাষ্ট্র কিউবাকে সাহায্য করায় কিউবার প্রজাতন্ত্র আমেরিকার প্রভাবাধীন হল।

এইভাবে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ আমেরিকার কয়েকটি তথাকথিত স্বাধীন রাষ্ট্রের উপর নিজ প্রভাব বিস্তার করল।

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে স্পেন ও আমেরিকার যুদ্ধের পরে যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ দখল করে নিল।

এইভাবে ঊনবিংশ শতাব্দী শেষ হওয়ার আগেই আমেরিকা একটি বড় সাম্রাজ্যবাদী দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করল।

আমেরিকা সাম্রাজ্যবাদী দেশে পরিণত

চীনের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে আমেরিকার হস্তক্ষেপ

যুক্তরাষ্ট্র ও চীন—বিংশ শতাব্দীতে আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী প্রভাব আরও বিস্তার লাভ করে। এই সময়ে চীনের ব্যাপারে আমেরিকা হস্তক্ষেপ করতে আরম্ভ করে। এখানেও আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী প্রভাব ছদ্মবেশ পরিধান করল। আমেরিকা চীনের কোন ভূখণ্ড দখল করল না। আমেরিকা চীনকে বলল—তোমার দরজা খুলে দাও বাইরের রাষ্ট্রগুলির জন্য। এটিকে বলা হয় **দরজা খোল নীতি** (Open Door Policy)। এই নীতির তাৎপর্য হল—আমেরিকার পণ্যদ্রব্যের জন্য চীন তার বাজার খুলে দিক। এইভাবে চীনের অর্থনীতিতে আমেরিকা চেয়েছিল কর্তৃত্ব।

প্রথম মহাযুদ্ধ ও আমেরিকা (U. S. A. and The First World War) **:** প্রাচ্য দেশে অর্থনৈতিক অনুপ্রবেশের জন্য আমেরিকা যখন সচেষ্ট, সেই সময় প্রথম মহাযুদ্ধের দামামা বেজে উঠল। এই যুদ্ধে আমেরিকা প্রথম দিকে কোন পক্ষেই যোগ দেয় নাই। বরং আমেরিফা এই যুদ্ধের প্রথম দিকে দুই পক্ষকেই অস্ত্রশস্ত্র বিক্রি করতে থাকে। পরে যুদ্ধ যখন শেষ হওয়ার দিকে (১৯১৭ খ্রীঃ) তখন আমেরিকা ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতির পক্ষে যোগ দেয়। আমেরিকা যুদ্ধে যোগ দেওয়ায় ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি মিত্র-গোষ্ঠীর খুব সুবিধা হল। যুক্তরাষ্ট্রের বিরাট সৈন্যবাহিনী, প্রচুর অর্থসম্পদ ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এখন থেকে মিত্রপক্ষের জয়ের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দিল।

যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটেনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সাবমেরিন ও ডেস্ট্রয়ার নিয়ে নৌ-যুদ্ধে জার্মানীকে কাবু করেছিল। নৌযুদ্ধে জার্মানীর পরাজয়ে আমেরিকার দান ছিল অসামান্য। প্রথম মহাযুদ্ধে যোগদান করার ফলে আমেরিকার বৈদেশিক নীতিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সূচিত হল। এতদিন আমেরিকা মনরো-নীতি অনুসরণ করে ইওরোপের রাজনীতি থেকে দূরে ছিল। এখন যুদ্ধে যোগ দেওয়ায় ইওরোপীয় রাজনীতি থেকে দূরে থাকার নীতি বর্জিত হল। এখন থেকে আমেরিকা শুধু আমেরিকা মহাদেশে নয়, ইওরোপীয় মহাদেশের রাজনীতিতেও অংশ গ্রহণ আরম্ভ করল। ভার্সাই সন্ধিতে উড্রো উইলসনের নেতৃত্বে যুক্তরাষ্ট্র অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। উড্রো উইলসন শান্তি বৈঠকে ঘোষণা করেছিলেন—পৃথিবীতে গণতন্ত্রকে সুরক্ষিত করতে হবে (The world must be made safe for democracy)। উড্রো উইলসনের 'চতুর্দশ দফার' (Fourteen Points) উপর ভিত্তি করে লীগ অফ নেশনসের উৎপত্তি হয়।

মনরো নীতি বর্জন

প্রথম মহাযুদ্ধের পরে আমেরিকা
(U. S. A. after the first World War)

যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসনের সুপারিশক্রমেই লীগ অফ নেশনসের উৎপত্তি হলেও আমেরিকা লীগে যোগ দেয় নাই। তার কারণ আমেরিকা ইওরোপের রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ার বিরোধী ছিল। ইওরোপের রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার উদ্দেশ্যে আমেরিকা লীগে যোগ দিল না। তবে লীগ অব নেশনসের সঙ্গে সহযোগিতা করতে আমেরিকা সম্মত হল।

ইউরোপের রাজনীতি হতে বিচ্ছিন্ন থেকে আমেরিকা সুদূর প্রাচ্যে নিজ কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করার দিকে মন দিল। ১৯২১ খ্রীঃ আমেরিকার উদ্যোগে ওয়াশিংটনে এক সম্মেলন (Washington Conference) বসে। এই সম্মেলনে প্রশান্ত মহাসাগরে কর্তৃত্ব স্থাপনের বিষয়টি ও নৌশক্তি হ্রাস সংক্রান্ত কয়েকটি প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হয়। এই সম্মেলনের ফলে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে আমেরিকার কর্তৃত্ব সুদৃঢ় হয়।

দশম অধ্যায়

প্রথম মহাযুদ্ধ ও তারপর

(First World war and After)

বিংশ শতাব্দীর অন্যতম প্রধান ঘটনা হল—প্রথম মহাযুদ্ধ। ১৯১৪ খ্রীঃ আগষ্ট মাসে এই যুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং ১৯১৮ খ্রীঃ নভেম্বর মাসে এই যুদ্ধের শেষ হয়।

এই যুদ্ধে এক পক্ষে ছিল ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়া। ইংলণ্ড ছিল এই পক্ষের নেতা। অপর পক্ষে ছিল জার্মানী ও অস্ট্রিয়া।

যুদ্ধের কারণ

(Causes of the War)

সাম্রাজ্যবাদী প্রতিযোগিতা (Inter-imperalistrivalry) : সাম্রাজ্যবাদী প্রতিযোগিতা থেকে প্রথম মহাযুদ্ধের সূচনা। এই সাম্রাজ্যবাদী প্রতিযোগিতা অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ও সামরিক ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

অর্থনৈতিক

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, কাঁচামাল সংগ্রহের জন্য ও বাজার হিসাবে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়ার কাছে এশিয়া ও আফ্রিকার সাম্রাজ্য ছিল অপরিহার্য। কিন্তু জার্মানীতে শিল্পবিপ্লব পরে হওয়ায় জার্মানী দেখল এশিয়া ও আফ্রিকার প্রতিটি সম্পদশালী দেশ ব্রিটেন বা ফ্রান্সের সাম্রাজ্যভুক্ত। তাই জার্মানী রুষ্ট হল। সে চাইল ব্রিটেন, ফ্রান্স বা রাশিয়ার সাম্রাজ্য কেড়ে নিয়ে নিজের বাজার বাড়াতে। ফলে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়ার বিরুদ্ধে সে যুদ্ধের পথ বেছে নিল।

রাজনৈতিক

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, উপরোক্ত সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতে উগ্র জাতীয়তাবাদের উদ্ভব হল। ইংলণ্ডের সাম্রাজ্যবাদীরা ভারত জয় করে, ফ্রান্স ইন্দোচীন দখল করে নিজেদের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করেছিল। জার্মানীও এশিয়া এবং আফ্রিকায় সাম্রাজ্য বিস্তার করে নিজ সম্মান বাড়াতে সচেষ্ট হল। এর ফলে এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলিকে পদানত করতে পারা তারা গৌরবের কাজ বলে মনে করল।

My Country, Right or Wrong—এই ছিল উগ্র জাতীয়তাবাদীদের মূল ধ্বনি। নিজের দেশ যা করবে—তাই ভাল—তাতে যদি অন্যের ক্ষতিও হয় তাতে দোষ নাই। ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে ও রাশিয়ায় সাম্রাজ্যবাদী শাসকেরা উপরোক্ত উগ্র জাতীয়তাবাদের আশ্রয় নিয়ে নিজ নিজ সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল। এখন জার্মানীও উগ্র জাতীয়তাবাদের আশ্রয় নিয়ে বৃটেন ফ্রান্স, ও রাশিয়ার সাম্রাজ্য আক্রমণ করল। প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রগুলির উগ্র জাতীয়তাবাদের ফলে প্রথম মহাযুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠল।

সামরিক

সামরিক ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি দুটি রাষ্ট্র জোটে—ত্রিশক্তি চুক্তি ও ত্রিশক্তি আঁতাত—বিভক্ত হয়ে পড়ল। উভয় জোটের অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রগুলি অস্ত্র প্রতিযোগিতায় মেতে উঠল। অস্ত্রব্যবসায়ীরা অস্ত্র-বিক্রীর লোভে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। অস্ত্র প্রতিযোগিতার অনিবার্য পরিণতি হিসাবে শেষ পর্যন্ত প্রথম মহাযুদ্ধ সংঘটিত হল।

প্রথম মহাযুদ্ধের জন্য জার্মানীর দায়িত্ব (Gemany's Responsibility for the First World War)ঃ আমরা আগেই দেখেছি যে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে জার্মানী একটি ঐক্যবদ্ধ জাতীয় রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে, এই ঐক্যবদ্ধ জার্মানীর স্রষ্টা ছিলেন বিসমার্ক। বিসমার্ক প্রথম থেকেই জার্মানীর সামরিক শক্তি বৃদ্ধির দিকে নজর দিলেন। তাঁর চেষ্টায় জার্মানীর সেনাবাহিনী পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সেনাবাহিনী বলে পরিগণিত হয়েছিল। বিসমার্ক ফ্রান্সের শক্তি একেবারে চূর্ণ করার উদ্দেশ্যে এই শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠন করলেন। তারপরে ফ্রান্সকে সম্পূর্ণ একঘরে করার উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁর উদ্যোগে জার্মানী অস্ট্রিয়া ও ইতালীর মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। এই চুক্তিটি **ত্রিশক্তি চুক্তি** (Triple Alliance) বলে খ্যাত।

ত্রিশক্তি চুক্তি

কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম: জার্মানীর ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য বিস্তারের কামনা

১৮৯০ খ্রীঃ **কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম** জার্মানীর সিংহাসনে আরোহণ করলেন। বিসমার্কের দূরদর্শিতা তাঁর ছিল না। তিনি ছিলেন অসহিষ্ণু ও উগ্র জাতীয়তাবাদী। তিনি সমগ্র পৃথিবীতে জার্মানীর প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করার সংকল্প নিয়ে মেতে উঠলেন।

এই সময়ে জার্মানী একটি বৃহৎ শিল্পোন্নত দেশে পরিণত হয়েছিল। এই শিল্পগুলির জন্য জার্মানীর কাঁচামালের প্রয়োজন হল। কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি রাষ্ট্রের মত উপনিবেশ স্থাপনে অগ্রণী হলেন। সাম্রাজ্যবিস্তারের ব্যাপার নিয়ে ব্রিটেনের সঙ্গে জার্মানীর স্বার্থ-সঙ্ঘাত আরম্ভ হল।

জার্মানীর নৌ-বল বৃদ্ধি

সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে হলে প্রয়োজন হয় নৌ-বলের। কাজেই নৌ-বল গড়ে তোলার কাজেও কাইজার মন দিলেন। ব্রিটেন নৌ-শক্তিতে ছিল সর্বপ্রধান। জার্মানীর নৌ-বল বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখে ব্রিটেন আরও আতংকিত হয়ে উঠল।

জার্মানী ও রাশিয়ার মধ্যে প্রতিযোগিতা

এই সঙ্গে জার্মানী পূর্ব ইওরোপেও নিজ সাম্রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করতে লাগল। রাশিয়ার চিরশত্রু তুরস্কের সঙ্গেও এই উদ্দেশ্যে কাইজার মিতালি করতে লাগলেন। কাজেই রাশিয়া ও জার্মানীর মধ্যেও বিরোধ উপস্থিত হল।

জার্মানী ও ফ্রান্সের মধ্যে প্রতিযোগিতা

এইভাবে জার্মানী ইওরোপের ভারসাম্য বিঘ্নিত করে তুলল। ফ্রান্সের সঙ্গে জার্মানীর বহুদিনের বিরোধ তো ছিলই, এখন আবার নৌ-বল নিয়ে জার্মানীর বিরোধ বাধল ইংলণ্ডের সঙ্গে এবং পূর্ব ইওরোপে হস্তক্ষেপের ব্যাপার নিয়ে জার্মানীর সঙ্গে বিরোধ বাধল রাশিয়ার। এই ভাবে ক্রমশ জার্মানীর শত্রু হয়ে দাঁড়াল একে একে তিনটি প্রধান রাষ্ট্র—ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও রাশিয়া। শেষ পর্যন্ত ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও রাশিয়া জার্মানীর আক্রমণ রোধ করার উদ্দেশ্য নিয়ে একটি চুক্তিনামায় স্বাক্ষর করল। এইটি ত্রিশক্তি আঁতাত (Triple Entente) বলে খ্যাত।

ত্রিশক্তি আঁতাত

দুটি জোটের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হল। দুই জোটই সামরিক শক্তিতে বলশালী হতে চেষ্টা করায় তাদের মধ্যে অস্ত্রসজ্জা নিয়ে প্রতিযোগিতাও আরম্ভ হল। দুই পক্ষই অস্ত্র-শস্ত্রে এত সুসজ্জিত হল যে যুদ্ধ প্রায় অনিবার্য হয়ে উঠল।

প্রত্যক্ষ কারণ (Immediate Cause) : এই অস্ত্রসজ্জার ফলে ইওরোপ যখন বারুদের স্তূপের মত ভীষণ হয়ে উঠল, ঠিক সেই সময়ে একটি অতি ক্ষুদ্র ঘটনা বারুদের স্তূপে যেন অগ্নিসংযোগ করল।

এই সময়ে পূর্ব ইওরোপে দুটি রাষ্ট্র অস্ট্রিয়া ও সার্বিয়ার মধ্যে বিরোধ

চলছিল। অস্ট্রিয়া-সাম্রাজ্যের মধ্যে বহু জাতি বাস করত। সার্বিয়া জাতির একটি অংশও এই সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সার্বিয়া জাতির এই অংশটি অস্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকতে রাজী ছিল না। এই ব্যাপার নিয়ে যখন অস্ট্রিয়া ও সার্বিয়ার মধ্যে মনোমালিন্য চলছিল, ঠিক সময়ে একজন সার্বীয় যুবক বসনিয়ার রাজধানী সেরাজিভো শহরে অস্ট্রিয়ার রাজপুত্র ফ্রান্সিস ফার্ডি-ন্যাণ্ডকে হত্যা করল (২৮শে জুন ১৯১৪ খ্রীঃ)। অস্ট্রিয়া এই হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী করল সার্বিয়া রাষ্ট্রকে। ক্ষতিপূরণের নামে সার্বিয়াকে সম্মান-হানিকর কয়েকটি শর্ত মেনে নেবার জন্য অস্ট্রিয়া চরমপত্র দিল। সার্বিয়া এই শর্ত মানল না। তখন অস্ট্রিয়া সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল।

যুদ্ধের আসন্ন কারণ : সার্বিয়ার ঘটনা

জার্মানী নিজ মিত্র অস্ট্রিয়ার আচরণ সমর্থন করল এবং অস্টিয়ার পক্ষভুক্ত হয়ে সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। জার্মানীর এই যুদ্ধে যোগদানের ফলে সমস্ত ইওরোপে এক নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হল। রাশিয়া, ফ্রান্স ও ব্রিটেন ক্রমে ক্রমে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। অস্ট্রিয়া ও সার্বিয়ার মধ্যে যে স্থানীয় যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছিল সেইটিই মহাযুদ্ধে পরিণত হল। ক্রমে ক্রমে পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেকটি বড় শক্তি কোন-না-কোন পক্ষে যোগ দিল। তুরস্ক ও রাশিয়ার মধ্যে বিরোধ চলায় তুরস্ক জার্মানীর পক্ষে যোগ দেয়। পরে ইতালী ও জাপান ইংলণ্ডের পক্ষভুক্ত হয়। যুদ্ধের শেষের দিকে আমেরিকা ও চীন ইংলণ্ডের পক্ষে যোগ দিল। কাজে কাজেই, প্রথম মহাযুদ্ধ আস্তে আস্তে বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হল।

যুদ্ধের গতি
[The Course of the War]

এই যুদ্ধের রণাঙ্গন ইওরোপে সীমাবদ্ধ রইল না। তিনটি রণাঙ্গনে এই যুদ্ধ চলল—(১) পশ্চিম রণাঙ্গনে অর্থাৎ পশ্চিম ইওরোপীয় অঞ্চলে, (২) পূর্ব রণাঙ্গনে অর্থাৎ পূর্ব ইওরোপীয় অঞ্চলে, (৩) নিকট প্রাচ্যে। তাছাড়া, বিস্তৃত সমুদ্রবক্ষেও এই যুদ্ধ চলেছিল।

তিনটি রণাঙ্গন

পশ্চিম রণাঙ্গন (Western Front) : এই রণাঙ্গনে যুদ্ধ কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। প্রথম দিকে ব্রিটেন ও ফ্রান্স একযোগে জার্মানীর সঙ্গে যুদ্ধ

ট্রেঞ্চ-যুদ্ধ

চালিয়েছিল। যুদ্ধের প্রথম দিকে জার্মানী পশ্চিম ইওরোপের দেশগুলি জয় করে নিয়ে প্যারিস শহরে প্রবেশ করার জন্য প্রস্তুত হতে লাগল। ব্রিটিশ ও ফরাসী বাহিনী অদম্য উৎসাহ নিয়ে জার্মানীকে এই অঞ্চলে বাধা দিয়েছিল। এই সময়ে দুই পক্ষে ভীষণ ট্রেঞ্চ-যুদ্ধ চলেছিল। তারপরে ১৯১৬ খ্রীঃ জার্মানী ভার্দুনে বিরাট আঘাত হানল। ফ্রান্স অসীম বীরত্বের সঙ্গে এবারও যুদ্ধ করল। চার লক্ষ-ফরাসী এই যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছিল। এই রণাঙ্গনে সোম অঞ্চলে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স জার্মানীকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেছিল (১৯১৭ খ্রীঃ)। জার্মানীকে এই যুদ্ধে পশ্চাদপসরণ করতে হল। কিন্তু পশ্চাদপসরণের সময় জার্মানী এই অঞ্চলের সমস্ত ঘরবাড়ি নিশ্চিহ্ন করে দিল। এই যুদ্ধে ব্রিটেন ট্যাঙ্ক ব্যবহার করেছিল।

পূর্ব রণাঙ্গন (Eastern Front) : পূর্ব রণাঙ্গনে যুদ্ধ হয়েছিল প্রধানত জার্মানী ও রাশিয়ার মধ্যে। রাশিয়ার সৈন্যবাহিনীর সামরিক শিক্ষা ছিল নিম্নস্তরের। জার্মানীর সামনে রাশিয়ার সৈন্যদল বার বার পরাজয় স্বীকার করতে লাগল। জার্মানী রাশিয়ার অধিকৃত অঞ্চলগুলি দখল করে নিল। ১৯১৭ খ্রীঃ যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় রাশিয়ায় বলশেভিক বিদ্রোহ দেখা দিল এবং বলশেভিকরা ক্ষমতা পাবার পরে রাশিয়া যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করল। কাজেই পূর্ব রণাঙ্গণে জার্মানীর হল জয় জয়কার। এই রণাঙ্গনে জার্মানীর সেনাপতি ছিলেন **ভন হিণ্ডেনবার্গ**। তিনি অতুলনীয় খ্যাতি অর্জন করলেন।

নিকট প্রাচ্য (The Near East) : নিকট প্রাচ্যে জার্মানীর মিত্র তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কেন্দ্রীভূত হল। এই অঞ্চলে গ্যালিপোলিতে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স একটি অভিযান প্রেরণ করে ; কিন্তু এই অভিযান ব্যর্থ হয়। মেসোপোটেমিয়াতে তুরস্কের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ ও ভারতীয় সৈন্য নিয়োগ করা হল। এখানেও তুরস্কের জয় হল। পরে ১৯১৭ খ্রীঃ ইংলণ্ড ও ফ্রান্স এই অঞ্চলে নিজেদের প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়েছিল। এই সময়ে প্যালেস্টাইনেও ব্রিটিশ ও ভারতীয় বাহিনী তুরস্ককে পরাজিত করেছিল।

সমুদ্রবক্ষে যুদ্ধ (Naval Warfare) : প্রথম মহাযুদ্ধে একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল সমুদ্রবক্ষে যুদ্ধ। ব্রিটেন এই যুদ্ধে নিজের নৌ-বাহিনীর সাহায্যে জার্মানীকে অবরুদ্ধ করে রাখতে চেষ্টা করেছিল। জার্মানীও ব্রিটেনের নৌ-শক্তিকে ধ্বংস করার জন্য

জুটল্যাণ্ডের যুদ্ধ

সাবমেরিণ যুদ্ধের আশ্রয় নিল। এই যুদ্ধের মধ্যে সবচেয়ে বড় নৌ-সংঘর্ষ হয়েছিল জুটল্যাণ্ডের উপকূলে; এই নৌ-যুদ্ধে দুই পক্ষই বীরত্বের সঙ্গে-যুদ্ধ করল। জয়পরাজয় অনিশ্চিত হয়ে রইল। কিন্তু অবিরাম সাবমেরিন যুদ্ধ চলতে লাগল। জার্মানীর সাবমেরিন শুধু ইংলণ্ডের জাহাজগুলিই ধ্বংস করল না; এমন কি নিরপেক্ষ আমেরিকার জাহাজের ক্ষতিসাধন করল। জার্মানীর ব্যবহারে রাগান্বিত হয়ে আমেরিকা ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের পক্ষে যোগ দিল। এখন ব্রিটেন ও আমেরিকা যুক্তভাবে জার্মানীর সাবমেরিন-যুদ্ধের বিরুদ্ধে পাল্টা ডেস্ট্রয়ার ও সাবমেরিন-যুদ্ধ আরম্ভ করল। শেষ পর্যন্ত সাবমেরিন-যুদ্ধে জার্মানীকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল।

আমেরিকার যুদ্ধে যোগদান

বস্তুত ১৯১৭ খ্রীঃ থেকে যুদ্ধের গতি পরিবর্তিত হতে থাকে। এই সময়ে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধে যোগ দেওয়ায় ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের যথেষ্ট শক্তিবৃদ্ধি হয়। মেসোপটেমিয়া ও প্যালেস্টাইনে জার্মান পক্ষের পরাজয়, নৌ-যুদ্ধে জার্মানীর ব্যর্থতা এবং সর্বশেষে পশ্চিম রণাঙ্গনে জার্মানীর অসাফল্য—এইগুলি মিলিত হয়ে জার্মানীর পরাজয় অনিবার্য করে তুলল। জার্মানীর ভিতরেও কাইজার-বিরোধী আন্দোলন আরম্ভ হল। অবশেষে ১৯১৮ খ্রীঃ ৯ই নভেম্বর তারিখে কাইজার জার্মানীর সিংহাসন ত্যাগ করলেন। তার দুদিন পরে দুই পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ-সমাপ্তি ঘোষণা করা হল।

জার্মানীর পরাজয় বরণ

প্রথম মহাযুদ্ধের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য

[Main Features of the First World War]

অর্থনৈতিক দিক থেকে বিচার করলে, প্রথম মহাযুদ্ধ ছিল সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ। দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের মধ্যে সামরিক সংঘাতের ফলে এই যুদ্ধের সূত্রপাত।

যদিও প্রতিদ্বন্দ্বী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির স্বার্থে এই যুদ্ধের আরম্ভ, কিন্তু এই সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির মধ্যেই এই যুদ্ধ সীমাবদ্ধ থাকে নাই। ক্রমশ এই যুদ্ধে পৃথিবীর প্রতিটি বৃহৎ শক্তি এবং ত্রিশটি দেশ জড়িয়ে পড়েছিল। পৃথিবীতে এমন কোন দেশ ছিল না যার গায়ে প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে এই যুদ্ধের ছোঁয়াচ লাগে নাই। সেই দিক থেকে এটি ছিল সত্যই বিশ্বযুদ্ধ।

পৃথিবীতে এত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ পূর্বে আর ঘটে নাই। এই যুদ্ধে ৬ কোটি লোক যোগদান করেছিল। প্রায় এক কোটি লোক এই যুদ্ধে প্রাণদান করেছিল। প্রায় তিন কোটি লোক আহত, বন্দী অথবা নিখোঁজ হয়েছিল। যারা যুদ্ধে যোগ দেয় নাই এমনি ধরনের অসামরিক লোকেরা দলে দলে প্রাণ হারিয়েছিল। বহু শহর, বিশ্ববিদ্যালয় ও মিউজিয়াম ভস্মীভূত হয়েছিল।

অস্ত্র-সজ্জার দিক থেকেও এই মহাযুদ্ধ পূর্বের সমস্ত যুদ্ধকে হার মানিয়েছিল। জলে, স্থলে, আকাশে সর্বত্র যুদ্ধ চলেছিল নতুন কায়দায়। স্থলে ট্রেঞ্চ-যুদ্ধ (trench warfare) চলেছিল। জলে চলেছিল সাবমেরিন (Submarine) যুদ্ধ। আর আকাশে চলেছিল বিমান যুদ্ধ (aerial warfare)। আকাশ থেকে বোমা ও বিষাক্ত গ্যাস নিক্ষেপ করা হয়েছিল। কি রক্তক্ষয়ে, কি অর্থব্যয়ে, কি বীভৎসতায় এই যুদ্ধ পূর্বের সমস্ত যুদ্ধকে অতিক্রম করেছিল।

প্রথম মহাযুদ্ধের ফলাফল
[Results of the First World War]

প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানীর পরাজয় ইওরোপের রাজনীতিতে নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি করল।

গণতন্ত্রের জয়লাভ

জার্মানীর পরাজয়ে জার্মানীতে গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। জার্মানীর পরাজয়ের জন্য কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম এবং তাঁর সমরবাদী মনোভাবই দায়ী বলে সাব্যস্ত করা হল। সমগ্র জার্মানীতে গণতন্ত্রের দাবিতে কাইজার-বিরোধী বিপ্লব আরম্ভ হল। এই বিপ্লবের সম্মুখীন হয়ে কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম সিংহাসন ছেড়ে পলায়ন করলেন। জার্মানীতে গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি ক্ষমতা দখল করল। তারা জার্মানীতে রাজতন্ত্রের বিলোপ সাধন করে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করল।

জার্মানীতে কাইজারের পতন: প্রজাতান্ত্রিক সরকারের প্রতিষ্ঠা

জার্মানীর পরাজয় ছিল অস্টিয়ারও পরাজয়। তাই অস্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যের মধ্যেও বিপ্লবী শক্তিগুলি জেগে উঠল। অস্টিয়া-সাম্রাজ্যের মধ্যে বিভিন্ন

অস্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যে ভাঙন—অস্ট্রিয়া প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা

জাতির লোক বাস করত। এখন তারা সুযোগ বুঝে একে একে অস্ট্রিয়ার আধিপত্য থেকে নিজেদের মুক্ত বলে ঘোষণা করল। হাঙ্গেরী অস্ট্রিয়ার আধিপত্য অস্বীকার করে একটি স্বাধীন প্রজাতন্ত্র গঠন করল। তেমনি পোল্যাণ্ড, চেকোস্লাভেকিয়া প্রভৃতিও অস্ট্রিয়ার আধিপত্য থেকে নিজেদের মুক্ত করে স্বাধীন প্রজাতন্ত্র স্থাপন করল। অস্ট্রিয়াতেও গণবিপ্লবের ফলে প্রজাতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হল।

এশিয়ায় জাতীয় জাগরণ

প্রথম মহাযুদ্ধ শুধু ইওরোপের জনগণের মনে মুক্তি, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের প্রেরণা জাগিয়ে তোলে নাই, এশিয়ার জনগণের মধ্যেও নবজাগরণ আনয়ন করেছিল। স্বৈরাচারী শাসনের জন্য কুখ্যাত তুরস্কেও জাতীয় আন্দোলন আরম্ভ হল এবং জাতীয় বিপ্লবের ফলে তুরস্কে প্রজা-তান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হল। শুধু তুরস্কে নয়, পারস্যে, মিশরে, চীনে, ইন্দোচীনে এবং ভারতবর্ষে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলল।

রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রের জয়লাভ : সমাজতন্ত্রের আকর্ষণ

প্রথম মহাযুদ্ধের ফলে ধনতন্ত্র সম্পর্কে মানুষের বিশ্বাস মন্দীভূত হল। রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হওয়ায় ধনতন্ত্রের বদলে সমাজতন্ত্র নামে নতুন একটি আদর্শ জনসাধারণের মনে আলোড়ন সৃষ্টি করল। রাশিয়ার সাফল্যের প্রেরণায় পৃথিবীর দেশে দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আয়োজন চলতে থাকল।

গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্রের শক্তিবৃদ্ধি—এই তিনটি হল প্রথম মহাযুদ্ধের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ফল।

প্যারিসের শান্তিচুক্তি, ১৯১৯-২০
[The Paris Peace Settlement]

প্যারিস শান্তি-সম্মেলনের নেতৃবৃন্দ

১৯১৯ খ্রীঃ ১৮ই জানুয়ারী তারিখে প্যারিস শহরে শান্তি বৈঠকের অধিবেশন আরম্ভ হয়। এই সম্মেলনে যে চারিটি প্রধান শক্তি নেতৃত্ব করেছিল তারা হল : ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও ইতালী। ইংলণ্ডের পক্ষে **লয়েড জর্জ** (Lloyd George), ফ্রান্সের পক্ষে **ক্লিমেনশ** (Clemenceau),

আমেরিকার পক্ষে **উড্রো উইলসন** (Widrow Wilson) এবং ইতালীর পক্ষে **অরল্যাণ্ডো** (Orlando) এই সম্মেলন পরিচালনা করেন।

প্যারিস শান্তি সম্মেলনের নীতি

ভিয়েনা কংগ্রেসে (১৮১৪-১৫ খ্রীঃ) যেমন বিজয়ীরা নিজেদের স্বার্থ অনুযায়ী নতুন রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন, তেমনি প্যারিস শান্তি চুক্তিতেও বিজয়ীদের স্বার্থবুদ্ধি প্রাধান্য লাভ করেছিল। ভিয়েনা কংগ্রেসের নেতারা যেমন কতকগুলি বড় বড় নীতি-কথার আড়ালে নিজেদের স্বার্থ সুরক্ষিত করেন, তেমনি এখনও বিজয়ীরা অনেক উচ্চ উচ্চ আদর্শ নিয়ে বাগাড়ম্বর করলেন। তাঁরা গণতন্ত্র ও জাতীয়তার প্রতি তাঁদের আনুগত্যের কথা সজোরে ঘোষণা করলেন। উড্রো উইলসন চতুর্দশ দফা সম্বলিত একটি স্মারকলিপি (Fourteen Points) সম্মেলনের সামনে পেশ করলেন। এই স্মারকলিপিটি সম্মেলনের কাজের গতি নির্দেশে, বিশেষ করে, পৃথিবীতে শান্তি রক্ষার ব্যবস্থা অবলম্বনে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল।

উড্রো উইলসনের চতুর্দশ দফা স্মারকলিপি

প্যারিসের শান্তি চুক্তি কয়েকটি অংশে বিভক্ত যেমন :—(১) ভার্সাইয়ের সন্ধি, (২) সেণ্ট জার্মাইনের সন্ধি, (৩) নিউলির সন্ধি, (৪) ট্রিয়াননের সন্ধি ও (৫) সেভার্সের সন্ধি।

(১) **ভার্সাইয়ের সন্ধি (Treaty of Versailles) :** পরাজিত জার্মানী ও বিজয়ীদের মধ্যে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল সেটি ভার্সাই সন্ধি বলে বিখ্যাত। এই সন্ধির শর্তানুযায়ী জার্মানী ফ্রান্সকে অ্যালসেস লোরেন, বেলজিয়ামকে ইউপেন ও মেমেডি, মিত্র শক্তিদের ব্যবহারের জন্য বলটিক সাগরস্থ মেমেল বন্দরটি, পোল্যাণ্ডকে পোজেন এবং পশ্চিম প্রাশিয়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হল। তাছাড়া, জার্মানীকে তার উপনিবেশগুলির উপর অধিকার থেকেও বঞ্চিত করা হল। চীন, শ্যাম, সাইবেরিয়া, মরক্কো, মিশর ও তুরস্কের উপর তার যে সমস্ত বিশেষ অধিকার ছিল তাও তাকে ত্যাগ করতে হল। প্যোলাণ্ডের ড্যানজিগকে একটি স্বাধীন বন্দর বলে ঘোষণা করা হল। জার্মান অধিবাসী অধ্যুষিত সার অঞ্চলকে আন্তর্জাতিক তত্ত্বাবধানে রাখা হল এবং এই অঞ্চল থেকে ফ্রান্সকে কয়লা সংগ্রহের অধিকার দেওয়া হল।

উপরোক্ত শাস্তি ছাড়া জার্মানীকে বড় বড় যুদ্ধজাহাজগুলি ব্রিটেনের

হাতে সমর্পণ করতে বাধ্য করা হল। জার্মানীর পক্ষে এক লক্ষের বেশী সৈন্য রাখা নিষিদ্ধ হল।

জার্মানীকে যুদ্ধের দায়িত্ব স্বীকার করতে বাধ্য করা হল এবং জার্মানী যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রচুর অর্থ বিজয়ী শক্তিদের দিতে স্বীকৃতি জানাল।

(২) সেন্ট জার্মাইনের সন্ধি (Treaty of St. Germain) : পরাজিত অস্ট্রিয়া ও বিজয়ীদের মধ্যে এই সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এই সন্ধির শর্তানুযায়ী অস্ট্রিয়া ইতালীকে দক্ষিণ টাইরল, চারসো ও সুসান দ্বীপ, যুগোশ্লোভিয়াকে বসনিয়া ও হের্জেগভিনা, চেকোশ্লোভেকিয়াকে বোহেমিয়া, মোরাভিয়া, অস্ট্রিয়ান সাইলেশিয়া এবং রুমানিয়াকে বুকোভিনা ছেড়ে দিতে বাধ্য হল। অস্ট্রিয়ার পক্ষে ত্রিশ হাজারের বেশী সৈন্য রাখা নিষিদ্ধ হল।

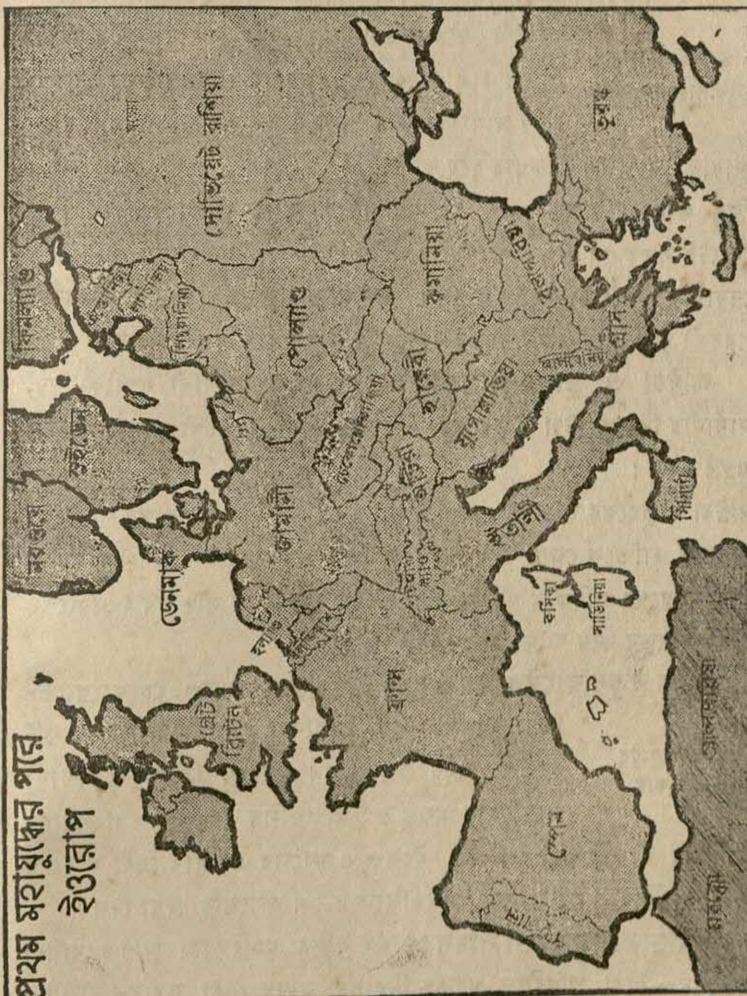
(৩) নিউলির সন্ধি (Treaty of Neuilly) : বুলগেরিয়া ও বিজয়ীদের মধ্যে এই সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এই সন্ধি অনুযায়ী বুলগেরিয়া গ্রীসকে ইজিয়ান উপকূলভাগ এবং যুগোশ্লোভিয়াকে ম্যাসিডোনিয়ার একটি অংশ ছেড়ে দিতে বাধ্য হল।

(৪) ট্রিয়াননের সন্ধি (Treaty of Trianon) : হাঙ্গেরী ও বিজয়ীদের মধ্যে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এই সন্ধি অনুযায়ী হাঙ্গেরী রুমানিয়াকে ট্রানসিলভানিয়া, যুগোশ্লোভিয়াকে ক্রোসিয়া, চেকোশ্লোভেকিয়াকে শ্লোভাক অঞ্চল ছেড়ে দিতে বাধ্য হল।

(৫) সেভার্সের সন্ধি (Treaty of Sevres) : পরাজিত তুরস্ক ও বিজয়ীদের মধ্যে এই সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়েছিল ; এই সন্ধি অনুযায়ী তুরস্ক সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, মেসোপটেমিয়া ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল। মিশরের উপর তুরস্কের যে আধিপত্য ছিল তাও তুরস্ক ত্যাগ করতে বাধ্য হল। পরে তুরস্ক সেভার্সের সন্ধির অপমানকর শর্তগুলি অস্বীকার করেছিল এবং লুসানের সন্ধি অনুযায়ী সম্মানজনক শর্তের ভিত্তিতে নতুন করে তুরস্কের সঙ্গে মিত্রশক্তিদের সম্পর্ক নির্ধারিত হয়েছিল।

প্যারিস শান্তিচুক্তি ও ভার্সাই সন্ধির সমালোচনা
[Criticism of Paris Peace Settlement and Treaty of Versailles]

জার্মানী সম্পর্কে ব্যবস্থা : সম্মেলনের প্রথম কাজ হল—পরাজিত


প্রথম মহাযুদ্ধের পরে
ইওরোপ
সোভিয়েট রাশিয়া
পোল্যাণ্ড
রুমানিয়া
জার্মানী
ডেনমার্ক
ফ্রান্স
স্পেন
ইতালী
সিসিলি
কর্সিকা
সার্ডিনিয়া
তুরস্ক
গ্রেট ব্রিটেন
ফিনল্যাণ্ড
সুইডেন
নরওয়ে
হাঙ্গেরী
চেকোস্লোভাকিয়া
যুগোস্লাভিয়া
বুলগেরিয়া
গ্রীস
আলবেনিয়া
আলজিরিয়া
মরক্কো
পর্তুগাল

জার্মানী সম্পর্কে প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা। জার্মানীর নৌ-বাহিনী ভেঙে দেওয়া হল। তার সেনাবাহিনীর সংখ্যা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হল। সমস্ত উপনিবেশ কেড়ে নেওয়া হল। জার্মানীর কাছ থেকে প্রভূত অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে আদায় করা হল। নিরুপায় হয়ে জার্মানী এই সমস্ত কঠোর শর্ত মেনে নিল। কিন্তু জার্মানী সম্পর্কে এই ধরনের প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা মোটেই সঙ্গত হয় নাই। জার্মানীর অধিবাসীরা এই অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। জার্মানীর এই প্রতিশোধের আকাঙ্ক্ষা পরবর্তী যুগে আর একটি বৃহত্তর মহাযুদ্ধের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

জার্মানী সম্পর্কে প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা

অষ্ট্রিয়া ও তুরস্ক সম্পর্কে ব্যবস্থা : শুধু জার্মানী সম্পর্কেই নয়, জার্মানীর মিত্র অস্ট্রিয়া ও তুরস্কের সম্পর্কেও এই প্রতিশোধমূলক আচরণ অনুষ্ঠিত হল।

অস্ট্রিয়া ও তুরস্কের সাম্রাজ্য ভেঙে দেওয়া হল। অস্ট্রিয়া ও তুরস্কের সাম্রাজ্যে যে সমস্ত জাতিকে জোর করে অন্তর্ভুক্ত করে রাখা হয়েছিল, তাদের ক্ষেত্রে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করে নেওয়া হল। এই সন্ধি পূর্ব ইওরোপের মানচিত্র নতুন করে অঙ্কিত করল।

নতুন নতুন রাষ্ট্রের জন্ম : পূর্ব ইওরোপে পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভেকিয়া, যুগোশ্লোভিয়া, রুমানিয়া, হাঙ্গেরী প্রভৃতি কয়েকটি স্বাধীন রাষ্ট্রের উদ্ভব হল। অবশ্য, ব্রিটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত জাতিগুলির ক্ষেত্রে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করা হল না। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের এই স্বার্থান্বেষী আচরণে ভারতে, চীনে ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে দারুণ অসন্তোষ দেখা দিল।

আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার

স্বেচ্ছাতন্ত্রের ধ্বংস সাধন : এই সন্ধির রচয়িতারা আরও ঘোষণা করলেন—তাঁরা পৃথিবীতে গণতন্ত্র নিরাপদ করার চেষ্টা করবেন ("The world must be made safe for democracy")।

এই নীতি অনুযায়ী তাঁরা জার্মানী ও অস্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যে স্বেচ্ছাতন্ত্রের (জার্মানীতে ও অস্ট্রিয়াতে দুটি রাজবংশ শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন) যে প্রাধান্য ছিল তা বিনষ্ট করলেন। অস্ট্রিয়ায়, জার্মানীতে, তুরস্কে প্রজাতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হল। তবে গণতন্ত্রের অধিকার সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হল না।

গণতন্ত্রের বিস্তার

জার্মানীতে প্রজাতন্ত্রের প্রবর্তন হলেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্য, ফরাসী সামাজ্য প্রভৃতি আগের মতই স্বৈরতন্ত্রের ভিত্তিতেই পরিচালিত হতে থাকল।

যুদ্ধ রোধের চেষ্টা

লীগ অব নেশনস্ঃ সর্বশেষে ভার্সাই সন্ধি পৃথিবীতে যুদ্ধের সম্ভাবনা রোধ করার জন্য এবং জাতিতে জাতিতে বিরোধ শান্তিপূর্ণ উপায়ে মীমাংসার জন্য **লীগ অব নেশনস্** (League of Nations) গঠন করল। কিন্তু লীগ অব নেশনসের উপর প্রথম থেকেই ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির প্রাধান্য থাকায় এই প্রতিষ্ঠানটি নিজ উদ্দেশ্য সাধনে অক্ষম হল।

ভার্সাই সন্ধির রচয়িতারা অনেক ভাল কথা বললেও তাঁরা নিজেরাই ঘোষিত নীতি অনুযায়ী না চলায় এই সন্ধির কার্যাবলী স্থায়ী হয় নাই। মাত্র কুড়ি বছরের মধ্যে আর একটি মহাযুদ্ধে লেগে যাওয়ায় এই সন্ধির ব্যর্থতা প্রমাণিত হয়ে গেল।

একাদশ অধ্যায়

লীগ অব নেশনস্

(League of Nations)

লীগ অব নেশনসের সৃষ্টি হয়েছিল ১৯১৯ খ্রীঃ প্যারিশ শান্তি সম্মেলনে। প্রথম মহাযুদ্ধের বীভৎসতা, যুদ্ধকালীন নিষ্ঠুরতা ও নরহত্যা মানুষের মনে শান্তি স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা নতুন করে জাগিয়ে তোলে। দুনিয়ার কোটি কোটি লোকের শান্তির জন্য এই আকুলতাকে উপেক্ষা করা বিজয়ী রাষ্ট্রপ্রধানদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। তাই শান্তির দাবির প্রতি তাঁদের সমর্থন জানাতে হয়েছিল। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসন তাঁর "চৌদ্দ দফা"র (fourteen points) মধ্যে এই লীগের কথাটি অন্তর্ভুক্ত করেন।

লীগ অব নেশনসের উৎপত্তি

লীগ অব নেশনস্ গঠন করা হয়েছিল যুদ্ধ বন্ধ করার উদ্দেশ্য নিয়ে। স্থির হয়েছিল, কোন বিষয়ে আন্তর্জাতিক বিরোধ উপস্থিত হলে লীগ আলাপ আলোচনার মধ্যে দিয়ে এই বিবাদের মীমাংসা করবে। কেউ লীগ অব নেশনশের আদেশ অমান্য করলে তার সঙ্গে বাণিজ্য বন্ধ করবে। তাকে অবরোধ করার এবং তার বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করার অধিকারও লীগকে দেওয়া হয়েছিল।

লীগ অব নেশনসের লক্ষ্য

লীগের সভ্য হবার অধিকার পেয়েছিল প্রথম মহাযুদ্ধে বিজয়ী রাষ্ট্রগুলি এবং এই যুদ্ধে যে রাষ্ট্রগুলি নিরপেক্ষ ছিল তারা। পরে বিজিত রাষ্ট্রগুলিকেও লীগে যোগ দেবার অধিকার দেওয়া হয়। আমেরিকা কখনও লীগে যোগ দেয় নাই। জার্মানী, ইটালী ও জাপান যোগ দিলেও পরে তারা লীগ পরিত্যাগ করে।

লীগ অব নেশনসের সদস্য

লীগের কার্যস্থল ছিল সুইজারল্যাণ্ডের অন্তর্গত জেনেভা শহর। লীগ অব নেশনস্সের একটি সুনির্দিষ্ট গঠনতন্ত্র ছিল। লীগের কাজকর্ম পরিচালনার জন্য তিনটি প্রতিষ্ঠান ছিল— (১) সাধারণ সভা। (Assembly), (২) পরিষদ (Council), (৩) সম্পাদকীয় দপ্তর (Secretariat)। হেগ সহরে লীগের অধীনে একটি বিশ্ব আদালত (World Court) ছিল। এই আদালতে জাতিতে জাতিতে বিবাদ উপস্থিত হলে বিচার করা হত। তাছাড়া পশ্চাৎপদ দেশে শ্রমিক কল্যাণ সাধনের জন্য লীগের অধীনে একটি

আন্তর্জাতিক শ্রমিক সঙ্ঘ (International Labour Organisation বা সংক্ষেপে ILO) স্থাপিত হয়েছিল।

প্রথম দিকে লীগ শ্রমিককল্যাণে এবং আন্তর্জাতিক বিরোধ মীমাংসার কাজে কিছু কিছু প্রশংসনীয় উদ্যম দেখিয়েছিল।

প্রথম দিকে কয়েকটি আন্তর্জাতিক বিবাদ শান্তিপূর্ণ উপায়ে মীমাংসা করতে লীগ সক্ষম হয়েছিল। যেমন, ফিনল্যাণ্ড ও সুইডেনের বিবাদ, গ্রীস ও বুলগেরিয়ার বিবাদ, পোলাণ্ড ও জার্মানীর বিবাদ লীগ শান্তিপূর্ণ উপায়ে মীমাংসা করতে সক্ষম হয়েছিল।

লীগের ব্যর্থতা

কিন্তু বৃহৎ শক্তিগুলির মধ্যে যখনই বিবাদ বেধেছে তখনই লীগ মীমাংসা স্থাপনে ব্যর্থ হয়েছে। উদাহরণ হিসাবে, ফ্রান্স ও জার্মানীর বিবাদের কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। জার্মানী পরাজিত হলেও ফ্রান্সের কাছে ভয়ের কারণ হয়েছিল। কেন না কি জনসংখ্যায়, কি অর্থসম্পদে, কি শিল্পোন্নতিতে—পরাজিত জার্মানী ফ্রান্সের চেয়ে শক্তিশালী ছিল। তাই ফ্রান্স জার্মানী সম্পর্কে অত্যন্ত সন্দিহান ছিল। জার্মানীকে অর্থের দিক থেকে এবং রাজনৈতিক প্রতিপত্তির দিক থেকে বেকায়দায় ফেলার জন্য ফ্রান্স চেষ্টা করল। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ আদায়ের ব্যাপার নিয়ে ফ্রান্স ও জার্মানীর মধ্যে মতবিরোধ চরমে উঠল। জার্মানী ক্ষতিপূরণের টাকা যথাযথভাবে দিচ্ছে না—এই অজুহাতে ফ্রান্স জার্মানীর শিল্পোন্নত রূঢ়্ (Ruhr) অঞ্চল দখল করল।

জেনেভা প্রটোকল

ফ্রান্স ও জার্মানীর মধ্যে যখন এই ধরনের ঝগড়া চলছিল, সেই সময়ে ফ্রান্স লীগের কাছে অভিযোগ করল—লীগের সনদের অস্পষ্টতার সুযোগ নিচ্ছে জার্মানী। ফ্রান্স বলল—লীগের সনদটি সংশোধন করা প্রয়োজন; লীগের উচিত স্থির করা—আক্রমণ (aggression) কাকে বলে? কেউ আক্রমণকারী হলে তার বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে? ফ্রান্স উপরোক্ত দোষ সংশোধন করার জন্য একটি প্রস্তাব পেশ করল। এইটির উপর ভিত্তি করে 'জেনেভা প্রটোকল' (Geneva Protocol) নামে একটি প্রস্তাব রচিত হল এবং লীগের সদস্যদের মত দিতে বলা হল। কিন্তু ব্রিটেন এই 'জেনেভা প্রটোকলে' সম্মতি না জানাবার ফলে ফ্রান্সের প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

আগেই বলেছি, জার্মানীর কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়ের প্রশ্ন নিয়ে

বিশেষ করে ফ্রান্স ও জার্মানীর মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল। অবশেষে ১৯২৪ খ্রীঃ চার্লস ডজ (Charles Dawes) নামে জনৈক মার্কিন ব্যাঙ্ক-মালিকের চেষ্টায় এই বিবাদের একটি সাময়িক মীমাংসা সম্ভব হয়। স্থির হয়ঃ জার্মানী ক্ষতিপূরণের টাকা বাৎসরিক কিস্তিতে পরিশোধ করবে।

ডজ প্লান

এর পরে ১৯২৫ খ্রীঃ জার্মানীকে আরও বাঁধাবাঁধির মধ্যে আনার উদ্দেশ্য নিয়ে জার্মানী ও বিজয়ী শক্তিগুলির মধ্যে কতকগুলি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এইগুলি লোকার্নো চুক্তি বলে পরিচিত। এই চুক্তি অনুযায়ী জার্মানী বৃহৎ শক্তি হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করল এবং জার্মানীকে লীগের স্থায়ী সদস্য হবার অধিকার দান করা হল। জার্মানী পূর্ব স্বাক্ষরিত সন্ধিগুলি মেনে চলার প্রতিশ্রুতি দান করল।

লোকার্নো চুক্তি

এর পরে ১৯২৮ খ্রীঃ ফরাসী বৈদেশিক মন্ত্রী ব্রিয়ার (Briand) এক প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রসচিব ফ্রাঙ্ক কেলগ (Frank Kallogg) প্রস্তাব করলেন—বৃহৎ শক্তিগুলি পৃথিবী থেকে যুদ্ধ বিতাড়ন করব—এই শপথ গ্রহণ করুক। এই মর্মে লীগের কর্তৃত্বে একটি চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়। এইটি কেলগ চুক্তি বলে পরিচিত। কেলগের প্রস্তাবটি ছিল একটি ফাঁকা সাধু-বাদের মত। কাজেই কারুর পক্ষেই এই কেলগ চুক্তি মানতে বাধা ছিল না। ইওরোপের বৃহৎ শক্তিগুলি এবং এশিয়ার সব চেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্র জাপান এই চুক্তি মেনে নেয়।

কেলগ চুক্তি

এর পরে ১৯৩২-৩৩ খ্রীঃ লীগের উদ্যোগে একটি নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন আহ্বান করা হয়েছিল। বৃহৎ শক্তিগুলির মধ্যে অস্ত্র-প্রতিযোগিতা ভয়ংকর স্তরে গিয়ে পৌঁছেছিল। ফ্রান্স ও জার্মানীর মধ্যে রেষারেষি সব চেয়ে তীব্র আকার ধারণ করেছিল। কিন্তু নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে এই রেষারেষি বন্ধ হয় নাই। জার্মানী এই সম্মেলন ত্যাগ করে চলে যায়। ফলে অস্ত্র-প্রতিযোগিতার সমস্যাটির সমাধানে লীগ ব্যর্থ হয়।

নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন

লীগ অব নেশনসের ব্যর্থতার কারণ (Causes of the Failure of the League of Nations)ঃ লীগ অব নেশন্স্ পৃথিবীতে শান্তি আনয়ন করতে ব্যর্থ হয়েছিল।

বস্তুত লীগের এই ব্যর্থতা ছিল অনিবার্য। লীগ কোনদিনই পৃথিবীর শান্তিকামী জনসাধারণের মতামতের প্রতিনিধিত্ব করে নি। লীগ ছিল বিজয়ী রাষ্ট্রগুলির কুক্ষিগত। বিজয়ী রাষ্ট্রগুলির স্বার্থ-দ্বন্দ্বের উর্ধ্বে উঠতে না পারায় লীগ দুনিয়ার জনমতের সমর্থন লাভ করতে পারে নি।

দুনিয়ার জনমতের সমর্থনলাভে ব্যর্থতা

একদল সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের কুক্ষিগত থাকায় লীগ আর একদল সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর চক্ষুঃশূল হয়েছিল। জার্মানী ও জাপান লীগে যোগ দিলেও যখন দেখল যে অপর সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য লীগকে ব্যবহার করছে, তখন তারা লীগ পরিত্যাগ করতে দ্বিধা করে নি। ১৯৩১ খ্রীঃ যখন জাপান মাঞ্চুরিয়া দখল করে তখন লীগ প্রতিবাদ করায় জাপান লীগ ত্যাগ করল। ১৯৩২-৩৩ খ্রীঃ ফ্রান্স জার্মানীর অস্ত্রশক্তি সীমাবদ্ধ করতে চাইলে জার্মানী লীগ ত্যাগ করল।

সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির কুক্ষিগত লীগ

লীগের ব্যর্থতার জন্য সব চেয়ে বেশী দায়ী প্রথম মহাযুদ্ধে বিজয়ী রাষ্ট্রগুলি (ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি)। কেন না বড় বড় সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি (ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি) নিজ নিজ স্বার্থ জলাঞ্জলি দিতে অস্বীকার করায় এবং লীগকে নিজেদের ক্ষমতালাভের যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে চেষ্টা করায় লীগের পক্ষে কোনও উল্লেখযোগ্য কাজ করা সম্ভব হয় নাই।

বরং এই রাষ্ট্রগুলির প্রভাবে লীগ জার্মানী, ইতালী ও জাপানের আক্রমণাত্মক কাজকর্মে বাধা না দিয়ে আপোস-নীতির আনুকূল্য করেছিল। ইতালী যখন আবিসিনিয়া আক্রমণ করে (১৯৩৫ খ্রীঃ) তখন লীগ নিষ্ক্রিয় থাকল। জাপান যখন চীন আক্রমণ করল (১৯৩৭ খ্রীঃ) তখনও লীগ নিষ্ক্রিয় হয়ে রইল। ইতালী যখন স্পেনে হস্তক্ষেপ করল (১৯৩৬-৩৮ খ্রীঃ) এবং জার্মানী যখন চেকোশ্লোভাকিয়া দখল করল (১৯৩৮ খ্রীঃ) তখনও লীগের নিষ্ক্রিয়তা বন্ধ হল না। ফলে, লীগের প্রতিপত্তি দিন দিন হ্রাস পেতে লাগল। অবশেষে যখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হল, তখন জগদ্বাসী দেখল যে লীগ বিশ্বশান্তি অক্ষুণ্ণ রাখার কাজে একেবারেই অক্ষম হয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লীগের অপমৃত্যু ঘটল।

ফ্যাসিস্ট আক্রমণাত্মক যুদ্ধের সময়ে লীগ অব নেশনসের নিষ্ক্রিয়তা

লীগ অব নেশনসের অপমৃত্যু

দ্বাদশ অধ্যায়

রুশ বিপ্লব

(The Russian Revolution)

প্রথম মহাযুদ্ধ যখন আরম্ভ হয় তখন রাশিয়ায় জারতন্ত্র প্রচলিত ছিল। কিন্তু যুদ্ধের মধ্যে রাশিয়ার ভিতরে এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন দেখা দেয়। এই পরিবর্তনটি ইতিহাসে রুশ বিপ্লব বলে পরিচিত।

কার্ল মার্কস ও সমাজতন্ত্র

[Karl Marx and Socialism]

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী দেশে যেমন এক যুগান্তকারী বিপ্লব ঘটেছিল, সেই রকমের আর এক যুগান্তকারী বিপ্লব ছিল এই রুশ বিপ্লব। ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব যেমন শুধু ফ্রান্সেই সীমাবদ্ধ ছিল না, তেমনি রুশ বিপ্লবও শুধু রাশিয়ায় নয়, সারা পৃথিবীর নির্যাতিত জনসাধারণের সামনে এক নতুন দিগন্ত উন্মুক্ত করল।

ফরাসী বিপ্লবের পশ্চাতে যেমন এক বিপ্লবী ভাবধারার প্রভাব ছিল, রুশ বিপ্লবের পশ্চাতেও সেইরূপ এক নতুন ধরনের যুগোপযোগী ভাবধারার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ফরাসী বিপ্লবের পশ্চাতে ছিল মন্টেস্কু, ভলতেয়ার, রুশো প্রভৃতি মনীষীদের অগ্রগামী ভাবধারা, আর রুশ বিপ্লবের পশ্চাতে ছিল কার্ল মার্কস প্রচারিত সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা।



কার্ল মার্কস্

কার্ল মার্কস ছিলেন জার্মানীর অধিবাসী। তিনি ১৮১৮ খ্রীঃ একটি ইহুদী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আইন, ইতিহাস ও বিজ্ঞানে শিক্ষালাভ করে পণ্ডিত হিসাবে

বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। কিন্তু তাঁর বিপ্লবী ভাবধারার জন্য তিনি জার্মানীর কর্ণধারদের বিষনজরে পড়লেন। দেশ থেকে নির্বাসিত হয়ে তিনি প্যারিসে এসে বসবাস করতে লাগলেন। কিন্তু প্যারিসের কর্ণধারগণও তাঁর চিন্তাধারা পছন্দ করল না। অবশেষে তিনি ইংলণ্ডে এসে বাস করতে লাগলেন। এখানে এসে তিনি আর একজন জার্মানবাসীর সঙ্গে পরিচয় লাভের সুযোগ পেলেন। তিনি হলেন **ফ্রেডারিক এঙ্গেলস**। এঙ্গেলস ইংলণ্ডেই বসবাস করতেন। মার্কস ও এঙ্গেলসের মধ্যে এই যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হল তা তাঁদের জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অক্ষয় হয়ে রইল।

কার্ল মার্কসের পরিচয়

ফ্রেডারিক এঙ্গেলস

ইংলণ্ড ছিল কার্ল মার্কসের যোগ্য কর্মক্ষেত্র। এখানে বসবাসকালে তিনি স্বচক্ষে দেখলেন যে শিল্প বিপ্লবের ফলে ইংলণ্ডে বড় বড় কারখানা গড়ে উঠেছে বটে, কিন্তু এই কারখানাগুলির মালিকানা রয়েছে মুষ্টিমেয় ধনকুবেরের অধিকারে। যাদের রক্তে ও পরিশ্রমে এই অপর্যাপ্ত ধনের উৎপত্তি সেই অগণিত শ্রমিক পশুর মত দিন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছে। এই ব্যবস্থার তীব্র নিন্দা করে তিনি একখানি পুস্তক লিখলেন। এই পুস্তকখানির নাম **ক্যাপিটাল** (Das Kapital)। এই পুস্তকে তিনি যে শুধু ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সমালোচনা করলেন তাই নয়। তিনি ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্তর্বিরোধ ও অবক্ষয়ের চিহ্নগুলি শ্রমিকদের সামনে উপস্থাপিত করলেন। শ্রমিকদের সংঘশক্তির অতুল সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করে দেখালেন যে এমন একদিন আসবে যখন শ্রমিকেরা সংগঠিত হতে শিখবে। এই সংগঠিত শ্রমিক শ্রেণী একটি সর্বজয়ী শক্তি হিসাবে আবির্ভূত হয়ে এই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার উচ্ছেদ সাধন করবে এবং সমাজের উপর নির্ধনদের কতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করবে।

মার্কস-লিখিত বিখ্যাত গ্রন্থ 'ক্যাপিটাল'

কার্ল মার্কসের 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থটি হল এই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বাইবেল। কার্ল মার্কস 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেষ্টো' নামে একখানি পুস্তিকায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিত শ্রমিক শ্রেণীর সামনে তুলে ধরলেন। এই পুস্তিকার শেষে ঘোষণা করা হল—দুনিয়ার শ্রমিক এক হও; এক শৃঙ্খল ছাড়া

'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো'

তোমাদের হারাবার ভয় নাই কিছুই। কিন্তু সারা পৃথিবীকে জয় করবার দায়িত্ব রয়েছে তোমাদের।

মার্কস-প্রচারিত মতবাদ

কার্ল মার্কসের উপরিলিখিত ভাবধারার নাম হল সমাজতন্ত্রবাদ। কার্ল মার্কসের আগেই কেউ কেউ (ইংলণ্ডের রবার্ট ওয়েন, ফ্রান্সের সেণ্ট সাইমন, ফুরিয়র প্রভৃতি) সমাজতন্ত্রবাদের একটি কল্পনা জগৎসমক্ষে হাজির করেছিলেন। কিন্তু কার্ল মার্কসই সর্বপ্রথম সমাজতন্ত্রবাদের একটি বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আবিষ্কার করলেন। তাঁর কাছে সমাজতন্ত্রবাদ কল্পনামাত্র ছিল না। কিভাবে সমাজতন্ত্রবাদের তত্ত্বটি বাস্তবে রূপায়িত করা যেতে পারে এই বিষয়টি তিনি জগৎসমক্ষে উপস্থিত করলেন।

কার্ল মার্কসের মতবাদকে কেবল কয়েকটি রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক ধারণার সমষ্টি মনে করলে ভুল হবে। মার্কসের মতবাদকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে নতুন এক জীবনদৃষ্টি (outlook of life)। তাই মার্কসের মতবাদের ভিত্তি সর্বদিকব্যাপী। মার্কসের মতবাদের প্রধানত তিনটি দিক—(১) মার্কসীয় দর্শন বা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ (Dialectical Materialism), (২) ইতিহাসের অভিনব ব্যাখ্যা যাকে বলা হয়ে থাকে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ (Historical materialism) ও (৩) মার্কসীয় অর্থনীতি বা মুনাফা-তত্ত্ব (Theory of Surplus Value)।

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ

(১) মার্কসীয় দর্শন (Dialectical materialism)—এই দর্শনের মূলকথা হল: প্রকৃতি নিত্য পরিবর্তনশীল, চিরবিকাশমান। আজ যা জীবন্ত বা সত্য, কাল তা মরণোন্মুখ ও পতনশীল। জীবন্ত আর মরণোন্মুখের মধ্যে সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে পৃথিবীতে নতুন সত্য উদ্ঘাটিত হয়; জীবন নতুনরূপে জন্মলাভ করে। মার্কসবাদীরা বিশ্বাস করে প্রকৃতির ভিতরকার এই ভাঙা-গড়া, এই জীবন-মৃত্যু, এই নিত্যদ্বন্দ্ব প্রত্যক্ষ জগতকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠছে; এই ভাঙা-গড়া কোন দেবতা বা অতিপ্রাকৃত বস্তুর কার্য নয়; এই ভাঙা-গড়ার সকল উপাদান এই পৃথিবীতে, আমাদের বাস্তব জীবনের মধ্যেই ছড়ানো রয়েছে। আজ যার বিশ্লেষণ দুঃসাধ্য মানুষের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের পরিধি বর্ধিত হলে কাল তা মানুষের অজানা নাও থাকতে পারে।

(২) মার্কসীয় ইতিহাস ব্যাখ্যা (Historical materialism)—মার্কসবাদীরা মনে করেন প্রকৃতিতে যেমন ভাঙা-গড়া ও বিকাশের নিয়ম রয়েছে, তেমনি মানবসমাজেরও ভাঙা-গড়া ও বিকাশের নিয়ম বর্তমান।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ

মার্কসবাদীরা ইতিহাসের মধ্যে দিয়ে মানবসমাজের ক্রম-অগ্রগতির সন্ধানলাভ করেছেন। প্রকৃতি-রাজ্যে যেমন ভাঙা-গড়া আছে, পুরানোকে বাদ দিয়ে নতুনের আত্মপ্রতিষ্ঠা আছে, মানবসমাজের বিবর্তনের ইতিহাসেও তেমনি ভাঙা-গড়া আছে, সমাজের একটি স্তরকে অতিক্রম করে আর একটি স্তরে উত্তরণ আছে। একটি স্তরে মানবসমাজ ছিল দাসসমাজ ; তারপরে দাসসমাজ ভেঙে মানুষ গড়ল সামন্ত-সমাজ ; সামন্তসমাজের মৃত্যুর পরে গড়ে উঠল ধনবাদী সমাজ। মার্কস প্রমাণ করলেন এই ধনবাদী সমাজও চিরন্তন নয়, আগের সমাজের মত এর পতনও অনিবার্য।

(৩) মুনাফা তত্ত্ব (Theory of Surplus Value)—ধনবাদী সমাজের কর্ণধারগণ যখন প্রচার আরম্ভ করলেন যে ধনবাদ পৃথিবীতে চিরস্থায়ী সমৃদ্ধি আনয়ন করবে, তখন মার্কস ধনবাদী সমাজের অন্তর্বিরোধ, বিশেষ করে ধনিক ও শ্রমিক বিরোধের মূল সূত্রটি আবিষ্কার করলেন। তিনি প্রমাণ করে দেখালেন—ধনবাদের যারা কবর খুঁড়বে তারা উপস্থিত—তারা শ্রমিক শ্রেণী। এই শ্রমিক শ্রেণীর অগ্রগতির মধ্যে তিনি পৃথিবীর মুক্তির সম্ভাবনা লক্ষ্য করলেন। তিনি বললেন, শ্রমিক শ্রেণী নিজেরা বঞ্চিত, তাই এই বঞ্চিতেরা যখন ক্ষমতা পাবে তখন পৃথিবী থেকে এক শ্রেণীর দ্বারা অপর শ্রেণীর বঞ্চনার ইতিহাস শেষ হবে।

মুনাফা তত্ত্ব

তাছাড়া, কার্ল মার্কস মনে করতেন তাঁর মতের কোনই মূল্য থাকবে না যদি তা দুনিয়ার সমাজ বিকাশের ধারাকে পরিবর্তন করে দিতে না পারে। সেইজন্য মার্কস শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে সর্বহারা বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরলেন। এই উদ্দেশ্যে সর্বহারা বিপ্লবের প্রথম মহড়া মার্কসের হাতেই প্রথম রূপ গ্রহণ করে। 'কমিউনিষ্ট ম্যানিফেস্টো' ছিল এই সর্বহারা বিপ্লবেরই পথ নির্দেশের জন্য রচিত খসড়া।

মার্কসবাদের ব্যবহারিক দিক

মার্কস ও এঙ্গেলসই সর্বপ্রথম সারা দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীকে নিয়ে একটি ঐক্যবদ্ধ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান সংগঠিত করেন (১৮৬৪ খ্রীঃ)। এই

প্রতিষ্ঠানটির নাম ছিল—'আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী সমিতি' (International Working-Men's Association)। মার্কস এই প্রতিষ্ঠানের ভিতর দিয়ে ইওরোপ ও আমেরিকায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব পরিচালিত করতে চেষ্টা করেছিলেন। ১৮৮৩ খ্রীঃ মৃত্যুর দিন পর্যন্ত কার্ল মার্কস এই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পুরোভাগে ছিলেন।

'আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী সমিতি'

রুশ বিপ্লবের কারণ

[Causes of Russian Revolution]

বিপ্লবের আগে প্রায় তিনশ বছর ধরে রাশিয়ায় জারতন্ত্র প্রচলিত ছিল। জারদের আমলে রাশিয়া ছিল একান্তভাবে পশ্চাদ্‌পদ একটি দেশ।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত রাশিয়ায় ভূমিদাস প্রথা (serfdom) প্রচলিত ছিল। এই প্রথা অনুযায়ী জমির মালিক ছিল ভূস্বামীরা। অধিকাংশ কৃষকের জমির উপরে স্বত্ব ছিল না। ভূমিদাসদের ভূস্বামীর জমিতে চাষ করতে হত। ভূমিদাস ছিল ভূস্বামীর সম্পত্তির অন্তর্গত। অর্থাৎ ভূস্বামীরা ভূমিদাসদের কিনতে পারত, বিক্রি করে দিতে পারত, ভূমিদাসদের নিয়ে বাজি ধরতে পারত, এমন কি তাদের হত্যা পর্যন্ত করতে পারত। দু চারজন কৃষক—যাদের দু এক খণ্ড জমি ছিল—তাদেরও ফসলের বেশীর ভাগই ভূস্বামীদের ঘরে তুলে দিয়ে আসতে হত। বলাই বাহুল্য, এই ভূমিদাসেরা ছিল অন্নহীন, বস্ত্রহীন, নিরক্ষর। জার ছিলেন ভূস্বামীদের নেতা। তাই ভূস্বামীদের স্বার্থেই রাষ্ট্র পরিচালিত হত।

ভূমিদাস প্রথা

জারকে বলা হত 'ভগবানের প্রতিনিধি'। জার যখন ভগবানের প্রতিনিধি তখন তাঁর সমস্ত কাজই ছিল সমালোচনার ঊর্ধ্বে। ভূস্বামীরা ও চার্চের পাদরীরা ভূমিদাসদের শেখাত যে জারের প্রতি তাদের সব সময়ে অনুগত থাকতে হবে।

স্বৈরতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা

ভূস্বামী ও চার্চের সাহায্য পাওয়ায় জার দেশে অবিমিশ্র স্বৈরতন্ত্র প্রবর্তন করেছিলেন। বেতের ভয় দেখিয়ে ভূমিদাসদের শায়েস্তা করা হত। সেনাবাহিনী ও গুপ্ত পুলিসের ভয় দেখিয়ে জার-বিরোধীদের কণ্ঠস্বর স্তব্ধ করে রাখা হত। এই সমস্ত উৎপীড়ন সত্ত্বেও যারা বিদ্রোহ করত তাদের জন্য সাইবেরিয়াতে প্রস্তুত ছিল নির্জন বন্দিনিবাস।

যেমন আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তেমনি বৈদেশিক নীতিতে রাশিয়ার জারেরা ছিলেন প্রতিক্রিয়ার স্তম্ভ। পশ্চিম ইওরোপের সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার বাণী যাতে পূর্ব ইওরোপে পরিব্যাপ্ত হতে না পারে সেদিকে ছিল তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। পূর্ব ইওরোপের দেশগুলিতে রুশ সাম্রাজ্য বিস্তার করে সেখানে রক্ষণশীল ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখা—এই ছিল জারের ঘোষিত নীতি।

কৃষকদের অবস্থা—কৃষকদের অবস্থা ছিল শোচনীয়। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত রাশিয়াতে ভূমিদাস প্রথা প্রচলিত ছিল। ১৮৬১ খ্রীঃ জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার ভূমিদাস প্রথা বিলোপ করে একটি আইন পাস করেন। এই আইনে ভূমিদাসদের মুক্তি দেওয়া হল বটে, কিন্তু তাদের জমি দেওয়া হল না। কাজেই কৃষকদের অসন্তোষ বন্ধ হল না। তাদের মনে প্রশ্ন জাগল—এ কি ধরনের মুক্তি? ("What then is this liberty?")

বুদ্ধিজীবীদের অবদান

কৃষকদের সমর্থনে ক্রমশ একদল বুদ্ধিজীবীও এগিয়ে এলেন। এঁদের রচনায় সমাজের অভিজাত শ্রেণীর অনাচার, এবং জনজীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হতে থাকল। রুশ দেশের বিখ্যাত দার্শনিক হেরজেন, ডব্রুলুবভ, চের্নিচেভেস্কি প্রভৃতি পাশ্চাত্য শিক্ষার আলো রাশিয়াতে প্রসারের চেষ্টা করলেন। পুস্কিন, টলস্টয়, তুর্গেনিভ, চেখভ, ডস্টটয়ভস্কি ও গোর্কির সাহিত্যে রুশদেশের গণমনের চিত্র প্রতিফলিত হল। এই সমস্ত রচনা রুশ দেশের জনসাধারণের মনে নতুন আশার সঞ্চার করল।

শ্রমিক আন্দোলনের প্রসার

উনবিংশ শতাব্দীর শেষে রাশিয়ায় শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে গণ-আন্দোলন আরম্ভ হল। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়াতে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে একটি বিপ্লব সংগঠিত হয়েছিল। এই বিপ্লব ব্যর্থ হল বটে, কিন্তু এই ঘটনাটি বৃহত্তর সংগ্রামের মহড়া হিসাবে জনসাধারণকে রাজনীতিজ্ঞানে শিক্ষিত করে তুলতে সাহায্য করল।

রাশিয়ার এই শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে দুটি ধারা বর্তমান ছিল। একটি সংস্কারপন্থী ধারা—এদের বলা হত **মেনশেভিক**। আর একটি ছিল বিপ্লববাদী ধারা—এদের বলা হত **বলশেভিক**। বলশেভিকদের নেতা ছিলেন লেনিন। বলশেভিকরা ছিলেন কার্ল মার্কসের শিক্ষায় দীক্ষিত।

লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক আন্দোলন জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে আমরণ সংগ্রামের শপথ গ্রহণ করল। তারা কার্ল মার্কসের প্রদর্শিত পথে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের একটি কর্মসূচী শ্রমিক আন্দোলনের সামনে উপস্থিত করল।

বিপ্লবের অন্যান্য কারণ

১৯১৪ খ্রীঃ প্রথম মহাযুদ্ধ বাধলে রাশিয়া ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি রাষ্ট্রের সঙ্গে মিলিত হয়ে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দিল। যুদ্ধে জারের সেনাপতিরা বারবার পরাজিত হওয়ায় জারতন্ত্রের শক্তি লোকচক্ষে একেবারে হেয় প্রতিপন্ন হল। তাছাড়া, যুদ্ধের সময়ে জনসাধারণকে অশেষ দুর্ভোগের সম্মুখীন হতে হল। ফলে, প্রতিবাদে শ্রমিকেরা কাজ বন্ধ করতে লাগল এবং গরীবেরা খাদ্যের জন্য দাঙ্গা-হাঙ্গামা করতে লাগল। সৈন্যেরা জারের আদেশ অমান্য করতে আরম্ভ করল। ক্রমে ক্রমে সমস্ত বিদ্রোহী শক্তি মিলে এক গণ-অভ্যুত্থান সৃষ্টি করল।

এই অভ্যুত্থানের মুখে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে ফেব্রুয়ারী তারিখে জার সিংহাসন পরিত্যাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন।

রুশ বিপ্লবের কাহিনী

(History of the Russian Revolution)

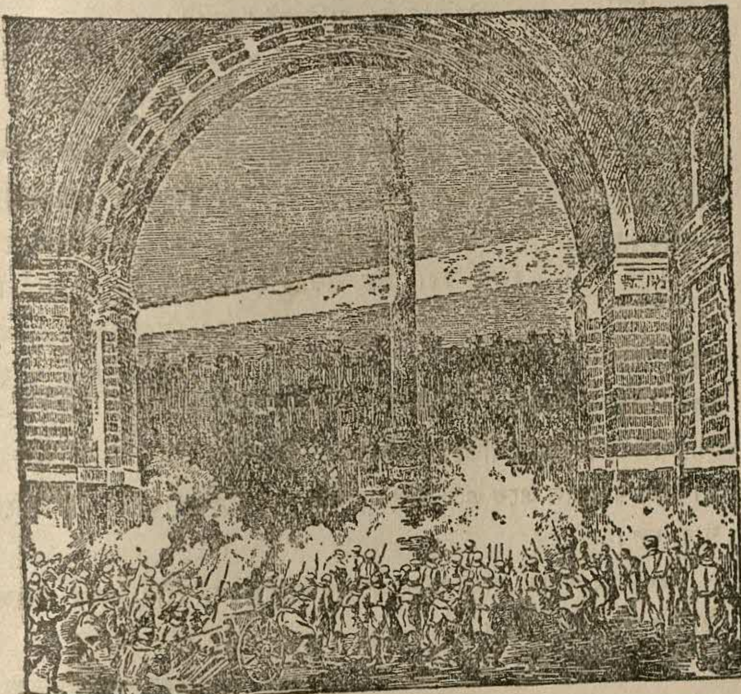
ফেব্রুয়ারী বিপ্লব

জারতন্ত্রের উচ্ছেদের পর মেনশেভিক নেতা **কেরেনস্কির** (Kerensky) নেতৃত্বে অস্থায়ী প্রজাতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হল। কিন্তু এই অস্থায়ী প্রজাতান্ত্রিক সরকার কোন সমস্যার সমাধান করতে পারল না। এই সরকার মহাযুদ্ধ থেকে সরে এসে জনসাধারণকে শান্তির পথ দেখাতে পারল না; গরীবের জীবিকার ব্যবস্থা হল না; জমির উপর কৃষকদের বহু আকাঙ্ক্ষিত মালিকানা স্বত্ব সাব্যস্ত হল না।

কাজেই জনসাধারণের বিক্ষোভ নির্বাপিত হল না। পেট্রোগ্রাদ ও অন্যান্য শহরে শ্রমিক ও কৃষকদের সোভিয়েট নামে স্থানীয় সভা ছিল। এই সভার মাধ্যমে তারা নিজেদের বিক্ষোভ ব্যক্ত করতে আরম্ভ করল।

এই সমস্ত সোভিয়েটে বলশেভিকরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ও অগ্রণী ছিল। বলশেভিকরাই জনসাধারণের দাবি-দাওয়া নিয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে একনিষ্ঠ সংগ্রাম চালিয়েছিল। কাজেই তারা ক্রমশ জনপ্রিয়তা অর্জন করল।

বলশেভিকদের নেতা লেনিন অস্থায়ী প্রজাতান্ত্রিক সরকারের অকর্মণ্যতা জনসাধারণের সম্মুখে তুলে ধরলেন এবং তাদের সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য আহ্বান জানালেন।



শীতপ্রাসাদ দখলের অভিযান

নভেম্বর বিপ্লব

বলশেভিকদের ক্ষমতা অধিকার

লেনিনের আহ্বানে শ্রমিকশ্রেণী, কৃষক ও সেনাবাহিনী অস্থায়ী প্রজাতান্ত্রিক সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে অগ্রসর হল। ১৯১৭ খ্রীঃ ৭ই নভেম্বর তারিখে আবার একটি গণ-অভ্যুত্থান আরম্ভ হল। ৭ই নভেম্বর তারিখে এই অভ্যুত্থানের মুখে অস্থায়ী প্রজাতান্ত্রিক সরকারের পতন হল। বলশেভিকরা ক্ষমতা দখল করলেন। নবগঠিত সরকারের প্রধান কর্মকর্তা হলেন লেনিন। ১৯১৭ খ্রীঃ ৭ই নভেম্বর তারিখে রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লব সাফল্যলাভ করেছিল বলে এই দিবসটি **রুশ বিপ্লব দিবস** হিসাবে স্মরণীয় হয়ে উঠেছে।

লেনিন ও সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র

বিপ্লবের সাফল্যের পরে বলশেভিকরা সমাজতান্ত্রিক আদর্শের ভিত্তিতে নতুন রুশ রাষ্ট্রটির প্রতিষ্ঠা করলেন। এই নবগঠিত রাষ্ট্রটির নাম হল সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র।

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের জন্ম

সমাজতান্ত্রিক আদর্শের ভিত্তিতে গঠিত সোভিয়েট রাষ্ট্রটি ধনতান্ত্রিক জগতের চক্ষুঃশূল হয়ে উঠল। জন্মের দিন থেকেই এই রাষ্ট্রটিকে শিশু অবস্থায় হত্যা করার ষড়যন্ত্র চলতে লাগল। প্রথমেই ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি রাষ্ট্র দেশের ভিতরে জারের যে অনুচরেরা অবশিষ্ট ছিল তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এই রাষ্ট্রটিকে হত্যা করার জন্য উদ্যোগী হল। এই সময়ে রাশিয়ায় এক ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ষড়যন্ত্রকারীরা এই দুর্ভিক্ষের পূর্ণ সুযোগ নিতে চেষ্টা করল। কিন্তু আক্রমণকারীদের ষড়যন্ত্র শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হল। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র নিজ শক্তিতে এই সমস্ত বাধা অতিক্রম করে আত্মপ্রতিষ্ঠ হয়ে উঠল। অবশেষে ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি পাশ্চাত্য রাষ্ট্রগুলি একে একে এই নবগঠিত রাষ্ট্রটিকে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হল।

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে পশ্চিমের ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির ষড়যন্ত্র ব্যর্থ

এইভাবে অসংখ্য বাধা অতিক্রম করে রাশিয়ায় পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উদ্ভব হল।

রুশ বিপ্লবের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কীর্তি হল একটি নবতর সমাজব্যবস্থার প্রবর্তন। সোভিয়েট বিপ্লব এমন একটি সমাজের পত্তন করল যেখানে শ্রেণীভেদ বলে কিছু নাই।

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের কার্যাবলী

এই নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে লেনিনের নেতৃত্বে সোভিয়েট সরকার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধন করলেন।

প্রথমেই তাঁরা শ্রমজীবী মানুষের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার দিকে মনোযোগ দিলেন। পুঁজিপতি ও জমিদারদের কল-কারখানা এবং জমির মালিকানা থেকে বঞ্চিত করা হল। শিল্প জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত হল। জনসাধারণের পক্ষ থেকে রাষ্ট্র এই জাতীয় সম্পত্তির পরিচালনা করতে আরম্ভ করল। জমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানাও চিরতরে অবলুপ্ত হল। এখন রাষ্ট্র এই জমি কৃষকদের মধ্যে ভাগ করে দিল।

শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ঘোষণা

শিল্প জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত

জাতি সমস্যার সমাধান

তাছাড়া, সোভিয়েট বিপ্লব রাশিয়ার জাতি-সমস্যারও সমাধান করল। জারের আমলে রুশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত অনেক জাতিই ছিল পরাধীন ও উৎপীড়িত। এই জাতিগুলি বিপ্লবের পরে স্বায়ত্তশাসনশীল প্রজাতন্ত্রের মর্যাদা লাভ করল। এই সকল স্বায়ত্তশাসনশীল প্রজাতন্ত্রের ইচ্ছামূলক যোগদানের ভিত্তিতে যে যুক্তরাষ্ট্র গড়ে উঠল তার নাম **সোভিয়েট ইউনিয়ন** (Union of Soviet Socialist Republics—U. S. S. R.)।

সোভিয়েটের বৈদেশিক নীতি

বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রেও সোভিয়েট রাশিয়া এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। ১৯১৭ খ্রীঃ বিপ্লবের পরে সোভিয়েট ইউনিয়ন সর্বপ্রথম যে আইনটি পাস করে সেটি হল **শান্তি আইন** (Decree of Peace)। রাশিয়া বিপ্লবের পরে প্রথম মহাযুদ্ধ থেকে অবসর গ্রহণ করে। কারণ বলশেভিকদের মতে এই যুদ্ধে জনসাধারণের কোন স্বার্থ ছিল না। তাই তারা ক্ষমতা পেয়েই জার্মানীর সঙ্গে একটি সন্ধি স্থাপন করে। এইটি **ব্রেস্ট লিটভ্স্কের** সন্ধি বলে পরিচিত।

শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান বৈদেশিক নীতির ভিত্তি

তাছাড়া, বলশেভিকরা ঘোষণা করল যে তারা সাম্রাজ্যবাদের বিরোধী। তাই তারা জারের আমলে রুশ সাম্রাজ্যের মধ্যে যে পরদেশগুলি অন্তর্ভুক্ত ছিল তাদের স্বাধীনতা ঘোষণা করল। ফিন্ল্যাণ্ড, মাঞ্চুরিয়া প্রভৃতিকে তারা রুশ দেশের আধিপত্য থেকে মুক্তিদান করল। তারপর থেকে রাশিয়া আগাগোড়াই আন্তর্জাতিক শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষা করার জন্য চেষ্টা করে এসেছে। 'লীগ অব নেশনস্'-এর আমলেও সোভিয়েট ইউনিয়ন আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষার জন্য বারবার উদ্যোগী হয়েছিল। শান্তি ও শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান—এই হল সোভিয়েট বৈদেশিক নীতির প্রধান ভিত্তি।

লেনিনের কৃতিত্ব

রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সর্বাগ্রগণ্য নেতা ছিলেন ভ্লাডিমির ইলিচ লেনিন (Vladimir Ilich Lenin)। তিনি ছিলেন একাধারে তাত্ত্বিক, রাজনীতিক ও সংগঠক। ১৮৭০ খ্রীঃ এক বিপ্লবী পরিবারে লেনিনের জন্ম হয়। তিনি ছাত্র জীবন থেকে বিপ্লবী আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন। পরবর্তী জীবনে তিনি মার্কস-

বাদী জীবন দর্শনকে গ্রহণ করেন এবং মার্কসবাদী জীবনদর্শন অনুযায়ী রাশিয়ার সমাজে মৌলিক পরিবর্তন আনার কাজে নিজের জীবন উৎসর্গ করেন। লেনিন শুধু রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক পার্টি) প্রতিষ্ঠাতা নন, তিনি বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনেরও নব পর্যায়ে প্রধান নেতা হয়ে ওঠেন।



ভি. আই. লেনিন

১৯১৭ খ্রীঃ রুশ বিপ্লবের সাফল্যের পর থেকে ১৯২৪ খ্রীঃ মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তিনি রুশ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রটির কর্ণধার ছিলেন এবং তাঁরই সুযোগ্য পরিচালনায় রুশ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রটি নব নব সাফল্যের মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে এক নতুন ইতিহাস রচনা করেছিল।

সোভিয়েট ইউনিয়নের অগ্রগতি (১৯২৪-১৯৩৯)
[The March of U. S. S. R. (1924-1939)]

সমাজতান্ত্রিক আদর্শে পরিচালিত এই রাষ্ট্রটি উত্তরোত্তর উন্নতির-পথে গিয়ে এক বিরাট শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে।

কতকগুলি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাহায্যে বেশ কয়েক বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমে লেনিনের সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের পরিকল্পনা কাজে প্রয়োগ করা সম্ভবপর হয়েছে।

লেনিন-পরবর্তী যুগে সোভিয়েট রাশিয়ার প্রধান পরিচালক হলেন **জোসেফ স্টালিন**। স্টালিন ছিলেন গরীবের ছেলে। নিজ প্রতিভাবলে তিনি বলশেভিক পার্টির অন্যতম প্রধান নেতার সম্মান লাভ করেন। তিনি লেনিনের নীতি অনুযায়ী রাশিয়া পরিচালনা করেন। তিনি বলতেন, 'লেনিনবাদ হল আজকের মার্কসবাদ' (Leninism is the Marxism of our day)। নীতিগত প্রশ্নে তাঁর সঙ্গে বলশেভিক পার্টির আর একজন প্রধান নেতা লিও

জোসেফ স্টালিন : অর্থনৈতিক পরিকল্পনা

ট্রট্স্কীর মতবিরোধ দেখা দেয়। ট্রট্স্কী বলতেন—সারা পৃথিবীতে কমিউনিস্ট বিপ্লব সংসাধন সবচেয়ে জরুরি কাজ। স্টালিন বলতেন—রাশিয়াতে বিপ্লবের কাজ প্রথম সম্পাদন করতে হবে এবং রাশিয়ার বিপ্লবের সাফল্য সারা দুনিয়ার বিপ্লবের দ্বার উন্মুক্ত করবে। স্টালিনের নীতিকে তাই বলা হয়—একদেশে সমাজতন্ত্রবাদ (Socialism in one country)।



জে. ভি. স্টালিন

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, স্টালিন লেনিনের নীতি অনুসরণ করলেন। বিপ্লবের পরে রাশিয়াকে কয়েকটি জটিল সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ১৯২১ খ্রীঃ দেশে এক ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। এই অবস্থায় লেনিন স্থির করেন যে রাশিয়ার অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য বিদেশী মুলধন আমন্ত্রণ করা প্রয়োজন। তাছাড়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলিকে তিনি ব্যবসায়ের সুযোগ দান করেন। কৃষকদের খোলা বাজারে তাদের উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রী করার অধিকারও দেওয়া হয়। লেনিন প্রবর্তিত উপরোক্ত অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে বলা হয় নতুন অর্থনৈতিক নীতি (New Economic Policy সংক্ষেপে—N. E. P)।

স্টালিন ক্ষমতালাভের পরে ১৯২৮ খ্রীঃ পর্যন্ত উপরি উক্ত নীতি বজায় রাখলেন। ১৯২৮ খ্রীঃ থেকে ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তিনি তিনটি অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রবর্তন করেন। এইগুলি হল: (১) প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯২৮-৩৩) (২) দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৩৩-৩৮), (৩) তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৩৮-৪৩)। স্টালিনের সুযোগ্য পরিচালনায় এই পরিকল্পনাগুলির সাফল্যের ফলে রাশিয়া হয়ে উঠেছে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পোন্নত দেশ। জারের আমলে রাশিয়া ছিল পশ্চাৎপদ দেশ। আর মাত্র কুড়ি বছরের মধ্যে এই পশ্চাৎপদ দেশটি আজ পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা উন্নত দেশ আমেরিকার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছে। এই কয়েক বছরের

রাশিয়ার অভূতপূর্ব শিল্পোন্নতি

মধ্যে রাশিয়ার ভারী শিল্পের, বিশেষ করে ইস্পাত শিল্পের অভাবনীয় উন্নতি হয়েছে।

কৃষির উন্নতি : যৌথ খামারের প্রবর্তন

এই পরিকল্পনাগুলির ফলে রাশিয়ায় কৃষিতেও দেখা দিয়েছে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন। জারের আমলে রাশিয়ায় কৃষিকার্য পরিচালিত হত মধ্যযুগীয় পন্থায়। খণ্ড খণ্ড জমি আর অনুন্নত যন্ত্রপাতি—এই ছিল রাশিয়ায় কৃষির উন্নতির পথে প্রধান বাধা। সোভিয়েট সরকার কৃষকদের মধ্যে যৌথভাবে কাজ করার সুবিধা তুলে ধরলেন। এবং প্রবর্তন করলেন কৃষির উন্নতির জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি। ট্রাক্টর ও অন্যান্য আধুনিক যন্ত্রপাতি প্রয়োগে ও যৌথ খামারের প্রবর্তনে রাশিয়ার গ্রামাঞ্চলের চেহারা বদলে গেল।

সাংস্কৃতিক বিপ্লব

তাছাড়া, এই পরিকল্পনাগুলিতে রাশিয়ায় একটি সাংস্কৃতিক বিপ্লব গড়ে তোলারও আয়োজন করা হল। জারের আমলে রাশিয়ায় শতকরা কুড়ি জন লোক লেখাপড়া জানত। আর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরে রাশিয়ায় প্রত্যেকটি নাগরিক যাতে লেখাপড়া শিখতে পারে তার ব্যবস্থা করা হল।

মধ্য এশিয়ার রাষ্ট্রগুলিতে অভূতপূর্ব উন্নতি

শিল্পে, কৃষিতে ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে শুধু যে রাশিয়ার অপেক্ষাকৃত উন্নত ইউরোপীয় অঞ্চলগুলিতেই এই বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখা গেল তা নয়, মধ্য এশিয়ার একান্ত পশ্চাৎপদ অঞ্চলগুলিতেও অভূতপূর্ব উন্নতি আরম্ভ হল। জর্জিয়া উজবেকিস্তান, কাজাকস্তান, তাজিকিস্তান, ট্রান্সককেশিয়া, সাইবেরিয়া প্রভৃতি অঞ্চলও ক্রমশ শিল্পে, কৃষিতে, সংস্কৃতিতে নবজীবন লাভ করল।

শান্তিপূর্ণ সহ অবস্থানের নীতি (Policy of peaceful co-existence) : বৈদেশিক নীতিতেও স্টালিন লেনিনের নীতি অনুসরণ করলেন। সোভিয়েট ইউনিয়নের পুনর্গঠন ও অগ্রগতির পক্ষে শান্তি ছিল একান্তভাবে প্রয়োজনীয়। পৃথিবীতে শান্তি অক্ষুণ্ন রাখার কামনা থেকেই সোভিয়েট ইউনিয়ন লীগ অব নেশন্‌সে যোগ দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। অবশেষে ১৯৩৪ খ্রীঃ রাশিয়াকে যখন লীগ অব নেশনসের সভ্যপদ দেওয়া হল তখন রুশ প্রতিনিধি লিট্‌ভিনভ জোরের সঙ্গে ঘোষণা করেন—ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র পাশাপাশি থাকবে, তাদের মধ্যে শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতা চলবে : এইটিই হল রাশিয়ার কাম্য।

কিন্তু পৃথিবীর বৃহৎ বৃহৎ ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি যেমন, ব্রিটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতি রাশিয়ার কমিউনিস্ট রাষ্ট্রটিকে একান্ত অবাঞ্ছিত বলে মনে করত। তারা নানাভাবে এই রাষ্ট্রটির উচ্ছেদ সাধনে উদ্যোগী হয়েছিল। কিন্তু যখন তারা দেখল যে রাশিয়ায় কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের জনপ্রিয়তা অবিসংবাদিত এবং ইচ্ছা থাকলেও রাশিয়া থেকে কমিউনিজম উৎখাত করার ক্ষমতা তাদের নাই, তখন তারা শেষ পর্যন্ত সোভিয়েট রাশিয়াকে কূটনৈতিক মর্যাদা দানে স্বীকৃত হল। ইংলণ্ড সোভিয়েট রাশিয়াকে ১৯২৪ খ্রীঃ স্বীকার করে নিল। ক্রমে ক্রমে আরও নয়টি ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রাশিয়াকে স্বীকার করে নেয়। অবশেষে ১৯৩৩ খ্রীঃ রাশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি রাশিয়াকে স্বীকৃতি দানের ফলে রাশিয়ার আন্তর্জাতিক মর্যাদা সমধিক বৃদ্ধি পায়। সোভিয়েট রাষ্ট্র ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতি রাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক বিস্তারে মন দেয়।

১৯৩৩ খ্রীঃ জার্মানীতে ফ্যাসি-বাদের অভ্যুদয়ের পরে ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার সঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্ক আবার তিক্ত হয়ে ওঠে। হিটলার কমিউনিষ্ট রাশিয়াকে দুনিয়ার পয়লা নম্বরের শত্রু বলে চিহ্নিত করেন। ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি হিটলারকে এই কাজে উৎসাহ দান করেন। এই অবস্থায়, আত্মরক্ষার প্রয়োজনে স্টালিন হিটলারের সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর করলে ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি হিটলার-তোষণকারীদের মনে ভীতির সঞ্চার হয়।

কিন্তু হিটলারের কাছে আন্তর্জাতিক চুক্তির কোন মূল্য ছিল না। ১৯৩৯ খ্রীঃ হিটলার ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ১৯৪১ খ্রীঃ অনাক্রমণ চুক্তি ভঙ্গ করে হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করেন। কিন্তু রুশ আক্রমণ হিটলারের ধ্বংস ডেকে এনেছিল। এই আক্রমণের বিরুদ্ধে সমস্ত রুশজাতি ঐক্যবদ্ধ আমরণ সংগ্রাম পরিচালনা করল এবং জার্মানীকে পরাজিত করে সোভিয়েট রাশিয়া শ্রেষ্ঠ ও শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে নিজের স্থান করে নিল।

মোট কথা, জারের আমলে, যে-রাশিয়া ছিল একটি অনগ্রসর দেশ, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ফলে সেই দেশই মাত্র পঁচিশ বছরের মধ্যে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেশে পরিণত হয়েছে। রুশ বিপ্লবের এটাই হল সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অবদান।

রুশ বিপ্লবের ঐতিহাসিক তাৎপর্য
[Historical Significance of The Russian Revolution]

পৃথিবীর ইতিহাসে রুশ বিপ্লব এক অনন্যসাধারণ ঘটনা। রুশ বিপ্লবের সঙ্গে একমাত্র ঐতিহাসিক ফরাসী বিপ্লবের তুলনা হতে পারে। ফরাসী বিপ্লব সমাজে গভীর আঘাত হেনেছিল, ফ্রান্স থেকে সামন্ততন্ত্র উৎখাত করে ধনতন্ত্রের উন্মেষের পথটি উদ্বোধন করেছিল। সামন্ততন্ত্র ভেঙ্গে ধনতন্ত্রের পথ প্রস্তুত করেছিল বলেই ফরাসী বিপ্লব ছিল সমাজ বিপ্লব ও আন্তর্জাতিক তাৎপর্যে পূর্ণ। পৃথিবীব্যাপী সামন্ততন্ত্রের যুগে ফরাসী বিপ্লবই ছিল সামন্ততন্ত্র-বিরোধী বিপ্লবের অগ্রদূত। কিন্তু ফরাসী বিপ্লবের একটি বড় ত্রুটি ছিল ফরাসী বিপ্লব ফ্রান্সে সামন্ততান্ত্রিক শোষণের জায়গায় ধনতান্ত্রিক শোষণকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। রুশ বিপ্লব এইদিক থেকে ফরাসী বিপ্লব থেকে স্বতন্ত্র। রুশদেশে ধনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। পৃথিবীব্যাপী ধনতন্ত্রের যুগে রুশ বিপ্লবই ধনতন্ত্রের দেউলে প্রথম ফাটল ধরিয়েছে। বস্তুত রুশ বিপ্লব পৃথিবীব্যাপী ধনতন্ত্র-বিরোধী বিপ্লবের অগ্রদূত।

রাশিয়ায় ধনতন্ত্র-বিরোধী আন্দোলনের সাফল্যের ফলে সমাজতন্ত্র জয়লাভ করেছে। সেখানে শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে : এইটিই হল রুশ বিপ্লবের প্রধান তাৎপর্য।

তাছাড়া, রুশ বিপ্লবের সাফল্য শুধু রাশিয়াতে নয় সমগ্র দুনিয়ায় নব প্রাণচাঞ্চল্য নিয়ে এসেছে।

রুশ বিপ্লবের প্রভাবে ইওরোপের যে সমস্ত দেশে ধনবাদী ব্যবস্থা রয়েছে সেই সব দেশে আরম্ভ হয়েছে ধনতন্ত্র-বিরোধী আন্দোলন, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রস্তুতি।

যে সমস্ত দেশ সাম্রাজ্যবাদ-পীড়িত তাদের কাছে রুশ বিপ্লব অফুরন্ত প্রেরণার উৎস হয়ে উঠেছে। এশিয়ার দেশে দেশে জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে রুশ বিপ্লবের মুক্তির বাণী নতুন আশার বার্তা বহন করে এনেছে।

রুশ বিপ্লব আজ পৃথিবীব্যাপী ধন-তান্ত্রিক ব্যবস্থার সামনে এক ঐতিহাসিক চ্যালেঞ্জ উপস্থিত করেছে—এই সত্যটি আজ কারুর পক্ষেই উপেক্ষা করা সম্ভব নয়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

প্রথম মহাযুদ্ধ থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ

[Between the two World Wars]

প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালে ইওরোপের ইতিহাসে তিনটি ঘটনা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য—

(১) ইতালীতে মুসোলিনীর আবির্ভাব,

(২) জার্মানীতে হিটলারের অভ্যুদয়, এবং

(৩) স্পেনে ফ্যাসিস্ট-বিরোধী গণতান্ত্রিক যুদ্ধ।

মুসোলিনী ও ইতালী

[Italy under Mussolini]

প্রথম মহাযুদ্ধ যখন আরম্ভ হল তখন ইতালী কোন পক্ষে যোগ না দিয়ে দুই পক্ষের কাছ থেকেই সুবিধা আদায়ের নীতি গ্রহণ করে। শেষে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে ইতালী ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের কাছে অধিকতর সুবিধা পাওয়ার আশা পোষণ করে তাদের পক্ষেই যুদ্ধে যোগ দেয়।

কিন্তু প্যারিস-সন্ধির শর্ত অনুযায়ী ইতালী মোটেই লাভবান হল না। যুদ্ধে যোগ দেওয়ায় ইতালীর ভাগ্যে না জুটল একখণ্ড রাজ্য, না বাড়ল প্রভাব-প্রতিপত্তি। ইতালীর রাজনীতিবিদদের কাছে প্যারিস-সন্ধি নিরাশার কারণ হয়ে দাঁড়াল।

অর্থনৈতিক সংকট

এই রকমের নৈরাশ্যপূর্ণ অবস্থার মধ্যে ইতালীতে দেখা গেল তীব্র এক অর্থনৈতিক সংকট ; এই অর্থনৈতিক সংকটকে কেন্দ্র করে সারা ইতালীতে শ্রমজীবী জনসাধারণের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ দেখা দিল। কারখানায় কারখানায় শ্রমিকেরা ধর্মঘট করতে লাগল। ক্রমশ শ্রমিক আন্দোলনের শক্তি দুর্বার হয়ে উঠল। ইতালীতে গড়ে উঠল এক শক্তিশালী কমিউনিস্ট দল। ইতালীর কমিউনিস্ট দল সোভিয়েট বিপ্লবের দৃষ্টান্ত ইতালীর জনসাধারণের সামনে তুলে ধরলেন।

শ্রমিক আন্দোলনের প্রসার

ইতালীতে মুসোলিনীর আবির্ভাব (The Rise of Mussolini in Italy) : দেশের শ্রমিক আন্দোলনের শক্তিবৃদ্ধিতে ইতালীর ধনী শিল্পপতিরা ভয় পেয়ে গেলেন। তাঁরা এই আন্দোলন দমনের উপায় খুঁজতে লাগলেন।

এই কাজে তাঁরা সাহায্য পেলেন একটি কমিউনিস্ট-বিরোধী আন্দোলনের কাছ থেকে। এটি **ফ্যাসিস্ট আন্দোলন** নামে খ্যাত। এই আন্দোলনের প্রধান কর্ণধার ছিলেন **বেনিতো মুসোলিনী**।

মুসোলিনীর পরিচয়

১৮৮৩ খ্রীঃ মুসোলিনী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন কর্মকার। তাঁর মা ছিলেন শিক্ষয়িত্রী। তিনি নিজেও প্রথম জীবনে শিক্ষক ছিলেন। মুসোলিনী ছিলেন সুযোগ-সন্ধানী, ভাগ্যান্বেষী যুবক।

মুসোলিনী এই সময়ে একটি স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী গড়ে তুললেন। বিক্ষুব্ধ সৈনিক ও মধ্যবিত্তদের মধ্য থেকে তিনি এই বাহিনীর জন্য লোকজন সংগ্রহ করলেন।

বেণিতো মুসোলিনীর ফ্যাসিষ্ট দল গঠন

মুসোলিনী প্রচার করতে লাগলেন — প্যারিস সন্ধির অবমাননাকর শর্তগুলি অগ্রাহ্য করে দেশের জাতীয় সম্মান প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি দেশ থেকে সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট আন্দোলন উচ্ছেদের প্রতিশ্রুতি দিলেন। কমিউনিস্ট আন্দোলনের উচ্ছেদের প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় ইতালীর ধনী শিল্পপতিরা মুসোলিনীকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন। মুসোলিনী ঘোষণা করলেন—শ্রেণী হিসাবে ধনিক শ্রেণী সৃজনশীল। তিনি প্রচার করলেন—শ্রেণী সংগ্রাম দেশের পক্ষে ক্ষতিকর; শ্রেণী সৌহার্দ্যই সর্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়।



বেনিতো মুসোলিনি

মুসোলিনীর ক্ষমতা লাভ (Mussolini's Accession to

Power) : ক্রমে ক্রমে মুসোলিনী ও তাঁর স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী (যাদের বলা হতো **ফ্যাসিস্ট** বা যোদ্ধা) ধনিক ও ভাগ্যান্বেষীদের সাহায্য পেয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠতে লাগল। ১৯২২ খ্রীঃ অক্টোবর মাসে ফ্যাসিস্টরা রোমে অভিযান করল। ইতালীর রাজা ফ্যাসিস্টদের হাতে ক্ষমতা তুলে দিলেন। ইতালীতে মুসোলিনীর ক্ষমতা হল প্রতিষ্ঠিত।

ফ্যাসিষ্ট দলের ক্ষমতা দখল

আভ্যন্তরীণ নীতি (Internal Policy) : ক্ষমতা পাওয়ার পরে মুসোলিনী ইতালীতে একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করলেন। মুসোলিনীর ফ্যাসিষ্ট দল ছাড়া আর সমস্ত দল বে-আইনী ঘোষণা করা হল। ব্যক্তি-স্বাধীনতা রুদ্ধ করা হল। মিউনিসিপ্যালিটি এবং শহরগুলিকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হল। প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার অবলুপ্ত করা হল। মেয়েদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হল। সমাজতন্ত্রবাদে বিশ্বাসী ও ইহুদীদের উপর সীমাহীন নির্যাতন আরম্ভ হল। এই দমন নীতির কাজ সুশৃঙ্খলভাবে চালাবার জন্য একটি গুপ্ত পুলিস বাহিনী গঠিত হল।

ফ্যাসিষ্ট এক-নায়কত্ব প্রতিষ্ঠা

আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে মুসোলিনী দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের দিকে নজর দিলেন। ১৯২২ থেকে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ফাসিষ্টরা কতকগুলি কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করে দেশে সাময়িক অর্থনৈতিক উন্নতি আনয়ন করল। অন্য দেশের উপর যাতে ইতালীকে নির্ভর করতে না হয় সেই দিকে মুসোলিনী দৃষ্টি দিলেন। এই উদ্দেশ্যে পণ্যদ্রব্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা হল। ইতালীতে যুদ্ধজাহাজ নির্মাণের ব্যবসাটি সম্প্রসারিত করা হল।

কিন্তু অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সম্পর্কে ফ্যাসিষ্টদের কথাবার্তা অচিরে অন্তঃসারশূন্য বলে পরিগণিত হল। দেশে বেকারের সংখ্যা বেড়ে চলল। দেশ-কল্যাণের অজুহাতে শ্রমিকদের কাজের বোঝা বাড়িয়ে দেওয়া হল। শ্রমিকদের উপর সন্ত্রাসের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করা হল। 'কালো কোর্তা' (Black Shirts) নামে এক সশস্ত্র বাহিনী গঠন করা হল। তারা সারা দেশে সন্ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করল। কমিউনিষ্ট ও স্বাধীনতাকামী প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে নিগৃহীত করা হল। বিনা বিচারে জেল, বেত, গুলি এবং নরহত্যা —এই হল ফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্রের মূল অবলম্বন।

বৈদেশিক নীতি (Fereign Policy) : নবগঠিত রাষ্ট্রের প্রধান

উগ্র জাতীয়তাবাদ

সহায় হিসাবে গড়ে উঠল এক বিরাট সেনাবাহিনী। মুসোলিনী ইতালীর নাগরিকদের মধ্যে উগ্র জাতীয়তা-বোধ সঞ্চার করে বললেন—প্রাচীনকালের রোম সাম্রাজ্যের মত তিনিও একটি বিরাট ইতালীয় সাম্রাজ্য গড়ে তুলবেন। তিনি ঘোষণা করলেন—ইতালী যুদ্ধপ্রিয় জাতি। যুদ্ধবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে তিনি আবিষ্কার করলেন তেজ ও বীরত্বের পরাকাষ্ঠা; যুদ্ধবাদী মনোভাব জাগিয়ে তুলে তিনি ইতালীবাসীকে উদ্দেশ করে বললেন—ইতালীর কাজ হল আফ্রিকায়'সভ্যতা বিস্তারের দায়িত্ব' গ্রহণ করা। এই দায়িত্ব পালনের অজুহাতে তিনি আফ্রিকার একটি স্বাধীন দেশ আবিসিনিয়া আক্রমণ করলেন এবং এই দেশ জয় করে তিনি আফ্রিকায় ইতালীর সাম্রাজ্য বিস্তারে অগ্রসর হলেন।

রাজ্য বিস্তারের পরিকল্পনা

আবিসিনিয়ার তুলা, কফি, চামড়া, পশম, কাঠ এবং খনিজ দ্রব্য মুসোলিনীর লোভের কারণ হল। এর পরে ইতালী পূর্ব ইওরোপে অবস্থিত আলবানিয়া রাজ্যটিও ইতালীর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়।

জার্মানীতে হিটলারের অভ্যুদয় ও জাপানে তোজোর ক্ষমতা লাভ ফ্যাসিষ্ট ইতালীর অগ্রগতির পথ আরও নিষ্কণ্টক করে তোলে।

জার্মানীতে হিটলারের শাসন
(Germany under Hitler)

ইতালীতে যখন ফ্যাসিষ্ট আন্দোলনের প্রাদুর্ভাব হয়, তখন জার্মানীতেও দারুণ উত্তেজনা চলছিল। আগেই বলেছি, ভার্সাই সন্ধিতে জার্মানীকে কতকগুলি অবমাননাকর শর্ত মেনে নিতে হয়েছিল। জার্মানীর নৌ-বাহিনী কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। তার সেনাবাহিনী ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। তাছাড়া, জার্মানীকে বিজয়ী রাষ্ট্রগুলিকে (ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি) প্রচুর অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে দিতে বাধ্য করা হয়েছিল।

তার উপর, যুদ্ধোত্তর যুগে জার্মানীতে মুদ্রাস্ফীতি, বেকার সমস্যা প্রভৃতি ভীষণ আকার ধারণ করেছিল।

১৯১৮ খ্রীঃ জার্মানীর পরাজয়ের পরে কাইজার সিংহাসন পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং সেই জায়গায় জার্মানীতে একটি প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়। কিন্তু প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হলেও এই পরিবর্তন জার্মানীর মূল ভিত্তিকে স্পর্শ করে

নাই। প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরেও জার্মানীর সমাজে ধনী ও শিল্পপতিদের প্রাধান্য আগের মতই বজায় থাকে।

অর্থনৈতিক সংকট

ভার্সাই সন্ধির পরে যখন জনসাধারণের মধ্যে দারুণ অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিল, তখন জার্মানীতে ইতালীর মতই শ্রমজীবী জনসাধারণের মধ্যে তীব্র বিক্ষোভ সঞ্চারিত হল। শ্রমিকেরা ঘন ঘন ধর্মঘট করল। বেকার মধ্যবিত্তেরা উত্তেজিত হয়ে উঠল। দেশে

শ্রমিক আন্দোলন

শ্রমিক আন্দোলন ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে উঠল। জার্মানীতে কমিউনিস্ট দালর প্রভাব ক্রমেই বেড়ে চলল। প্রজাতান্ত্রিক সরকারের উপর যথেষ্ট প্রভাব ছিল জার্মানীর ধনী শিল্পপতিদের। তাই সরকার ও ধনী শিল্পপতিরা একযোগে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন দমনে অগ্রসর হল।

জার্মানীতে হিটলারের অভ্যুদয় (The Rise of Hitler in Germany) : ঠিক এই সময়ে ইতালীর মত জার্মানীতেও বেকার মধ্যবিত্তদের নিয়ে একটি উগ্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে উঠে। এই আন্দোলনের নেতা ছিলেন **এড্‌লফ হিট-লার**। হিটলার ১৮৮৯ খ্রীঃ উত্তর অস্ট্রিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন শুল্ক বিভাগে একজন পদস্থ কর্মচারী। প্রথম মহাযুদ্ধে সাধারণ সৈনিক হিসাবে ব্যাভেরিয়ার সেনাবাহিনীতে তিনি যোগদান করেন। মহাযুদ্ধে পরাজয়ের পরে জার্মানীতে যে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল তার প্রতি হিটলার বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। তিনি

এডলফ হিটলার



এডলফ হিটলার

হিটলারের মতামত

পরাজিত জার্মানীকে পূর্বসম্মানে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার নামে জার্মনীতে উগ্র জাতীয়তাবাদের প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হন হিটলারের এই উগ্র ও অন্ধ জাতীয়তাবাদের মূল কথা

ছিল—পৃথিবীতে জর্মানীকে শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রের সম্মানে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তিনি স্বপ্ন দেখতেন এক বৃহত্তর জার্মানীর। তাঁর মতে শুধু জার্মানীর নয় সারা পৃথিবীর দুটি শত্রু—একটি বলশেভিজম বা কমিউনিজম, আর একটি ইহুদী। বলশেভিজমের ভয় দূর করে এবং ইহুদী নিধন করে কিভাবে তিনি জার্মানীকে ও পৃথিবীকে পুনর্গঠিত করবেন তারই এক পরিকল্পনা তিনি হাজির করলেন তাঁর বহুঘোষিত একখানি পুস্তকের মধ্যে। এই পুস্তকখানির নাম মেইন কাম্‌প (Mein Kampf)। এই বইখানি হিটলারের ভক্ত মহলে ফ্যাসিবাদের বাইবেল বলে পরিচিত ছিল।

হিটলারও মুসোলিনীর মত এক সশস্ত্র বাহিনী (এদের **ঝটিকা বাহিনী** বলা হত) গঠন করলেন। তাছাড়া, হিটলার **ন্যাশনাল সোশ্যালিষ্ট দল** নামে একটি নতুন রাজনৈতিক সংগঠন তৈরী করলেন।

হিটলার কর্তৃক নাজী দল গঠন

ন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট দলকে সংক্ষেপে নাজী বা নাৎসী দল বলা হত। [Nation-এর Na এবং Sozialist-এর zi যোগ করে—Nazi]। তিনি জানতেন বেকার মধ্যবিত্তদের মধ্যে সমাজতন্ত্র সম্পর্কে এবং জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে যথেষ্ট আকর্ষণ আছে। তাই তিনি নিজের দলকে 'ন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট' এই নামে আখ্যায়িত করেন।

নাম যাই হোক, তাঁর দলটি প্রচুর অর্থ পেয়েছিল কমিউনিস্ট-ভয়ে ভীত জার্মানীর বৃহৎ শিল্পপতিদের কাছ থেকে। কাজেই নাৎসী দলের প্রধান

জার্মানীতে হিটলারের ক্ষমতা দখল

লক্ষ্য ছিল জার্মানিতে কমিউনিস্ট ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন সমূলে ধ্বংস করা এবং ইতালীর মত জার্মানীতেও বৃহৎ শিল্পপতিদের সাহায্য নিয়ে হিটলারের নেতৃত্বে একটি ফ্যাসিস্ট একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করা। বৃহৎ শিল্পপতিদের সাহায্যে ক্রমে ক্রমে এই নাৎসী দল জার্মানীতে বেশ প্রভাবশালী হয়ে উঠল।

শিল্পপতি ও মধ্যবিত্তের একাংশের মধ্যে হিটলারের প্রতি সমর্থন ক্রমশ সক্রিয় হয়ে উঠতে লাগল। হিটলার ঝটিকা বাহিনীর সাহায্যে জনতার দুর্বল অংশকে দাবিয়ে রাখলেন। অবশেষে ১৯৩২ খ্রীঃ সাধারণ নির্বাচনে নাৎসী দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করল। ১৯৩৩ খ্রীঃ ৩০শে জানুয়ারী হিটলার জার্মানীর চ্যান্সেলর বা প্রধান মন্ত্রীর পদ লাভ করলেন। অল্পকাল পরেই

হিটলার শুধু প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতাতে সন্তুষ্ট হতে না পেরে জার্মানীর রাষ্ট্রপতির পদটিও একই সঙ্গে অধিকার করে বসলেন। তিনি ঘোষণা করলেন—তিনি রাষ্ট্রপতি নামে পরিচিত হতে চান না। তিনি পরিচিত হবেন দেশের নেতা বা ফুরর (Fuhrer) হিসাবে।

ক্ষমতালাভ করে হিটলার জার্মানীতে প্রতিষ্ঠা করলেন ফ্যাসিষ্ট এক-নায়কত্ব। হিটলারের ন্যাশনাল সোস্থালিষ্ট পার্টি বা নাৎসী পার্টি এখন রাষ্ট্র পরিচালনা করতে থাকল।

আভ্যন্তরীণ নীতি: আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে, কতকগুলি চমকপ্রদ সংস্কারের মধ্য দিয়ে তিনি জার্মানবাসীদের মুগ্ধ করতে চাইলেন। অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতার অজুহাতে তিনি কাঁচামালের উপর 'কণ্ট্রোল' বসালেন, এবং জার্ম্যানদের অধিক মূল্যে স্বদেশী দ্রব্য কিনতে উৎসাহিত করলেন। স্ট্রাইক বে-আইনী ঘোষণা করে শ্রমিকদের মধ্যে লৌহদৃঢ় শৃঙ্খলা প্রবর্তন করলেন; এবং 'জার্মান লেবার-ফ্রন্ট' নামে নাৎসী দল পরিচালিত একটি শ্রমিক সংগঠনের সাহায্যে তিনি জার্মানীতে সাময়িকভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সক্ষম হলেন। অস্ত্র নির্মাণ, জাহাজ নির্মাণ প্রভৃতির মাধ্যমে যুদ্ধ-অর্থনীতি সৃষ্টি করে বহু বেকারের সাময়িকভাবে চাকরীর সংস্থান করলেন। সেনাবাহিনীতে বাধ্যতামূলক যোগদানের আদেশ জারি করে অনেক যুবককে তিনি কাজ দিলেন। তিনি ও তাঁর সহযোগীরা অর্থনীতির ক্ষেত্রে নতুন নীতি প্রবর্তন করলেন যার মুল কথা হল: কামান আগে, মাখন পরে ("Cannon before butter")।

জার্মান জাতির লোকেরা আর্য এবং ইহুদীরা অনার্য, দেশের কলঙ্ক—এই মনগড়া তত্ত্ব প্রচার করে তিনি হাজার হাজার ইহুদীকে বন্দীনিবাসে পাঠালেন এবং হত্যা করলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরা নানা অবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব গলাধঃকরণ করতে বাধ্য হলেন। শিক্ষা-সংস্কৃতি ব্যাপারে স্বাধীন মত, স্বাধীন গবেষণা নিষিদ্ধ হল। শিক্ষিতদের মধ্যে যাঁরাই 'নাৎসী জীবনদর্শন' গ্রহণ করতে পারলেন না তাঁদের দেশের শত্রু বলে আখ্যা দেওয়া হল।

একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা

বিরোধী দলগুলিকে বে-আইনী ঘোষণা করা হল। শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের অধিকারও কেড়ে নেওয়া হল। বিনা বিচারে জেল এবং জেলের মধ্যে বেত, গুলি, হত্যা—

ইত্যাদি দ্বারা এক নিরঙ্কুশ সন্ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি হল জার্মানীতে।

বৈদেশিক নীতি (Foreign Policy): হিটলারও মুসোলিনীর মত জার্মান জাতির মধ্যে এক উগ্র জাতীয়তাবোধ জাগরিত করলেন। জার্মান জাতির সামনে তিনি পৃথিবী-জয়ের এক আত্মম্ভরী পরিকল্পনা হাজির করলেন। সারা ইওরোপ জার্মানীর সেনাবাহিনীর ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে উঠল।

উগ্র জাতীয়তাবাদ

হিটলার দেখলেন, এই কাজের পক্ষে পূর্ব ইওরোপের দেশগুলির অবস্থা খুব অনুকূল। পূর্ব ইওরোপের রাষ্ট্রগুলি, যেমন হাঙ্গেরী, পোল্যাণ্ড; য়ুগোশ্লোভিয়া, গ্রীস, বুলগেরিয়া প্রভৃতি অর্থনীতির দিক থেকে ছিল যথেষ্ট অনগ্রসর এবং এই দেশগুলির রাজ-রাজনৈতিক অবস্থাও ছিল অত্যন্ত অনিশ্চিত। অন্যান্য পূর্ব ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলিতেও ছিল রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা। এই অনিশ্চয়তার সুযোগ নিয়ে হিটলার এই অঞ্চলের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ আরম্ভ করলেন এবং ক্রমে ক্রমে এই অঞ্চলে তিনি কতকগুলি আধা-ফ্যাসিস্ট রাজ্য গড়ে তুলতে সক্ষম হলেন। প্রকৃতপক্ষে, এইগুলি ছিল হিটলারের তাঁবেদার রাষ্ট্র।

পূর্ব ইউরোপে কতকগুলি ফ্যাসিস্ট ও আধা ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রের উদ্ভব

হিটলার ও মুসোলিনী এই সময়ে স্পেন এবং পর্তুগালেও ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্র-গঠনে উদ্যোগী হলেন। ক্রমে ক্রমে হিটলার নিজেকে শক্তিশালী বলে অনুভব করলেন এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির উপর প্রত্যক্ষ আক্রমণ আরম্ভ করলেন। ১৯৩৬ খ্রীঃ জার্মানী ভার্সাই সন্ধির সর্ত উপেক্ষা করে রাইনল্যাণ্ড দখল করে নিল। ১৯৩৮ খ্রীঃ জার্মানী অস্ট্রীয়া দখল করল। ১৯৩৮ খ্রীঃ জার্মানী চেকোশ্লোভেকিয়ার একটি অংশ সুদেতানল্যাণ্ডও দখল করল। হিটলার দাবি করলেন রাইনল্যাণ্ড, অস্ট্রীয়া ও সুদেতানল্যাণ্ডে জার্মান জাতির লোক বাস করে, তাই এই অঞ্চলগুলি দখল করার অধিকার জার্মানীর আছে।

প্রতিবেশী রাষ্ট্র আক্রমণ

জার্মানী আক্রমণাত্মক কাজে অগ্রসর হবার সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটেনের সঙ্গে 'মিউনিক চুক্তি' স্বাক্ষর করল। এই চুক্তি অনুযায়ী ব্রিটেন হিটলারের আক্রমণাত্মক কাজকর্মকে পরোক্ষভাবে মেনে নিল। ১৯৩৯ খ্রীঃ জার্মানী রাশিয়ার সঙ্গে একটি অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর করল। কিন্তু হিটলারের কাছে আন্তর্জাতিক

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের জন্য হিটলারের দায়িত্ব

চুক্তির কোন মূল্য ছিল না। এইগুলি ছিল তাঁর কাছে সময় ক্ষেপণের উপায় মাত্র। তাই ১৯৩৯ খ্রীঃ আগের চুক্তি ভঙ্গ করে তিনি ব্রিটেন ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। ১৯৪১ খ্রীঃ তিনি রাশিয়ার বিরুদ্ধেও যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। মোট কথা, হিটলার ডেকে আনলেন পৃথিবীর বুকে নতুন এক সর্বনাশা যুদ্ধের বিভীষিকা।

স্পেনের গৃহযুদ্ধ
[The Civil War in Spain]

প্রথম মহাযুদ্ধে স্পেন ছিল নিরপেক্ষ। এই সময়ে স্পেনে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। ১৯১৭ খ্রীঃ স্পেনের জনসাধারণ এই স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। কিন্তু রাজা সেনাবাহিনী নিয়োগ করে এই বিদ্রোহ দমন করলেন।

তারপর ১৯২১ খ্রীঃ স্পেনের সাম্রাজ্যভুক্ত মরক্কোতে একটি জাতীয়তাবাদী বিদ্রোহ দেখা দেয়। বিদ্রোহীরা স্পেনের সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করে। এই পরাজয়ে স্পেনের রাজার অকর্মণ্যতা নতুন করে প্রমাণ হয়ে গেল। এই পরাজয়ের সুযোগ নিয়ে স্পেনে **প্রাইমো ডি রিভিয়েরা** একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করলেন (১৯২৩ খ্রীঃ)।

স্পেনে গণতান্ত্রিক বিপ্লব প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা (১৯৩১)

কিন্তু স্পেনের জনসাধারণের মূল সমস্যার সমাধান হল না। কাজেই জনসাধারণের বিক্ষোভ ক্রমশ বেড়ে চলল। শ্রমিকেরা জঙ্গী মনোভাব নিয়ে স্ট্রাইকের পরে স্ট্রাইক করল। বুদ্ধিজীবীরা একনায়কত্বের তীব্র নিন্দা করে রাজনৈতিক সাহিত্য রচনা করলেন। সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের প্রতিবাদ করে হাজার হাজার ছাত্র স্কুল-কলেজ থেকে বেরিয়ে এল। পদাতিক বাহিনী এবং বিমান বাহিনীর লোকেরা বিদ্রোহ ঘোষণা করল। ১৯৩০ খ্রীঃ এই দেশব্যাপী বিদ্রোহের মুখে রিভিয়েরা সরকার পদত্যাগ করতে বাধ্য হল। ক্রমে ক্রমে ১৯৩১ খ্রীঃ গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির নেতৃত্বে স্পেনে একটি বিপ্লব সংগঠিত হল। এই বিপ্লবের ফলে রাজা এ্যালফানসো (Alfanso) সিংহাসন ত্যাগ করে পালিয়ে গেলেন। স্পেনে স্থাপিত হল দীর্ঘ সংগ্রামের পরে "সর্বশ্রেণীর শ্রমিকের গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র" ("a democratic republic of 'workers of all classes")। এই প্রজাতান্ত্রিক সরকারের রাষ্ট্রপতি-

পদে নির্বাচিত হলেন গরীব জমিদার বংশজাত **জামোরা** (Zamora) এবং প্রধানমন্ত্রী হলেন **আনজানা** (Anzana)।

এই প্রজাতান্ত্রিক সরকারের আমলে ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ক্রমে ক্রমে বামপন্থী শক্তিগুলি ক্ষমতাশালী হয়ে উঠল এবং স্পেনে একটি **পপুলার ফ্রন্ট** সরকার গড়ে উঠল।

প্রজাতান্ত্রিক সরকারের আমলে স্পেনের রাজনীতিতে ও অর্থনীতিতে মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হল। প্রজাতান্ত্রিক স্পেনে সামন্ততন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্রের প্রধান আশ্রয়দাতা ক্যাথলিক চার্চের ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হল।

প্রজাতান্ত্রিক সরকারের কাজ

জেসুইট সম্প্রদায় ভেঙে দেওয়া হল। তাদের সমষ্টিগত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হল এবং সমাজ-কল্যাণে এই অর্থ ব্যয় করা হল। ক্যাথলিক চার্চের তত্ত্বাবধানে যে সমস্ত বিদ্যালয় পরিচালিত হত সেগুলির দরজা বন্ধ করে দেওয়া হল। ভূমি-সংস্কার আরম্ভ হল। বিনা ক্ষতিপূরণে বড় বড় জমিদারের জমি রাষ্ট্রায়ত্ত করা হল এবং সেগুলি কৃষকদের মধ্যে বিলি করে দেওয়া হল।

বামপন্থীদের শক্তিবৃদ্ধিতে স্পেনের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি খুব ভয় পেল এবং তারা বিদেশের শক্তির সাহায্য নিয়ে দেশের পপুলার ফ্রন্ট সরকারটিকে

জেনারেল ফ্রাঙ্কো

বিনষ্ট করার জন্য ষড়যন্ত্র করতে লাগল। ঠিক এই সময়ে মুসোলিনী এই প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির সাহায্যে এগিয়ে এলেন। মুসোলিনী **জেনারেল ফ্রাঙ্কো** নামে জনৈক স্পেনীয় সেনাপতিকে এই কাজে সাহায্য করতে লাগলেন। ফ্রাঙ্কো 'পপুলার ফ্রন্ট'

স্পেনে ফ্যাসিস্ট আক্রমণ

সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। ইতালী ও জার্মানী ফ্রাঙ্কোর পক্ষভুক্ত হয়ে আকাশ থেকে স্পেনের গণতন্ত্রকামী জনসাধারণের উপর বোমাবর্ষণ করতে লাগল।

স্পেনের গণতন্ত্রীরাও গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রামে স্বার্থত্যাগ করে এক নতুন ইতিহাস রচনা করলেন। স্পেনের এই গণতান্ত্রিক সংগ্রাম সারা

প্রজাতন্ত্র রক্ষার জন্য ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে দুর্জয় প্রতিরোধ

দুনিয়ার গণতন্ত্রকামীদের সমর্থন লাভ করল। স্পেনের এই সংগ্রামটি ফ্যাসিস্ট একনায়কত্বের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক শক্তির দুর্জয় প্রতিরোধের প্রতীক হয়ে উঠেছিল। বিদেশ থেকে, বিশেষ করে, সোভিয়েট ইউনিয়ন, ফ্রান্স, ইংলণ্ড এবং আমেরিকা থেকে হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবক

'আন্তর্জাতিক ব্রিগেড' গঠন করে স্পেনের গণতান্ত্রিক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করলেন।

স্পেনের গৃহযুদ্ধ নিয়ে ক্রমে একটি ছোটখাটো বিশ্বযুদ্ধের মহড়া ("little world war") আরম্ভ হল। ফ্রাঙ্কোকে যেমন সমর্থন জানাল ফ্যাসিস্ট ইতালী ও জার্মানী, তেমনি প্রজাতন্ত্রীদের সাহায্যে এগিয়ে এল সোভিয়েট ইউনিয়ন। কিন্তু ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সরকার ফ্রাঙ্কো সম্পর্কে নিরপেক্ষতার নীতি অবলম্বন করল। ফলে, ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে ফ্যাসিস্ট শক্তির সাহায্যপুষ্ট হয়ে ফ্রাঙ্কো প্রজাতন্ত্রীদের হারিয়ে দিলেন। ফ্রাঙ্কো সরকারকে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স মেনে নেবার ফলে মৃত্যুঞ্জয়ী গণতান্ত্রিক সংগ্রাম সাময়িকভাবে পশ্চাদপসারণ করতে বাধ্য হল। জেনারেল ফ্রাঙ্কোর জয়লাভে স্পেনে একনায়কত্ব জয়লাভ করল।

চতুর্দশ অধ্যায়

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ

[The Second World War]

১৯১৯ খ্রীঃ ভার্সাই সম্মেলনে মিলিত রাষ্ট্রপ্রধানেরা অনেকে ভেবেছিলেন যে প্রথম মহাযুদ্ধই হবে শেষ যুদ্ধ "A war to end war"। পৃথিবীতে আর যাতে নতুন যুদ্ধ না বাধে সেইজন্য আন্তর্জাতিক বিরোধের মীমাংসাকল্পে তাঁরা 'লীগ অব নেশন্‌স্' গঠন করেছিলেন।

কিন্তু ঘটনা পরম্পরায় প্রমাণ হয়ে গেল যে প্রথম মহাযুদ্ধই শেষ যুদ্ধ নয়। মাত্র কুড়ি বছরের মধ্যে প্রথম মহাযুদ্ধের চেয়েও অনেক বেশী ভয়ঙ্কর আর একটি মহাযুদ্ধের ঝড় পৃথিবীর বুকের উপর দিয়ে বয়ে গেল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বৈশিষ্ট্য : বহু বিস্তীর্ণ রণাঙ্গন

প্রথম মহাযুদ্ধ অপেক্ষা এই যুদ্ধ আরও অনেক ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। রাশিয়া সমেত ইওরোপ, উত্তর আফ্রিকা, পূর্ব এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ—এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে গড়ে উঠল এই যুদ্ধের রণক্ষেত্র।

বৈজ্ঞানিক অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার

এই যুদ্ধে বৈজ্ঞানিক অস্ত্রশস্ত্র যেভাবে ব্যবহৃত হয়েছিল এর পূর্বে আর কোন যুদ্ধে তা হয় নাই। বিবদমান দুই পক্ষের খনিজ সম্পদ ও আর্থিক সম্পদের চূড়ান্ত ব্যবহার হয়েছিল এই যুদ্ধে। বিমান থেকে বোমাবর্ষণের ফলে লণ্ডন, বার্লিন প্রভৃতি শহর ভস্মীভূত হয়েছিল। যারা যুদ্ধে যোগ দেয় নাই সেই সমস্ত নিরীহ বে-সামরিক নাগরিকেরাও এই ধ্বংসলীলার হাত থেকে নিস্তার পায় নাই। শহরগুলির উপর অনবরত বোমাবর্ষণের ফলে হাজার হাজার শান্তিপ্রিয় লোক প্রাণ হারাল। গীর্জা, বিশ্ববিদ্যালয় ও অনেক প্রাসাদ বোমাবর্ষণে ধূলিসাৎ হয়ে গেল।

যুদ্ধের কারণ

[Causes of the War]

প্রথম মহাযুদ্ধের মত এই বহু-বিধ্বংসী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের জন্যও জার্মানীকেই প্রধানত দায়ী করা যেতে পারে।

জার্মানীতে হিটলারের অভ্যুদয়ের পর থেকেই আবার যুদ্ধোন্মাদনা দেখা দেয়। আগেই বলেছি, ভার্সাই সন্ধির শর্তগুলি জার্মানীর পক্ষে অত্যন্ত অপমান-কর হয়েছিল। জার্মানীর মনের কোণে ভার্সাই সন্ধির শর্তগুলি সম্পর্কে দারুণ অসন্তোষ সঞ্চিত ছিল। জার্মানীর সৈন্যবাহিনী হ্রাস করে দেওয়ায়, তার নৌ-বাহিনী ভেঙে দেওয়ায় এবং উপনিবেশগুলি কেড়ে নেওয়ায়, জার্মানী খুবই বিক্ষুব্ধ হয়েছিল। সুযোগ পেলেই জার্মানী প্রতিশোধ নেবার জন্য প্রস্তুত হতে লাগল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের জন্য জার্মানীর দায়িত্ব

হিটলার ক্ষমতা পেয়েই জার্মানবাসীর মনে এই প্রতিশোধের স্পৃহা জাগিয়ে তুললেন। তিনি জার্মানবাসীদের মনে এক নতুন আত্মম্ভরী মনোভাব সৃষ্টি করলেন। তিনি ভার্সাই সন্ধির শর্তগুলি অগ্রাহ্য করে আবার সেনা-বাহিনী পুনর্গঠিত করলেন, নৌ-বাহিনী সুসজ্জিত করলেন এবং উপনিবেশ পুনঃপ্রতিষ্ঠার সংকল্প ঘোষণা করলেন।

তাছাড়া, হিটলার ক্ষমতা পেয়েই বিজয়ীদের ক্ষতিপূরণ দেবার বাধ্য-বাধকতা অস্বীকার করলেন। সেই অর্থে কামান, ট্যাঙ্ক এবং আধুনিক সমরোপকরণ প্রস্তুত হতে লাগল। আস্তে আস্তে আবার গড়ে উঠল জার্মানীতে এক মহাশক্তিশালী সেনাবাহিনী। হাজার হাজার যুদ্ধ-জাহাজ, ডেস্ট্রয়ার, সাবমেরিন নিয়ে জার্মানীর নৌ-বাহিনীও শক্তিশালী হয়ে উঠল। তাছাড়া, এক শক্তিশালী বিমান-বাহিনীও গড়ে উঠল। ক্রমশ অস্ত্রসজ্জায় সুসজ্জিত হয়ে জার্মানী পূর্ব-অনুষ্ঠিত অন্যায়ের প্রতিশোধ নেবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

হিটলারের আমলে জার্মানীর অস্ত্রসজ্জা

শুধু যুদ্ধ-প্রস্তুতি কেন, জার্মানী ভার্সাই সন্ধির শর্ত উপেক্ষা করে নিজের সীমানা বাড়িয়ে নেবার জন্য এই বিশাল সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করতে আরম্ভ করল। ১৯৩৬ খ্রীঃ জার্মানী ভার্সাই সন্ধির ব্যবস্থা উপেক্ষা করে রাইনল্যাণ্ড দখল করে নিল। ১৯৩৮ খ্রীঃ ভার্সাই সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করে জার্মান সেনাবাহিনী অস্ট্রিয়া দখল করল। ১৯৩৮ খ্রীঃ জার্মানী চেকোশ্লো-ভাকিয়ার একটি অংশ সুদেতানল্যাণ্ড আক্রমণ করল। জার্মানী দাবি করল রাইনল্যাণ্ড, অস্ট্রিয়া ও সুদেতান-ল্যাণ্ডে জার্মানবাসীরা বাস করে; তাই এই অঞ্চলগুলি দখল করার অধিকার তার আছে।

জার্মানী কর্তৃক রাইনল্যাণ্ড ও অস্ট্রীয়া দখল

জার্মানী কর্তৃক চেকোশ্লোভাকিয়া আক্রমণ

ইতালীর অস্ত্রসজ্জা ও আবিসিনিয়া অধিকার

জার্মানীর মত ইতালীও অস্ত্রসজ্জা ও অন্যায় আক্রমণের পথ বেছে নেওয়ায় বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা আরও ঘনীভূত হল। আগেই বলেছি, ১৯৩৬ খ্রীঃ ইতালী স্পেনে হস্তক্ষেপ করেছিল। তারও আগে ১৯৩৫ খ্রীঃ ইতালী অত্যন্ত অন্যায়ভাবে উত্তর আফ্রিকার একটি স্বাধীন রাষ্ট্র আবিসিনিয়া আক্রমণ করেছিল।

জাপান কর্তৃক চীন আক্রমণ

ঠিক এই সময়ে হিটলার ও মুসোলিনীর পথ অনুসরণ করে জাপান অস্ত্রসজ্জায় মেতে উঠেছিল। জাপান ১৯৩৭ খ্রীঃ চীন আক্রমণ করল।

ক্রমে ক্রমে রাইনল্যাণ্ড, অস্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, আবিসিনিয়া, স্পেন ও চীনে আক্রমণাত্মক যুদ্ধের দামামা বেজে উঠল। নতুন এক মহাযুদ্ধের আগমনধ্বনি শোনা যেতে লাগল এশিয়া, আফ্রিকা ও ইওরোপে।

ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের নিষ্ক্রিয়তার নীতি

জার্মানী, ইতালী ও জাপান যখন এইভাবে একটার পর একটা আক্রমণাত্মক কাজে লিপ্ত হয়ে চলেছিল, ঠিক সেই সময়ে ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি রাষ্ট্র নিষ্ক্রিয়তা অবলম্বন করল। বরং তারা জার্মানী, ইতালী ও জাপানের সঙ্গে আপোস করে চলতে চেষ্টা করল। জাপান যখন চীন আক্রমণ করল, ইতালী আবিসিনিয়া দখল করল, জার্মানী রাইনল্যাণ্ড ও অস্ট্রিয়া দখল করল, তখন তারা নিরপেক্ষ দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের আপোস-নীতি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ পেল যখন হিটলার চেকোশ্লোভাকিয়ার একটি অংশ দখল করে নিল।

হিটলারের সঙ্গে আপোসের চেষ্টা : মিউনিক চুক্তি

ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী **নেভিল চেম্বারলেন** ১৯৩৮ খ্রীঃ মিউনিক শহরে গিয়ে হিটলারের সঙ্গে দেখা করলেন এবং হিটলার ও চেম্বারলেনের মধ্যে **মিউনিক চুক্তি** স্বাক্ষরিত হল। এই চুক্তিতে হিটলারের আগের কাজগুলি মেনে নেওয়া হল। জার্মানী চেকোশ্লোভাকিয়ায় আর নতুন আক্রমণ না করার প্রতিশ্রুতি দিল। কিন্তু হিটলারের প্রতিশ্রুতির কোন মূল্য ছিল না। এগারো মাসের মধ্যেই হিটলার আবার চেকোশ্লোভাকিয়া আক্রমণ করলেন। চেম্বারলেনের তোষণ-নীতি এইভাবে হিটলারের আক্রমণাত্মক কাজকর্মের সহায় হয়ে উঠল।

প্রশ্ন উঠতে পারে, কেন পশ্চিম ইওরোপের শক্তিগুলি এই আপোস-নীতি

ইংলণ্ড ও ফ্রান্স ফ্যাসিস্ট তোষণ-নীতি অবলম্বন করল কেন?

অনুসরণ করল? তার কারণ, এই শক্তিগুলি জার্মানীকে পছন্দ না করলেও তার চেয়েও বেশী অপছন্দ করত সোভিয়েট রাশিয়াকে। চেম্বারলেন বলতেন—হিটলার যদি কমিউনিস্ট রাশিয়াকে ধ্বংস করে, করুক। এই মনোভাব থেকেই চেম্বারলেন হিটলার ও মুসোলিনীর ক্ষমতাবৃদ্ধিতে বাধা দেন নাই।

রাশিয়া ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের কাছে প্রস্তাব করেছিল যে, হিটলারের বিরুদ্ধে মিলিত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু কমিউনিস্ট-বিরোধিতার বশে চেম্বারলেন এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। রাশিয়া এই অবস্থায় আত্মরক্ষার প্রয়োজনে হিটলারের সঙ্গে একটি অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর করলেন (১৯৩৯ খ্রীঃ)। পরের ঘটনাবলী থেকে প্রমাণ হয় যে, রাশিয়া জার্মানীর সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর করলেও হিটলারকে বিশ্বাস করত না। তাই হিটলার পোল্যাণ্ড দখল করলে রাশিয়াও পোল্যাণ্ডের এক অংশ দখল করে নিয়েছিল। তাছাড়া, পাছে হিটলার ফিনল্যাণ্ড দখল করে, এজন্য রাশিয়া আগে থেকেই ফিনল্যাণ্ডের একটি অংশও দখল করে নিয়েছিল।

রাশিয়া ও জার্মানীর অনাক্রমণ চুক্তি

যাই হোক, পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির কমিউনিস্ট-বিরোধিতা এবং আপোস-নীতির ফল তাদের পক্ষে মোটেই শুভ হয় নাই। ১৯৩৯ খ্রীঃ হিটলার যখন পোল্যাণ্ড আক্রমণ করলেন তখন তাদের নিদ্রা ভাঙল। হিটলারকে আর বাড়তে দেওয়া উচিত নয় ভেবে ইংলণ্ড পোল্যাণ্ড আক্রমণের বিরোধিতা করল। ১৯৩৯ খ্রীঃ সেপ্টেম্বর মাসে পোল্যাণ্ড আক্রমণকে উপলক্ষ্য করে ব্রিটেন জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। ফ্রান্সও ব্রিটেনের সঙ্গে মিলিত হয়ে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল।

হিটলার কর্তৃক পোলাণ্ড আক্রমণ

যুদ্ধারম্ভ

এইভাবে ১৯৩৯ খ্রীঃ সেপ্টেম্বর মাসে আরম্ভ হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

যুদ্ধের গতি
[The Course of the War]

১৯৩৯ খ্রীঃ থেকে ১৯৪৫ খ্রীঃ পর্যন্ত ছয় বৎসর ধরে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলেছিল। এই যুদ্ধে এক পক্ষে রইল জার্মানী ও ইতালী; দু বছর পরে

জাপানও জার্মানীর পক্ষে যোগ দিল। অপর পক্ষে রইল ইংলণ্ড ও ফ্রান্স; কিছুদিন পরে আমেরিকা ইংলণ্ডের পক্ষে যোগ দেয়। ১৯৪১ খ্রীঃ জার্মানী রাশিয়াকে আক্রমণ করলে রাশিয়াও জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

প্রথম মহাযুদ্ধের মত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধও অনেকগুলি রণাঙ্গনে চলেছিল।

পশ্চিম রণাঙ্গন

পশ্চিম ইওরোপে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স মিলিতভাবে যুদ্ধ চালিয়েছিল। ফ্রান্স ও জার্মানীর সীমান্তে '**ম্যাজিনো লাইন**' বলে একটি প্রাচীর ছিল। এই প্রাচীরটিকে রক্ষা করাই ছিল ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের কাজ। অপর দিকে জার্মানী **সিজফ্রিড লাইন** নামে পালটা একটি প্রাচীর তৈরি করেছিল। জার্মানী নিজেকে রক্ষা করতে চাইল এই প্রাচীরটিকে অবলম্বন করে।

জার্মানী প্রথম থেকেই আক্রমণাত্মক কৌশল অবলম্বন করল। ১৯৪০ খ্রীঃ জার্মানী ডেনমার্ক, নরওয়ে, হল্যাণ্ড ও বেলজিয়াম দখল করে নিল। এইভাবে শক্তি সঞ্চয় করে জার্মানী অবশেষে ফ্রান্স আক্রমণ করল। জার্মানীর তীব্র আক্রমণের মুখে ফরাসী দেশে ও বেলজিয়ামে অবস্থিত ব্রিটিশ বাহিনীর অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক হয়ে উঠল। বহু কষ্টে ও ভীষণ বিপদের মধ্যে ব্রিটিশ বাহিনীকে সমুদ্রের উপকূলে ক্যালে বন্দরের সন্নিকটবর্তী ডানকার্কে নিয়ে যাওয়া হল এবং সেইখান থেকে ব্রিটিশ বাহিনী ইংলণ্ডে সরিয়ে আনা হল।

ব্রিটিশ বাহিনী সরে আসার পরে জার্মানী তুমুল বিক্রমে ফ্রান্স আক্রমণ করল। জার্মানীর আক্রমণে ফ্রান্স বিহ্বল হয়ে পড়ল। জার্মান বাহিনী প্যারিস শহর দখল করে নিল। ফ্রান্স আত্মসমর্পণ করল (১৯৪০ খ্রীঃ)। **মার্শাল পেঁতার** নেতৃত্বে ফ্রান্সে হিটলার একটি তাঁবেদার সরকার গঠন করলেন। পশ্চিম রণাঙ্গনে হিটলারের হল জয়জয়কার।

ফ্রান্সের এই শোচনীয় পরাজয়ের পরে ইংলণ্ডকে কিছুদিনের জন্ম হিটলারের সঙ্গে একা যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হল।

অন্যদিকে এই সময়ে (১৯৪০ খ্রীঃ) ইতালী যুদ্ধে যোগ দেওয়ায় জার্মানীর শক্তি আরও বৃদ্ধি পেল।

শক্তিশালী জার্মান বাহিনী এখন ব্রিটেনের বিরুদ্ধে আক্রমণ কেন্দ্রীভূত করল। জার্মানী জানত যে ব্রিটেনের বিমানবাহিনী খুব শক্তিশালী।

তাই ব্রিটেনের শক্তি নষ্ট করার উদ্দেশ্যে জার্মান বোমারু বিমানগুলি ঝাঁকে ঝাঁকে গিয়ে ব্রিটেনের উপর বোমা-বর্ষণ করতে লাগল।

ব্রিটেনে জার্মানী কর্তৃক বোমাবর্ষণ

উইনস্টন চার্চিল

ব্রিটেনে এই সময়ে **উইনস্টন চার্চিল** প্রধানমন্ত্রী পদে অভিষিক্ত হলেন। চার্চিলের নেতৃত্বে ব্রিটেন অসীম বীরত্বের সঙ্গে আত্মরক্ষা করল। জার্মানী কিছুতেই ব্রিটেনকে পর্যুদস্ত করতে পারে নাই। এই বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামটি **ব্রিটেনের যুদ্ধ** বলে বিখ্যাত হয়ে রয়েছে।



উইনস্টন চার্চিল

যুদ্ধে আমেরিকার যোগদান

রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট

এতদিন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এই যুদ্ধে নিরপেক্ষ ছিল। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি দেখলেন যে এই যুদ্ধে ব্রিটেন পরাজিত হলে জার্মানী আমেরিকা আক্রমণ করতে পারে। তাই আমেরিকাও এই সময়ে ইংলণ্ডকে সাহায্য করতে আরম্ভ করল। ১৯৪১ খ্রীঃ ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী চার্চিল ও যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি **রুজভেল্ট** আতলান্তিক মহাসাগরে একটি বৈঠকে মিলিত হলেন এবং যুদ্ধের লক্ষ্য সম্পর্কে আলোচনার পরে **আতলান্তিক সনদ (Atlantic Charter)** নামে একটি দলিলে স্বাক্ষর করলেন।



ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট

১৯৪১ খ্রীঃ জুন মাসে হিটলার হঠাৎ ১৯৩৯ খৃস্টাব্দের স্বাক্ষরিত অনাক্রমণ চুক্তি ভঙ্গ করে রাশিয়া আক্রমণ করলেন। হিটলার ভাবলেন—রাশিয়া সহজেই ভেঙে পড়বে। কিন্তু এইটাই হল তাঁর সবচেয়ে বড় ভুল। প্রথম দিকে রাশিয়া বেশ অসুবিধায় পড়ে গেল। জার্মানী উইক্রেন ও ক্রিমিয়া জয়

করে নিল এবং স্টালিনগ্রাদ অবরোধ করল। কিন্তু ক্রমশ রাশিয়া প্রতি-আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠল। রাশিয়া এমন বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ আরম্ভ করল যে জার্মানীকে স্টালিনগ্রাদে হার মানতে হল। জার্মানীর সেনাবাহিনী স্টালিনগ্রাদে রুশসেনাবাহিনী কর্তৃক বেষ্টিত হল এবং রাশিয়ার কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হল। রাশিয়া ক্রিমিয়া এবং উইক্রেনও পুনর্দখল করে নিল। রাশিয়া জার্মানীর সেনাবাহিনীকে দেশ থেকে বিতাড়িত করে দিল।

হিটলার কর্তৃক রাশিয়া আক্রমণ রাশিয়ার প্রতিরোধ অভিযান

রাশিয়া ও জার্মানীর মধ্যে যখন এই দুর্ধর্ষ সংগ্রাম চলছিল, সেই সময়ে জাপান এসে জার্মানী ও ইতালীর পক্ষে যোগ দিল। ১৯৪১ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে জাপান পার্ল হারবারে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রণতরীর উপর বোমা বর্ষণ করল। যুক্তরাষ্ট্র জাপান, জার্মানী ও ইতালীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল।

জাপান কর্তৃক পার্ল হারবারে বোমাবর্ষণ

আস্তে আস্তে জার্মানী, ইতালী ও জাপান একপক্ষে, আর ইংলণ্ড, যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া আর একপক্ষে—এইভাবে শক্তিশালী দুইপক্ষের মধ্যে যুদ্ধ আরও ভীষণ আকার ধারণ করল।

জাপান একে একে হংকং, চীন, ইন্দোচীন, ইন্দোনেশিয়া, মালয়, ব্রহ্মদেশ ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ দখল করে নিল। কিছুদিনের জন্য মনে হয়েছিল এই অঞ্চল থেকে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের কর্তৃত্ব চিরতরে মুছে যাবে। কিন্তু জাপান এই অঞ্চলে বেশীদিন নিজ কর্তৃত্ব বজায় রাখতে পারে নাই।

জাপানের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া দখল

যুক্তরাষ্ট্রের **সেনাপতি ম্যাক আর্থার** এই অঞ্চলে সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত হলেন। তুমুল যুদ্ধের পরে ১৯৪৪-৪৫ খ্রীঃ তিনি একে একে জাপানকে উপরোক্ত অধিকৃত অঞ্চলগুলি থেকে বিতাড়িত করতে সক্ষম হন।

ম্যাক আর্থারের হাতে জাপানের পরাজয়

আগেই বলেছি, ইতালী আফ্রিকাতে আবিসিনিয়া দখল করে নিয়েছিল। ইংলণ্ড ও আমেরিকার চেষ্টায় আফ্রিকা থেকে ইতালীর কর্তৃত্ব বিনষ্ট হল। আবিসিনিয়া পূর্ব স্বাধীনতা ফিরে পেল। ইতালীর ত্রিপোলি ও ফ্রান্সের (এই সময়ে ফ্রান্সে হিটলার একটি তাঁবেদার সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।) টিউনিস এবং

ইতালী ও জার্মানীর বিরুদ্ধে অভিযান

আলজিরিয়া ইংলণ্ড ও আমেরিকা দখল করে নিল।

১৯৪৩ খ্রীঃ ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী ইতালীর দক্ষিণস্থিত সিসিলিও দখল করে নেয়। তারপরে তারা খাস ইতালী আক্রমণ করে।

মুসোলিনীর পতন

এই সময়ে ইতালীর ভিতরেও মুসোলিনী-বিরোধী শক্তিগুলি সবল হয়ে ওঠে। ফলে মুসোলিনী ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হলেন (১৯৪৩ খ্রীঃ)। ইতালী ইংলণ্ড ও আমেরিকার কাছে আত্মসমর্পণ করল।

এই পরাজয়ের পরেও মুসোলিনী জার্মানীর সাহায্য নিয়ে আত্মরক্ষার শেষ চেষ্টা করলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর সব চেষ্টাই ব্যর্থ হল। ১৯৪৫ খ্রীঃ ইতালীর একটি গ্রামে গ্রামবাসীদের হাতে মুসোলিনী নিহত হন।

হিটলারের পতন

এখন জার্মানীকে কি করে আক্রমণ করা যায় ইংলণ্ড, যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া তাই ভাবতে লাগল। স্থির হল, রাশিয়া পূর্ব দিক থেকে অগ্রসর হয়ে জার্মানী আক্রমণ করবে। আর পশ্চিম দিক থেকে ইংলণ্ড, যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি একযোগে আক্রমণ চালাবে জার্মানীর বিরুদ্ধে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী **সেনাপতি আইজেন-হাওয়ারের** নেতৃত্বে ইংলণ্ড ও যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনী পশ্চিম ইওরোপে অবতরণ করল। দু দিক থেকে আক্রান্ত হওয়ার ফলে জার্মানীর আত্মরক্ষার ক্ষমতা নিস্প্রভ হয়ে এল। হিটলার নিরুপায় হয়ে আত্মসমর্পণ করার আগেই আত্মহত্যা করলেন (এপ্রিল, ১৯৪৫)। জার্মানী বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করল। বার্লিনের উপর বিজয়ীদের পতাকা উড্ডীন হল।

অ্যাটম বোমা নিক্ষেপ ও জাপানের আত্মসমর্পণ

এখন বাকি রইল শুধু জাপান। ১৯৪৫ খ্রীঃ আগস্ট মাসে আমেরিকা জাপানের শহর হিরোশিমা এবং পরে নাগাসাকিতে দুটি আণবিক বোমা নিক্ষেপ করল। জাপান এই আক্রমণের মুখে বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করল।

এইভাবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটল।

যুদ্ধের পরিসমাপ্তি
(The End of the War)

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানের পরে বিজয়ী রাষ্ট্রগুলি জার্মানী দখল করল। জার্মানীকে ৪টি অঞ্চলে বিভক্ত করা হল। রাশিয়া, ব্রিটেন, আমেরিকা ও ফ্রান্স—জার্মানীর এক একটি অঞ্চল দখল করল।

জাপানে নতুন একটি সরকার গঠন করা হল। এই সরকারটি সেনাপতি ম্যাক আর্থারের আদেশ অনুসারে চলতে বাধ্য হল।

বিজয়ী রাষ্ট্রগুলির নেতৃবর্গ, যেমন, যুক্তরাষ্ট্রের রুজভেল্ট, ব্রিটেনের চার্চিল ও রাশিয়ার স্টালিন শান্তি স্থাপনের জন্য কয়েকবার মিলিত হলেন। কিন্তু বিজয়ী শক্তিগুলির মধ্যে মতবিরোধ থাকার ফলে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সমস্যার চূড়ান্ত মীমাংসা হল না। এই বিরোধের ফলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে স্থায়ী শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় নাই।

তবে এই বিরোধবহুল পরিবেশের মধ্যেও পৃথিবীতে শান্তি রক্ষার উদ্দেশ্য নিয়ে যুদ্ধোত্তর পর্বে পৃথিবীর জাতিগুলি একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়ে তুললেন। এই প্রতিষ্ঠানটির নাম হল **সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (United Nations Organisation)**।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলাফল
(Effects of the Second World War)

যুদ্ধের পরে পৃথিবীতে অভূতপূর্ব এক পরিবর্তন দেখা দিয়েছে।

রাশিয়া ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির প্রভাব বৃদ্ধি

ইওরোপে এই যুদ্ধের পরে সোভিয়েট রাশিয়া অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তি বলে পরিগণিত হয়েছে। মস্কো থেকে পূর্ব বার্লিন পর্যন্ত এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে অবস্থিত দেশগুলিতে, যেমন চেকোশ্লোভেকিয়া, যুগোশ্লোভিয়া, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, পোল্যাণ্ড, হাঙ্গেরী, আলবানিয়া ও পূর্ব জার্মানীতে মার্কসবাদী আদর্শে পরিচালিত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে। সমতার ভিত্তিতে ঐ রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সোভিয়েট রাশিয়া চুক্তি সম্পাদন করেছে। ফলে, সোভিয়েট রাশিয়ার নেতৃত্বে একদিনের দুর্বল পূর্ব ইওরোপ আজ দুর্বার গতিতে অগ্রসর হয়ে চলেছে।

ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের প্রতিপত্তি হ্রাস আমেরিকার আধিপত্য প্রতিষ্ঠা

একদিকে যেমন রাশিয়ার প্রভাব বেড়েছে, অন্যদিকে তেমনি ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের প্রভাব এই যুদ্ধে হ্রাস পেয়েছে। আমেরিকা পৃথিবীব্যাপী ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির নেতা হিসাবে নিজ আসন প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এখন রাষ্ট্রগুলি দুটি বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে। একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির দৃষ্টিভঙ্গী, অপরটি ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির দৃষ্টিভঙ্গী। এই

ইওরোপের সমস্যা

দুটি দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সমস্ত আন্তর্জাতিক সমস্যার বিচার এখন অনিবার্য হয়ে উঠেছে। উদাহরণ হিসাবে বলা চলে ইওরোপের সমস্যাগুলির সমাধান সম্পর্কে দুটি দৃষ্টিভঙ্গী রয়েছে। এশিয়ার সমস্যা সমাধান বিষয়েও দুটি দৃষ্টিভঙ্গী রয়েছে।

ইওরোপের সমস্যাগুলির মধ্যে সর্বপ্রধান ছিল জার্মানীর ঐক্য সাধনের সমস্যা। কিন্তু এই সমস্যা নিয়ে দুটি দৃষ্টিভঙ্গীতে পার্থক্য এত বেশী যে আজ পর্যন্ত জার্মানীকে ঐক্যবদ্ধ এক রাষ্ট্রে পরিণত করা সম্ভব হয় নি। আজও জার্মানীর এক অংশ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সম্পর্কিত।

যুদ্ধের পরে এশিয়া পুনর্গঠনের সমস্যা

জাপানের পরাজয়ের পরে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে পুনর্গঠনের সমস্যাটি বৃহৎ শক্তিগুলির দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

এই পুনর্গঠনের সমস্যা নিয়ে দুটি মত দেখা গেল। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড প্রভৃতি পুরানো সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি নিজ নিজ সাম্রাজ্য ফিরে পাবার জন্য আগ্রহশীল হয়ে উঠল। আমেরিকা চাইল—প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে নিজের আধিপত্য বিস্তার করতে। আমেরিকার ধারণা হল—সে এই অঞ্চলে জাপানকে বাধা দেওয়ার মূল ঝুঁকি বহন করেছে, সুতরাং এই অঞ্চলের একাধিপত্য তারই ন্যায্য পাওনা। এই উদ্দেশ্যে আমেরিকা জাপানে, চীনে, কোরিয়ায় ও ইন্দোচীনে নিজ প্রভাব বিস্তারে অগ্রসর হল। চীনে প্রভাব বিস্তারের উদ্দেশ্য নিয়ে আমেরিকা চিয়াং সরকারকে এই দেশের কমিউনিস্ট আন্দোলন দমন করার জন্য অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করতে লাগল। আমেরিকার সেনাবাহিনী জাপান দখল করল।

আমেরিকার দৃষ্টিভঙ্গী

আমেরিকার এই অধিনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার পথে প্রধান বাধার সৃষ্টি করল সোভিয়েট রাশিয়া। সোভিয়েট রাশিয়া এই সময়ে এশিয়ার দেশে দেশে যে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন চলছিল তার জয় কামনা করল। তাই সোভিয়েট রাশিয়া—চীন, ইন্দোচীন, কোরিয়া, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলি ও ফরাসী সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলি এবং হল্যাণ্ডের সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলির জন্য স্বাধীনতার দাবি উপস্থিত করল।

সোভিয়েট রাশিয়ার দৃষ্টিভঙ্গী

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ
(United Nations Organisation)

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উৎপত্তি (Origin of U. N. O.) ঃ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের জন্ম ১৯৪৫ খ্রীঃ হিটলার-মুসোলিনীর পরাজয়ের পরে। কিন্তু এই ধারণাটি ১৯৪১ খ্রীঃ থেকে ইংলণ্ড, আমেরিকা ও রাশিয়া—এই তিন প্রধানের মনকে আলোড়িত করে। ঐ বছরে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট ও ব্রিটেনের প্রধান মন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল আতলান্তিক মহাসাগরের বুকে একখানি যুদ্ধ-জাহাজে* মিলিত হন এবং একটি সনদে স্বাক্ষর দান করেন। এইটি 'আতলান্তিক সনদ' (Atlantic Charter) বলে বিখ্যাত। এই সনদে উল্লেখ করা হল : ব্রিটেন ও আমেরিকা অন্য দেশ অধিকার করবে না; সংশ্লিষ্ট জনগণের মত ছাড়া কোন সীমানাগত অদল-বদলে সম্মতি দেবে না; প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের নিজের পছন্দ-মত সরকার নির্বাচনের অধিকার তারা স্বীকার করবে; যে সব দেশকে জোর করে পরাধীন করে রাখা হয়েছে তাদের স্বাধীনতা অধিকার তারা স্বীকার করবে; দুনিয়ার জাতিগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা সুদৃঢ় করার তারা চেষ্টা করবে; পৃথিবীতে যাতে প্রত্যেকটি দেশ স্বাধীন ও নিরাপদ হয়ে বাস করতে পারে তার ব্যবস্থা করবে; এবং যাতে পৃথিবীতে সকল দেশের সকল মানুষই ভয় এবং অভাব থেকে মুক্তি পেয়ে সুখে জীবন যাপন করতে পারে তার জন্য শান্তি সুরক্ষিত করার চেষ্টা করবে।

আতলান্তিক সনদ

রুজভেল্ট ও চার্চিলের স্বাক্ষর দানের পরে দুনিয়ার ৫৫টি দেশ এই আতলান্তিক সনদের মূলনীতির প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে।

১৯৪৩ খ্রীঃ নভেম্বর মাসে মস্কো শহরে সোভিয়েট ইউনিয়ন, আমেরিকা, গ্রেট ব্রিটেন ও চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রী প্রত্যেকটি শান্তিকামী জাতিকে নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন গঠনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে একমত হন। ১৯৪৩ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে তেহ্‌রান সম্মেলনে রুজভেল্ট, চার্চিল ও স্টালিন ঐ মতের প্রতি সমর্থন জানালেন। ১৯৪৪ খ্রীঃ ওয়াশিংটনে ডামবার্টন ওকস কনফারেন্সে তিন প্রধান ও চিয়াং কাই-শেকের প্রতিনিধিরা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের জন্য একটি সনদ রচনা করলেন।

১৯৪৫ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে ৫১টি রাষ্ট্রের এক সম্মেলনে উপরোক্ত সনদ

আলোচিত এবং গৃহীত হল। লীগ অব্ নেশনস্ ভেঙে দিয়ে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ গঠনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তও এই সম্মেলনে গৃহীত হল। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদে ঘোষণা করা হল: জাতিপুঞ্জ যুদ্ধের বিপদ থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করবে, পৃথিবীতে স্থাপন করবে শান্তি ও সম্প্রীতি; প্রত্যেক জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের ভিত্তিতে জাতিতে জাতিতে মৈত্রী সুদৃঢ় করার চেষ্টা করবে; তারা পরস্পরের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপে বিরত থাকবে এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনীতিক সহযোগিতার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক শান্তি ও সমৃদ্ধি রক্ষার কাজটি সম্পন্ন করবে।

জাতিপুঞ্জের সনদ

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের একটি গঠনতন্ত্র গৃহীত হয়েছে। এই গঠনতন্ত্র অনুযায়ী জাতিপুঞ্জের তিনটি প্রধান অঙ্গ রয়েছে: যেমন, (১) সাধারণ সভা (General Assembly), (২) নিরাপত্তা পরিষদ (Security Council), এবং (৩) সম্পাদকীয় দপ্তর (Secretariat)।

জাতিপুঞ্জের গঠনতন্ত্র

সাধারণ সভা: জাতিপুঞ্জের সদস্য হবার সুযোগ যে পেয়েছে সে-ই সাধারণ সভায় নিজ প্রতিনিধি পাঠাতে পারে। নিরাপত্তা পরিষদ: ১১টি সদস্য-রাষ্ট্রের প্রতিনিধি নিয়ে এই পরিষদ গঠিত হয়। স্থির হয়—এই এগারো জনের মধ্যে আমেরিকা, ইংলণ্ড, রাশিয়া, ফ্রান্স ও চীন (তখন চিয়াং কাই-শেক শাসিত)—এই পাঁচটি দেশের স্থায়ী প্রতিনিধি থাকবে। স্থায়ী প্রতিনিধিদের মতৈক্য ব্যতীত নিরাপত্তা পরিষদ কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না। সম্পাদকীয় দপ্তর: এই দপ্তর একজন প্রধান সম্পাদকের নেতৃত্বে জাতিপুঞ্জের সিদ্ধান্তগুলি কাজে প্রয়োগ করে থাকে।

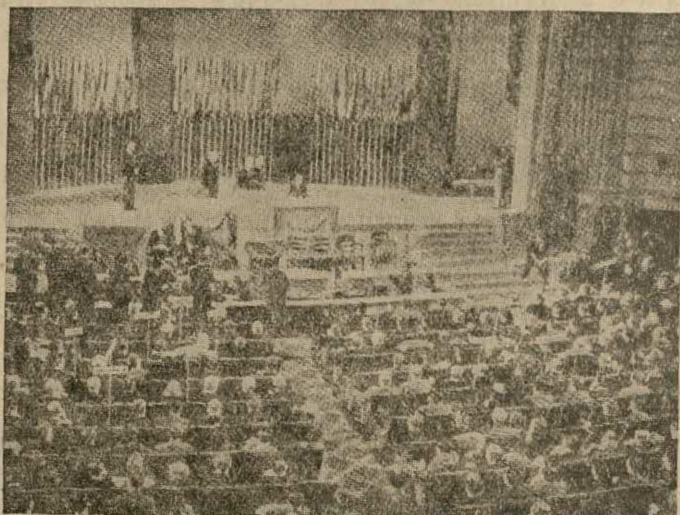
উপরোক্ত তিনটি প্রধান অঙ্গ ছাড়া জাতিপুঞ্জের সঙ্গে সংযুক্ত একটি অছি পরিষদ (Trusteeship Council), আন্তর্জাতিক বিচারালয় (International Court of Justice), অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (Economic & Social Council) এবং আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থা (ILO) রয়েছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে শিক্ষা সম্বন্ধীয় ও সংস্কৃতির অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য একটি সংগঠন রয়েছে। এইটির নাম ইউনেস্কো (UNESCO—United Nations

জাতিপুঞ্জ পরিচালিত কয়েকটি সংগঠন

Educational, Scientific and Cultural Organisation)। সেইরূপ, যে সংগঠনের সাহায্যে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে স্বাস্থ্য-বিষয়ক অভিজ্ঞতা বিনিময় হয় তার নাম **বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা** (WHO—World Health Organisation)।

বিভিন্ন রাষ্ট্রের শান্তিপূর্ণ পুনর্গঠনের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের ব্যবস্থা করে এই সংগঠনগুলি জাতিতে জাতিতে সহযোগিতার পথ প্রশস্ত করতে সাহায্য করছে।



সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অধিবেশন

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কার্যাবলী (The Work of U. N. O.): লীগ অব নেশন্‌স্ অপেক্ষা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ অনেক বেশী শক্তিশালী। তার ক্ষমতার পরিধিও অনেক বেশী ব্যাপ্ত। তবে প্রশ্ন হল: জাতিপুঞ্জ যদি দুনিয়ার বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির কুক্ষিগত হয়ে চলে, তা হলে লীগ অব নেশনসের মতই তারও ব্যর্থতা অনিবার্য কিনা।

জন্মের পর থেকে ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে জাতিপুঞ্জ যে কয়েকটি কাজে হাত দিয়েছে তাতে সে যে যথেষ্ট সফলতার পরিচয় দিয়েছে তা নয়। প্রথমত, জাতিপুঞ্জের সদস্য-রাষ্ট্রের মধ্যে মতৈক্য নাই। জাতিপুঞ্জে প্রধানত তিনটি রাষ্ট্র-গোষ্ঠী রয়েছে—(১) ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি, যাদের

নেতা আমেরিকা ; (২) সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি, যাদের নেতা সোভিয়েট রাশিয়া, এবং (৩) নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলি, যাদের নেতৃত্বে রয়েছে ভারত, ইন্দোনেশিয়া, মিশর, যুগোশ্লাভিয়া প্রভৃতি। জাতিপুঞ্জে পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির প্রাধান্য রয়েছে। এই প্রাধান্যের ফলে জাতিপুঞ্জ অনেক ন্যায্য প্রশ্নের সন্তোষজনক সমাধানে উপনীত হতে পারে নি। যেমন ১৯৪৬ খ্রীঃ ইউক্রেন যখন অভিযোগ আনল যে, ইন্দোনেশিয়ায় জাতীয় আন্দোলন দমনের কাজে ব্রিটিশ ও জাপ সৈন্য ব্যবহার করা হচ্ছে, তখন এই প্রশ্নটি ধামাচাপা দেওয়া হয়েছিল। ঐ বছরেই সিরিয়া ও লেবাননের প্রতিনিধি তাঁদের দেশে ব্রিটিশ ও ফরাসী সৈন্যের উপস্থিতির প্রতি জাতিপুঞ্জের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তখন জাতিপুঞ্জ ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সৈন্য অপসারণের ইচ্ছা আছে এইটুকু জেনেই নিজের কর্তব্য সমাধা করেছিল। ঐ বছরে ভারত অভিযোগ করে যে দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার স্থানীয় ভারতীয়দের উপর অন্যায় ব্যবহার করছে। কিন্তু জাতিপুঞ্জ এটি দক্ষিণ আফ্রিকার আভ্যন্তরীণ ব্যাপার—এই অজুহাতে এই বিষয়টির আলোচনা বন্ধ করে দেয়। পাকিস্তানের সঙ্গে কাশ্মীর নিয়ে ভারতের যে বিবাদ উপস্থিত হয়, সেটিও ন্যায় বিচারের জন্য ভারত জাতিপুঞ্জের কাছে পেশ করে এবং জাতি-পুঞ্জ এই ব্যাপারে মীমাংসা করতেও ব্যর্থ হয়েছে।

আমেরিকার অঙ্গুলি নির্দেশে অনেক ক্ষেত্রে চলায় পৃথিবীর শান্তি সুরক্ষিত করতে জাতিপুঞ্জ অনেকাংশে ব্যর্থ হয়েছে। জাতিপুঞ্জ শুধু যে এশিয়া ও আফ্রিকার জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের প্রতি বিরূপ তাই নয় ; ১৯৪৯ খ্রীঃ চীনে চিয়াং কাই-শেকের পতন ঘটেছে এবং সেখানে কমিউনিষ্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ; কিন্তু আমেরিকার পক্ষে এই সরকার মনঃপূত না হওয়ায় আজও জাতিপুঞ্জে চীনের নতুন সরকারের স্থান হয় নাই। আমেরিকার আশ্রিত ফরমোজার চিয়াং-সরকারকেই আজও জাতিপুঞ্জ স্বীকৃতি দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে।

জাপানে আমেরিকার সেনাবাহিনীর উপস্থিতি জাপানের স্বাধীনতার পরিপন্থী ত বটেই, তাছাড়া এশিয়ার শান্তিরও পরিপন্থী।

জাতিপুঞ্জের এই কয়েক বছরের ইতিহাস—অনেকটাই ব্যর্থতার ইতিহাস ; তবুও হতাশার খুব কারণ নেই।

লীগ অব নেশন্‌স্‌কে যে পথে পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলি পরিচালিত করেছিল,

সেই পথে জাতিপুঞ্জকে পরিচালিত করার পথে বিরাট বাধা রয়েছে।

মনে রাখা প্রয়োজন, ১৯৩৯ এবং ১৯৫৯ সালের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে পৃথিবীতে শান্তির শক্তিগুলি অনেক সংগঠিত। এখন যুদ্ধবাদীদের ইচ্ছা থাকলেও আর উপনিবেশবাদ বজায় রাখা সম্ভব নয়। এশিয়ার জাতিগুলি আজ আর নিদ্রিত নয়। তাছাড়া, প্রত্যেকটি দেশে শক্তিশালী গণ-আন্দোলন আজ দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে। এই অবস্থায় দুনিয়ার জনস্বার্থকে উপেক্ষা করে পৃথিবীতে একটি নতুন যুদ্ধ বাধাবার ঝুঁকি নেওয়া আজ বড় কষ্টসাধ্য ব্যাপার। যে শক্তি এই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঝুকি নেবে সে-ই এই যুদ্ধের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

তাই দুনিয়ার শান্তিকামী মানুষ, সংগঠিতভাবে নিজেদের ইচ্ছা ব্যক্ত করতে পারলে জাতিপুঞ্জকে যুদ্ধের পথ থেকে শান্তির পথে চলতে বাধ্য করতে পারে। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ আজ আর অবশ্যম্ভাবী নয়। এইটিই হল দুনিয়ার সামনে আজ সব চেয়ে বড় আশার কথা।

পঞ্চদশ অধ্যায়

প্রথম মহাযুদ্ধের পরে এশিয়া—
সেভার্সের সন্ধি

(Asia after the first World War)

[The Treaty of Sevres]

প্রথম মহাযুদ্ধের পরে জার্মান সাম্রাজ্যের মত তুরস্কের সাম্রাজ্যটিও ভেঙে দেওয়া হয়।

সেভার্সের সন্ধি

তুরস্কের সাম্রাজ্যটিকে ভাগ করে নেওয়ার উদ্দেশ্যে একটি পৃথক সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। এইটি **সেভার্সের সন্ধি** (১৯২০ খ্রীঃ) নামে পরিচিত। এই সন্ধি অনুযায়ী স্থির হয়—(১) এক কনস্তান্তিনোপল ছাড়া তুরস্ককে পূর্ব ইওরোপের সমস্ত অঞ্চল ছেড়ে দিতে হবে। (২) এশিয়া মাইনর ছাড়া এশিয়ার সমস্ত অঞ্চল থেকেও তুরস্ককে সরে আসতে হবে। (৩) তুরস্ক সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ইরাক ও প্যালেস্টাইনকে ব্রিটেনের, আর সিরিয়াকে ফ্রান্সের ম্যাণ্ডেটে পরিণত করা হবে। (৪) গ্রীস তুরস্কের সাম্রাজ্যভুক্ত স্মিরণা অঞ্চলটি দখল করার অধিকার পাবে।

সন্ধির শর্তে তুরস্কে বিক্ষোভ

সেভার্সের সন্ধির এই অপমানকর শর্তগুলি যখন তুরস্কের জনগণের মধ্যে জানাজানি হল তখন তাদের মধ্যে দারুণ উত্তেজনা দেখা গেল। ঠিক এই সময়ে আবার ব্রিটেন ও ফ্রান্সের প্ররোচনায় গ্রীস স্মিরনায় সৈন্য সমাবেশ করল ফলে ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইটালী প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে সমস্ত তুরস্কব্যাপী এক ব্যাপক জাতীয় আন্দোলন আরম্ভ হল।

কিন্তু তুরস্কের এই জাতীয় জাগরণের পথে সবচেয়ে বড় অন্তরায় হয়ে উঠলেন তুরস্কের সুলতান নিজে।

সেভার্সের সন্ধি যখন স্বাক্ষরিত হল তখন তুরস্কের সুলতান ছিলেন অকর্মণ্য **ওয়াহাদউদ্দীন**। তিনি ব্রিটেনের কথা অনুযায়ী চলতে লাগলেন। এমন কি, ব্রিটেন তুরস্কের সাম্রাজ্যটি ভাগ করে নেওয়ার যে প্রস্তাব করল তাকে বাধা দেওয়ার শক্তিও তাঁর ছিল না।

তুরস্কে জাতীয়তাবাদী বিদ্রোহ : কামাল আতাতুর্ক

[Nationalist Revolution in Turkey : Kamal Ataturk]

দেশের জনসাধারণ ক্রমশ বুঝতে পারল যে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির (ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি) বিরুদ্ধে তাদের যেমন সংগ্রাম করতে হবে, তেমনি তাদের সুলতান ও প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের শাসন থেকেও দেশকে মুক্ত করতে হবে।

তুরস্কের সুলতান ছিলেন একাধারে স্বৈরাচারী শাসক ও ধর্মীয় নেতা (খালিফ)। তুরস্কের সুলতানের কর্তৃত্বে দেশে মধ্যযুগীয় শাসন প্রচলিত ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ থেকেই তুরস্কের একদল প্রগতিশীল নেতা এই মধ্যযুগীয় শাসনব্যবস্থা পরিবর্তনের দাবি তোলেন। ১৯০৮ খ্রীঃ একদল নবীন সেনাধ্যক্ষ তুরস্কে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং দেশে পাশ্চাত্যকরণের নীতি প্রবর্তন করেন। এই বিদ্রোহ **নবীন তুর্কী আন্দোলন** বলে পরিচিত। কিন্তু জনসাধারণের সঙ্গে এই আন্দোলনের গভীর যোগাযোগ ছিল না। ফলে এই আন্দোলনটি স্থায়ী হয় নাই এবং তুরস্কে আবার মধ্যযুগীয় স্বৈরতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

নবীন তুর্কী আন্দোলন (১৯০৮)

মুস্তাফা কামাল : কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধে পরাজয়, সেভার্সের সন্ধির অপমানকর শর্ত ও স্মিরনায় গ্রীক আক্রমণ, তুরস্কের স্বাধীনতাকামী জনগণের মনে নতুন করে জাতীয় চেতনা জাগিয়ে তোলে। **মুস্তাফা কামাল** নামে এক প্রতিভাশালী ব্যক্তির নেতৃত্বে তুরস্কের এই জাতীয় জাগরণ নতুনভাবে রূপ পায়।

মুস্তাফা কামাল ১৮৮০ খ্রীঃ স্যালোনিকায় জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম থেকেই সামরিক শিক্ষার প্রতি তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। ক্রমে ক্রমে একজন দক্ষ ও প্রতিভাশালী সৈনিক হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। সামরিক জ্ঞানের পাশাপাশি তিনি রাজনীতি-জ্ঞানও আয়ত্ত করেন। তিনি ফরাসী দেশের বিপ্লবী সাহিত্যের একজন অনুরাগী পাঠক ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন পাশ্চাত্য ভাবধারার সার্থক প্রয়োগ ছাড়া তুরস্কের পুনরুজ্জীবন সম্ভব নয়।

প্রথম জীবন

১৯০৮ খ্রীঃ যখন নবীন তুর্কী আন্দোলন আরম্ভ হয় তখন কামাল তাতে অংশ গ্রহণ করেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে পশ্চিমের সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি

তুরস্কের উপর অবমাননাকর সেভার্স চুক্তি চাপিয়ে দেয়। কামাল এই চুক্তির ঘোর বিরোধী ছিলেন এবং এই চুক্তির বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান জাতীয় বিক্ষোভকে



মুস্তাফা কামাল

তিনি সঠিক পথে চালিত করতে সচেষ্ট হলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি নিজ কর্তৃত্বে একটি জাতীয়তাবাদী সেনাবাহিনী গঠন করলেন এবং এই সেনাবাহিনীর সাহায্যে দেশের স্বাধীনতা ও গৌরব অক্ষুণ্ন রাখার শপথ গ্রহণ করলেন। রাশিয়ার বলশেভিকরা কামালকে অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করায় কামাল একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী গড়ে তুলতে সক্ষম হলেন।

জাতীয়তাবাদী সেনা-বাহিনী গঠন

তার পরে কামাল গঠন করলেন নতুন জাতীয়তাবাদী দল এবং এই দল সংখ্যাধিক্যের জোরে তুরস্কের পার্লা-মেণ্ট দখল করল।

জাতীয়তাবাদী দল গঠন

বিশ্বাসঘাতক সুলতান কামালের কাজকর্ম পছন্দ করলেন না, কিন্তু এই

মুস্তাফা কামাল কর্তৃক রাষ্ট্রক্ষমতা দখল ও বিদেশী সৈন্য বিতাড়ন

জাতীয় জাগরণের মুখে কামালকে বাধা দেওয়ার সাধ্য তাঁর ছিল না। কামাল ক্ষমতা দখল ক'রে ১৯২২ খ্রীঃ আক্রমণকারী গ্রীক বাহিনীকে নিজ দেশের মাটি থেকে সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত করলেন। গ্রীক বাহিনীকে পরাজিত করার পরে তিনি **'গাজী'** (বিজয়ী) উপাধিতে ভূষিত হলেন।

প্রজাতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা

গ্রীক বাহিনীকে বিতাড়িত করার পরে কামালের প্রভাব ও প্রতিপত্তি যথেষ্ট বেড়ে গেল। তিনি হয়ে উঠলেন তুরস্কের অবিসংবাদী জাতীয় নেতা। তিনি তুরস্কে প্রজাতান্ত্রিক শাসন প্রবর্তন করলেন (১৯২৩ খ্রীঃ) এবং তিনি তার প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলেন ।

সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি (ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি) এই প্রজাতন্ত্রকে মেনে নিতে বাধ্য হল। সোভিয়েট রাশিয়া নবগঠিত প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করল।

লুসানের সন্ধি

১৯২৩ খ্রীঃ **লুসানের সন্ধি** স্বাক্ষরিত হল। তখন সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি সেভার্সের সন্ধির শর্তগুলি পরিত্যাগ করে সম্মানজনক শর্তে তুরস্কের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হল। এই সন্ধির শর্ত অনুযায়ী তুরস্ক একটি ঐক্যবদ্ধ জাতীয় সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে নব পরিচয় লাভ করল।

আভ্যন্তরীণ সংস্কার (Internal Reforms) ঃ লুসানের সন্ধির পরে কামাল তুরস্কের আভ্যন্তরীণ সংস্কারে মন দিলেন। তুরস্কের পুনরুজ্জীবনের উদ্দেশ্যে তিনি দেশে পাশ্চাত্যকরণের ঢেউ বইয়ে দিলেন।

ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র

কামাল প্রথমেই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র প্রবর্তন করলেন (১৯২৪ খ্রীঃ)। এই উদ্দেশ্যে তিনি খালিফের পদ অবলুপ্ত করে দিলেন। তুরস্কের সুলতান, যিনি ছিলেন একাধারে দেশের রাজা এবং ধর্মীয় নেতা (খালিফ), তিনি তাঁকে এবং তাঁর পরিবারকে দেশ থেকে নির্বাসিত করলেন। মুসলিম ধর্ম এখন রাষ্ট্রধর্মের মর্যাদালাভে বঞ্চিত হল। মুসলিম ধর্মমন্দিরগুলির সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হল। মুসলিমদের ফেজ টুপি পরা বন্ধ করে দেওয়া হল।

সুইজারল্যাণ্ডের আইনের ধরনে তুরস্কে নতুন আইন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হল।

আরবী হরফের বদলে ল্যাটিন বর্ণমালা প্রবর্তন করা হল। ধর্ম-নিরপেক্ষ শিক্ষাপ্রদানের জন্য সারা দেশে স্কুল-কলেজ খোলা হল। সাত থেকে ষোলো বৎসর বয়স্ক বালক-বালিকার পক্ষে স্কুলে যোগদান বাধ্যতামূলক করা হল। মেট্রিক পদ্ধতি প্রবর্তন করা হল। কামালের নিরলস চেষ্টায় শিক্ষিতের সংখ্যা শতকরা ৪২ জনে এসে দাঁড়াল।

ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা

মেয়েদেরও কামাল স্বাধীনতা দান করলেন। মেয়েদের বোরখা পরার অভ্যাস রহিত করা হল। মেয়েদের পুরুষের সঙ্গে কাজের সম্পূর্ণ সমান সুযোগ দান করা হল। তাদের বিবাহগত অধিকার-গুলি সুরক্ষিত করার জন্য আইন প্রস্তুত করা হল। স্ত্রী-শিক্ষার বন্দোবস্ত করা হল। মেয়েদের মিউনিসিপ্যালিটিতে ও পার্লামেন্টের নির্বাচনে ভোট দেবার ও নির্বাচিত হবার অধিকার দেওয়া হল। ক্রমশ মেয়েরা অধ্যাপনা করার, বিচারপতি হবার এবং পার্লামেন্টের সদস্য হবার যোগ্যতা অর্জন করলেন। বস্তুত, তুরস্কের নারীমুক্তি আন্দোলন এশিয়ার দেশগুলিতে নতুন প্রাণের সঞ্চার করেছিল।

স্ত্রী স্বাধীনতা

অর্থনীতির ক্ষেত্রেও কামাল কয়েকটি সংস্কার প্রবর্তন করলেন। তিনি নিজ দেশের বাণিজ্যের উপর বিদেশী বণিকেরা যাতে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে না পারে তার জন্য শুল্ক-ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। দেশে রেলপথ, রাস্তাঘাট প্রভৃতিও বিস্তারলাভ করল। কৃষিতেও আধুনিক যন্ত্রপাতি প্রবর্তন করা হল।

অর্থনৈতিক সংস্কার

বৈদেশিক নীতি (Foreign Policy) : বৈদেশিক ক্ষেত্রে, কামাল ছিলেন দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করে অন্য দেশের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনের পক্ষপাতী। তিনি সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রেখে চললেন। তাঁর নেতৃত্বে তুরস্ক লীগ অব নেশন্‌সে যোগ দেয়।

সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব

বর্তমান তুরস্কের এই সর্বাঙ্গীন উন্নতির মূলে ছিলেন মুস্তাফা কামাল। সেইজন্য তাঁকে তাঁর দেশবাসী **আতাতুর্ক** বা **তুরস্কের পিতা** এই আখ্যা দিয়েছিল। তিনি বারবার সর্বসম্মতিক্রমে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হন। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ৫৮ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

আরব জাতীয়তাবাদ

(Arab Nationalism)

মধ্যপ্রাচ্যে তুরস্ক ও পারস্য ছাড়া আরও কতকগুলি রাষ্ট্রে জাতীয় জাগরণ আরম্ভ হয়। এই রাষ্ট্রগুলি ছিল আরব ভাষাভাষী। এইগুলি তাই 'আরব রাষ্ট্র' বলে পরিচিত। মিশর, লিবিয়া, মরক্কো, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, ট্রান্সজর্ডন, সৌদীআরব প্রভৃতি আরব রাষ্ট্রগোষ্ঠীর অন্তর্গত।

মিশর (Egypt) ঃ আরব রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সর্বপ্রধান হল মিশর। আগেই বলেছি মিশরের উপর ব্রিটেন কর্তৃত্ব করত।

মিশরে জাতীয় আন্দোলনের প্রসার : আরবী পাশা

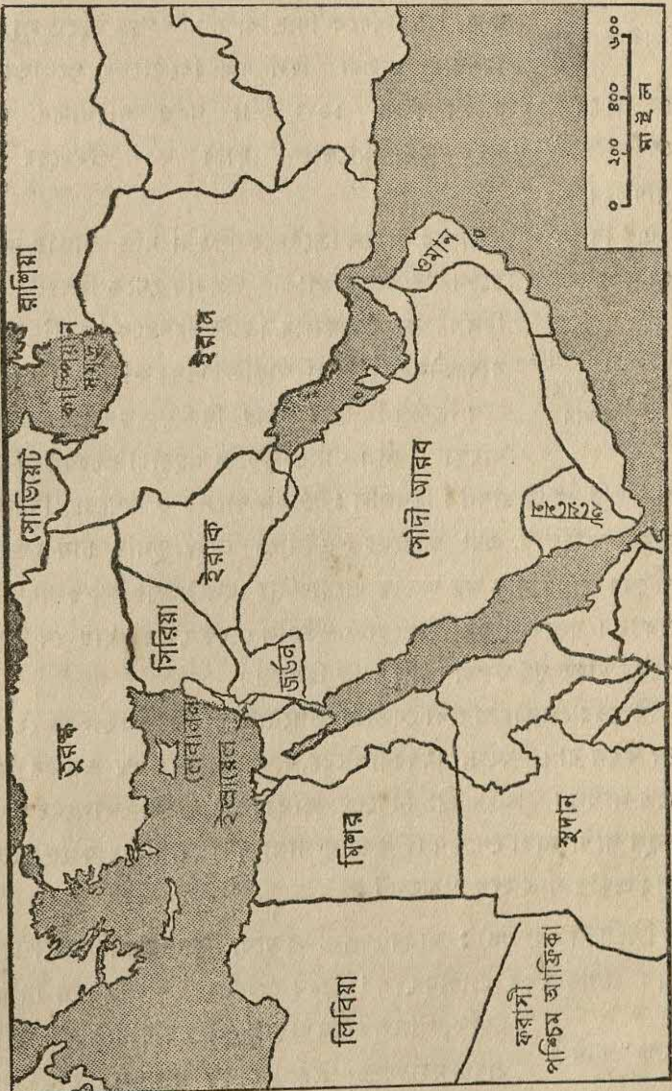
১৮৮১-৮২ খ্রীঃ মিশরে **আরবী পাশার** নেতৃত্বে প্রথম জাতীয় আন্দোলন দেখা দিয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষে মিশরে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আবির্ভাব হল। এই শ্রেণীটির নেতৃত্বে ক্রমশ মিশরে একটি আধুনিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলন আরম্ভ হল। এই আন্দোলনের প্রধান নেতা ছিলেন **জগলুল পাশা**।

জগলুল পাশা

জগলুল ছিলেন ওয়াফ্‌দ দলের প্রতিষ্ঠাতা।

১৯১৪ খ্রীঃ ব্রিটেন যুদ্ধের অজুহাতে মিশরকে সরাসরি রক্ষিত রাজ্য বলে ঘোষণা করে। যুদ্ধের মধ্যে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী মিশরে মোতায়েন রাখা হয়েছিল। কাজেই ১৯১৮ খ্রীঃ ভার্সাই সন্ধির বৈঠক যখন আরম্ভ হল তখন মিশরে এক বিশাল জাতীয় জাগরণ সুরু হল। দাবি উঠল—অবিলম্বে মিশর থেকে ব্রিটিশ সৈন্য অপসারণ করতে হবে এবং মিশরের ক্ষেত্রে জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার (the right of self-determination) মেনে নিতে হবে।

জগলুল পাশা ১৯১৮ খ্রীঃ মিশরের স্বাধীনতা দাবি করে ভার্সাই সন্ধির রচয়িতাদের কাছে একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণের সিদ্ধান্ত করলেন। এই প্রতিনিধি দলের তিনি নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন এবং এই প্রতিনিধি দল প্যারিস অভিমুখে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হল। এমন সময়ে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এই প্রতিনিধিদলকে গ্রেপ্তার করল ও মাল্টা দ্বীপে তাদের নির্বাসিত করল। জাতীয় আন্দোলনের নেতাদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে একটি বিদ্রোহের


রাশিয়া
সোভিয়েট
ইরান
ইরাক
সিরিয়া
জর্ডন
সৌদী আরব
ওমান
তুরস্ক
মিশর
সুদান
লিবিয়া
ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকা
0 200 400 600
মাইল

সূচনা হল। কায়রোতে ব্রিটিশ নাগরিকদের মিশরবাসীরা হত্যা করল। চারিদিকে বিদ্রোহী সমিতি গড়ে উঠতে লাগল। মিশরীয় ছাত্ররা ছিল এই বিদ্রোহের পুরোভাগে। ক্রমে ক্রমে ১৯১৯ খ্রীঃ থেকে ১৯২২ খ্রীঃ পর্যন্ত আন্দোলন সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ল। এই আন্দোলন দাবি করল—মিশরের পূর্ণ স্বাধীনতা।

পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী

এই বিপুল আন্দোলনের সামনে ব্রিটেনকে কিছুটা নতি স্বীকার করতে হল। ১৯২২ খ্রীঃ ব্রিটেন 'রক্ষিত রাজ্য' এই অপবাদ থেকে মিশরকে মুক্তি দিল। কাগজে কলমে ব্রিটেন মিশরকে 'একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র' বলে স্বীকৃতি দান করল। কিন্তু এই সঙ্গে ব্রিটেন মিশরের উপর নিজ কর্তৃত্ব বজায় রাখারও ব্যবস্থা করল। ব্রিটেন চুক্তি অনুযায়ী কয়েকটি বিষয়ে নিজ কর্তৃত্ব বজায় রাখল। সেগুলি: সুয়েজ খালের ও মিশরের নিরাপত্তা বিধানের অধিকার, এবং সুদানের (এইখানে প্রচুর তুলার চাষ হত, যা ব্রিটেনের কারখানার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল) উপর কর্তৃত্ব বিধানের অধিকার। বলাই বাহুল্য, উপরোক্ত শর্তগুলি থেকে বোঝা যায় যে ব্রিটেন মিশরের হাতে পূর্ণ ক্ষমতা দিতে রাজি ছিল না।

মিশরকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি দান

মিশরের জাতীয়তাবাদী নেতারা উপরোক্ত চুক্তির শর্তগুলিকে মোটেই পছন্দ করল না। ফলে, মিশরবাসীদের সঙ্গে ব্রিটেনের দ্বন্দ্ব বহুদিন ধরে চলতে লাগল। ১৯২৭ খ্রীঃ মিশরের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতা জগলুল পাশা মারা গেলেন। জগলুল পাশা মিশরবাসীদের কাছে আজও গভীর শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে রয়েছেন।

সিরিয়া (Syria): আরব দেশগুলির মধ্যে মিশরের পরেই **সিরিয়ার** স্থান। সিরিয়া খুব প্রাচীন দেশ। প্রথম মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত সিরিয়া, ইরাক, প্যালেস্টাইন প্রভৃতি তুরস্কের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে তুরস্কের সাম্রাজ্য ভেঙে যায়। তুরস্কের সাম্রাজ্যভুক্ত সিরিয়া ফ্রান্সের "ম্যাণ্ডেটে" পরিণত হয়। ইরাকের উপর ব্রিটেনের কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়।

ফ্রান্সের "ম্যাণ্ডেটে" পরিণত

ফরাসী কর্তৃপক্ষ ক্ষমতা পাওয়ার পরে ভেদনীতি অনুযায়ী সিরিয়াকে কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত করে। সিরিয়ার অধিবাসীরা ফ্রান্সের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে

প্রথম থেকেই আন্দোলন আরম্ভ করে। ১৯২৫ খ্রীঃ সিরিয়ার পার্বত্য জাতিগুলি (এদের ড্রুজ বলা হয়) বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ক্রমে ক্রমে এই বিদ্রোহ সমস্ত সিরিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে এবং এটি একটি সারা সিরিয়াব্যাপী স্বাধীনতার আন্দোলনে পরিণত হয়। ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা বর্বর দমননীতির সাহায্যে এই বিদ্রোহ দমন করে।

ড্রুজ বিদ্রোহ

ইরাক (Iraq) ঃ ইরাকেও ব্রিটেনের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমে একটি বিদ্রোহ সংগঠিত হয়। বিদ্রোহীরা পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি উপস্থিত করে। ১৯২২ খ্রীঃ এই আন্দোলন একটি পুরাদস্তুর জাতীয় বিদ্রোহের রূপ গ্রহণ করে।

জাতীয় বিদ্রোহ

এইভাবে প্রথম মহাযুদ্ধের পরে মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলিতে প্রধানত পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নেতৃত্বে এক জাতীয় জাগরণ দেখা দিয়েছিল। মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলিতে যে জাতীয় আন্দোলন আরম্ভ হল তা যে ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পেরেছিল তা নয়। তবুও সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র-গুলির সম্মিলিত শক্তির সামনে দাঁড়িয়ে এই জাতীয় আন্দোলনগুলি সৃষ্টি করল এশিয়ায় এক নব ইতিহাস।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জাতীয় জাগরণ
[The National Awakening in South East Asia]

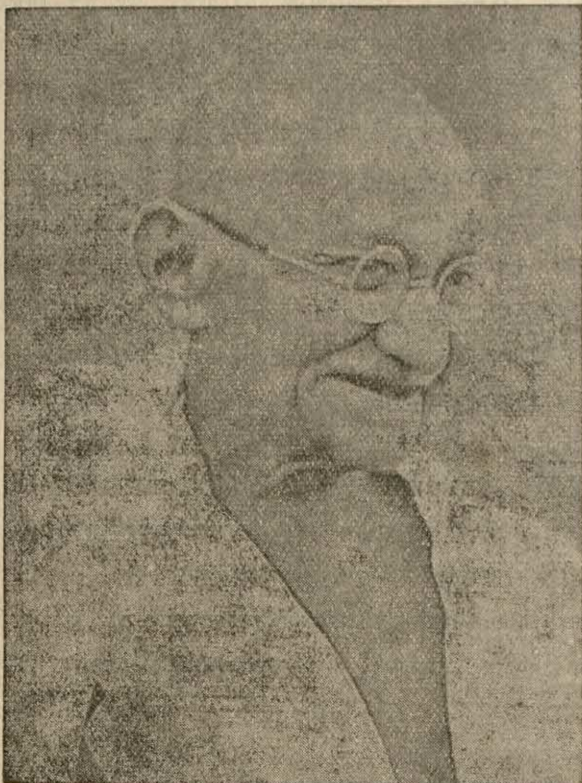
প্রথম মহাযুদ্ধ থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যে জাতীয় আন্দোলন বিশেষ প্রসার লাভ করে ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে।

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় তিনটি বড় বড় সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র নিজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল। ভারতে, মালয়ে, সিঙ্গাপুরে, ব্রহ্মদেশে, সিংহলে বিস্তৃত ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য। ইন্দোচীনে বিস্তৃত ছিল ফরাসী সাম্রাজ্য ; ইন্দোনেশিয়ায় ওলন্দাজ সাম্রাজ্য।

প্রথম মহাযুদ্ধের আগে থেকেই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে জাতীয় জাগরণ আরম্ভ হয়েছিল। ১৯০৫ খ্রীঃ ইওরোপীয় শক্তি রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে এশীয় শক্তি জাপানের জয়লাভ, ১৯০৫ খ্রীঃ রুশ দেশে জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে নির্যাতিত মানুষের বিদ্রোহ, ১৯১১ খ্রীঃ চীন দেশের জাতীয় বিপ্লব, ১৯১৭ খ্রীঃ রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লব, ১৯২১ খ্রীঃ তুরস্কে কামাল পাশার বিদ্রোহ —এইগুলি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে অভূতপূর্ব এক জাতীয় আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-গুলির পুরোভাগে ছিল ভারতবর্ষ। ১৯২০ খ্রীঃ **মহাত্মা গান্ধীর** নেতৃত্বে ভারতে যে অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হয় এবং ১৯৩০ খ্রীঃ যে আইন অমান্য আন্দোলন হয় তার প্রভাব পড়েছিল এশিয়ার দেশগুলির উপরে।

ভারতে জাতীয় আন্দোলনের বিস্তৃতি : মহাত্মা গান্ধী



মহাত্মা গান্ধী

ভারতের জাতীয় আন্দোলন প্রথম মহাযুদ্ধের পরে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নবজাগরণের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে ইংরেজের পক্ষে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নিজ কর্তৃত্ব বজায় রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশে দেশে জাতীয় অভ্যুত্থান আরম্ভ হয়। ১৯৪৭ খ্রীঃ ১৫ই

ভারত ও পাকিস্তানের স্বাধীনতা লাভ

আগষ্ট তারিখে ইংরেজ ভারত ও পাকিস্তানের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে বাধ্য হয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে পরাজয়ের পরে জাপানের সেনাবাহিনী যখন ব্রহ্মদেশ ছেড়ে যেতে বাধ্য হল তখন ব্রহ্মদেশে এক শক্তিশালী জাতীয় মুক্তি-আন্দোলন গড়ে উঠল। এই সশস্ত্র আন্দোলনে নেতৃত্ব গ্রহণ করেন ব্রহ্মদেশের যুবক নেতা **আঙ্-সান**। এই সংগ্রাম এত শক্তিশালী হয়ে ওঠে যে, শেষ পর্যন্ত ইংলণ্ডকে ভারতের মত ব্রহ্মদেশকেও একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকার করে নিতে হয়। ১৯৪৮ খ্রীঃ **ব্রহ্মদেশ** ব্রিটিশ কমনওয়েলথ ত্যাগ করে এবং এখানে একটি স্বাধীন প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়।

আঙ্-সান কর্তৃক ব্রহ্মদেশে সশস্ত্র বিদ্রোহ

সিংহলেও যুদ্ধের মধ্যে এবং যুদ্ধের পরবর্তী যুগে স্বাধীনতা আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং ব্রিটেন এই দেশটিকে ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে একটি ডোমিনিয়ন হিসাবে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়।

সিংহল

মালয় ব্রিটেনের আর একটি উপনিবেশ। এখানেও এই সময় সশস্ত্র জাতীয় মুক্তি-সংগ্রাম আরম্ভ হয়। ১৯৪৮ খ্রীঃ মালয়ে একটি ফেডারেশন গঠন করা হয় এবং অদূর ভবিষ্যতে মালয়কে স্বাধীনতা দেবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।

মালয়

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির মত ফরাসী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলিতেও সশস্ত্র জাতীয় বিপ্লব আরম্ভ হয়। ইন্দোচীনে **হো চি মিনের** নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী আন্দোলন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগেই আরম্ভ হয়েছিল। জাপান **ইন্দোচীন** থেকে বিতাড়িত হওয়ার পরে এই

ইন্দোচীনে সশস্ত্র জাতীয় বিদ্রোহ হো চি মিন্



হো-চি মিন

আন্দোলন সশস্ত্র বিপ্লবের রূপ পরিগ্রহ করে। হো চি মিনের নেতৃত্বে এই অঞ্চলে ফরাসী প্রভাব লোপ পায় এবং একটি স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠার আয়োজন হয়। কিন্তু ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ আবার ইন্দোচীনে সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে ফিরে আসে। ফলে ইন্দোচীনের উত্তর অংশে যদিও হো চি মিন এক স্বাধীন সরকার স্থাপনে সক্ষম হন, কিন্তু দক্ষিণ অংশে ফরাসীরা আরও কিছুদিনে জন্য নিজ প্রভাব বজায় রাখতে সক্ষম হয়।

ফরাসী সাম্রাজ্যভুক্ত **কম্বোডিয়া** ও **লাওস**—এই দুটি দেশও স্বাধীনতা পাবার প্রতিশ্রুতি আদায় করে।

ইন্দোনেশিয়ায় জাতীয় আন্দোলনের শক্তিবৃদ্ধি

যুদ্ধের সময়ে জাপানের দখলদার সৈন্য অপসারিত হলে ইন্দোনেশিয়াতে একটি সশস্ত্র আন্দোলন আরম্ভ হয়। **ইন্দোনেশিয়া** ছিল হল্যাণ্ডের উপনিবেশ। হল্যাণ্ড অনেক টালবাহনা করে শেষ পর্যন্ত ইন্দোনেশিয়ার আন্দোলনের কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়। এই আন্দোলনের প্রধান নেতা ছিলেন **সোয়েকার্নো**। ১৯৪৯ খ্রীঃ ইন্দোনেশিয়াও একটি সার্বভৌম স্বাধীন প্রজাতন্ত্র হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে।

সোয়েকার্নো



সোয়েকার্নো

এশিয়ার জাগরণঃ তার তাৎপর্য

বস্তুত, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে এশিয়ার মানচিত্রে গুরুতর পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। এককালে যে অঞ্চলে ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য, ফরাসী সাম্রাজ্য, ওলন্দাজ সাম্রাজ্য, সেই অঞ্চলে গড়ে উঠেছে কতকগুলি স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র।

চীন বিপ্লব

Chinese Revolution

প্রথম মহাযুদ্ধের পরে চীনে গণতান্ত্রিক বিপ্লব প্রচণ্ড শক্তিতে আত্মপ্রকাশ করে।

ভার্সাই সন্ধি ও চীন

প্রথম মহাযুদ্ধে চীন—ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি পশ্চিম ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলির পক্ষে যোগ দেয়। ভার্সাই সন্ধিতে চীনের প্রতিনিধি উপস্থিত হয়ে চীনের আত্মনিয়ন্ত্রনের অধিকার দাবি করেছিল। কিন্তু ভার্সাই সন্ধির রচয়িতারা জাপানের সঙ্গে আগে থেকেই গোপন চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল। তাই তারা চীনের সমস্ত ন্যায়সঙ্গত দাবি অগ্রাহ্য করে জাপানের সাম্রাজ্যবাদী দাবিগুলিকেই সমর্থন জানিয়েছিল।



এশিয়া ও আফ্রিকায় স্বাধীন রাষ্ট্রের অভ্যুদয়

চীনে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বিপ্লব

কাজেই ভার্সাই সন্ধি চীনের জীবনে এনেছিল শুধুই অপমান আর নৈরাশ্য। তাই ভার্সাই সন্ধির পরে চীনের জনসাধারণের মনে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি সম্পর্কে তীব্র ঘৃণা সঞ্চারিত হয়। কি জাপানী সাম্রাজ্যবাদ, কি পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদ

—সকলের সম্পর্কেই চীনবাসীর মনে বিক্ষোভ জমে ওঠে। ফলে, চীনের জাতীয় জাগরণ পুরোপুরি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সশস্ত্র বিপ্লবের রূপ গ্রহণ করে।

প্রথম মহাযুদ্ধের পরে **ডক্টর সান ইয়াৎ-সেনের** নেতৃত্বে এই বিপ্লব পরিচালিত হতে থাকে।

কিন্তু ডক্টর সান ইয়াৎ-সেন আরব্ধ কাজ সমাপন করতে পারলেন না।

সান ইয়াৎ-সেনের মৃত্যু (১৯২৫)

১৯২৫ খ্রীঃ মার্চ মাসে তিনি মারা গেলেন। ডক্টর সান ইয়াৎ-সেনের মৃত্যুর পরে তাঁর প্রতিষ্ঠিত কুওমিনটাং দলের উপর এই কাজ সম্পন্ন করার দায়িত্ব এসে পড়ল।

কুওমিনটাং আন্দোলনের প্রধান নেতা হয়ে উঠলেন সান ইয়াৎ-সেনের অন্যতম শিষ্য **চিয়াং-কাইশেক**।

চিয়াং কাইশেক

১৯২৮ খ্রীঃ চিয়াং কাই-শেক চীনে ক্ষমতা দখল করলেন। কিন্তু চিয়াং কাই শেক দেশে শান্তি আনতে পারলেন না। তাঁর আমলে দেশে দুর্নীতির রাজত্ব শুরু হল। মুদ্রাস্ফীতি ভয়ঙ্কর রূপ গ্রহণ করল। কৃষক, শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী এমন কি স্বাধীনতাকামী ব্যবসায়ীরা পর্যন্ত চিয়াং-সরকারের পতন কামনা করল।

জনসাধারণের এই ব্যাপক বিক্ষোভের সুযোগ নেবার জন্য চীনের কমিউনিস্ট পার্টি অগ্রসর হল। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সমস্ত চীনব্যাপী এক জাতীয় বিপ্লবের সূচনা হল। শহরে শহরে আরম্ভ হল বড় বড় শ্রমিক ধর্মঘট ও শোভাযাত্রা। গ্রামে গ্রামে কৃষক-বিপ্লব আরম্ভ হল। চিয়াং-বাহিনী আমেরিকা প্রদত্ত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাল।

কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে আন্দোলন



মাও সে-তুঙ

কমিউনিস্ট বিপ্লব দমনে চিয়াং-কাইশেক ব্যর্থ হলেন। কমিউনিস্ট বাহিনী গ্রামাঞ্চলে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার পরে একটির পর একটি শহর দখল করে নিল। ১৯৪৯ খ্রীঃ জানুয়ারী মাসে

রাজধানী পিকিং অধিকার (১৯৪৯)

পিকিং কমিউনিস্ট বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করল। এইভাবে দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে চীনে নূতন গণতান্ত্রিক বিপ্লব সাফল্যলাভ করল।

চীনে জন-গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা

১৯৪৯ খ্রীঃ ১লা অক্টোবর তারিখে মাও সে-তুঙের নেতৃত্বে চীনে জন-গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল।

বিশ্ব ইতিহাস (১৭৪০-১৯৪৯)

তারিখসহ প্রধান প্রধান ঘটনাবলী

ভূমিকা	তারিখ	ঘটনা
	১৪৮৬	বার্থলোমিউ দিয়াজ কর্তৃক উত্তমাশা অন্তরীপ আবিষ্কার
	১৪৯২	ক্রিস্টোফার কলম্বস কর্তৃক আমেরিকা আবিষ্কার
	১৫১৯—২১	ম্যাগেলন কর্তৃক ভূ-প্রদক্ষিণ
	১৭৫৬—৬৩	সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ
	১৭৬৩	প্যারিসের সন্ধি
প্রথম অধ্যায়	১৭৬০—১৮২০	ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় জর্জ
	১৭১৫—১৭৭৪	ফ্রান্সের রাজা পঞ্চদশ লুই
	১৭৪০—১৭৮৬	প্রাশিয়ার রাজা ফ্রেডারিক দি গ্রেট
দ্বিতীয় অধ্যায়	১৭৭৫—১৭৮৩	আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ
	১৭৭৬	আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা
	১৭৮৯	ফরাসী বিপ্লব
	১৭৮৯ (মে)	এস্টেটস্ জেনারেলের সভা আহ্বান
	১৭৮৯ (১৭ জুন)	জাতীয় সভা গঠন
	১৭৮৯ (২০ জুন)	টেনিস কোর্টের শপথ গ্রহণ
	১৭৮৯ (১৪ জুলাই)	বাস্তিলের পতন
	১৭৮৯ (অক্টোবর)	মহিলাদের অভিযান
	১৭৯৩	ষোড়শ লুইর প্রাণদণ্ড
	১৭৯৫—৯৯	ডাইরেক্টরী শাসন
	১৭৯৯—১৮০৪	কনসালের শাসন
	১৮০৬	বার্লিন ডিক্রী
	১৮০৭	মিলান ডিক্রী

তৃতীয় অধ্যায়	১৭৩৮	জন কে কর্তৃক বৈজ্ঞানিক মাকু আবিষ্কার
	১৭৪৫	জেমস্ ওয়াট কর্তৃক বাষ্পচালিত ইঞ্জিন নির্মাণ
	১৭৬৪	হারগ্রীভস্ কর্তৃক স্পিনিং জেনি আবিষ্কার
চতুর্থ অধ্যায়	১৮১৪—১৫	ভিয়েনা কংগ্রেস-সম্মেলন
	১৮২৪—৩০	ফ্রান্সের রাজা দশম চার্লসের রাজত্বকাল
	১৮৩০ (জুলাই)	জুলাই বিপ্লব
	১৮৪৮ (ফেব্রুয়ারী)	ফেব্রুয়ারী বিপ্লব
	১৮৪৮ (১৩ই মার্চ)	মেটারনিকের পতন
	১৮৪৮—৭০	ফ্রান্সে তৃতীয় নেপোলিয়ন
পঞ্চম অধ্যায়	১৮৪৮	ফ্রাঙ্কফার্ট পার্লামেণ্ট
	১৮৬৪	বিসমার্কের সহিত ডেনমার্কের যুদ্ধ
	১৮৬৬	বিসমার্কের সহিত অষ্ট্রিয়ার যুদ্ধ
	১৮৭০	বিসমার্কের সহিত ফ্রান্সের যুদ্ধ
ষষ্ঠ অধ্যায়	১৭৬৩—১৯১৪	পূর্বাঞ্চলের সমস্যা
	১৭৭৪	কাচুক কাইনারজির সন্ধি
	১৮৫৪—৫৬	ক্রিমিয়ার যুদ্ধ
	১৮৫৬	প্যারিসের সন্ধি
	১৮৭৮	বার্লিন বৈঠক
	১৯১২	প্রথম বলকান যুদ্ধ
	১৯১৩	দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধ
	১৯১৯	বুখারেষ্টের সন্ধি
সপ্তম অধ্যায়	১৮৭০—৯০	জার্মানীর উত্থান
	১৮৭১—১৮৯০	জার্মানীতে বিসমার্কের প্রাধান্য
	১৮৮৮—১৯১৮	জার্মানীতে কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়মের প্রাধান্য
	১৮৭৮	বার্লিন কংগ্রেস

অষ্টম অধ্যায়	১৮৬৯	সুয়েজখাল খনন
	১৮৮২	মিশরে আরাবি পাশার বিদ্রোহ
	১৯০০	সুদানে মাহদি বিদ্রোহ
	১৮৮৯—১৯০২	বুয়ার যুদ্ধ
	১৮৪০	প্রথম অহিফেন যুদ্ধ
	১৮৪২	নানকিং-এর সন্ধি
	১৮৫৭—৫৮	দ্বিতীয় অহিফেন যুদ্ধ
	১৮৫৮	তিয়েনসিনের সন্ধি
	১৮৫০—৬৪	তাইপিং বিদ্রোহ
	১৮৯৪—৯৫	চীন-জাপান যুদ্ধ
	১৮৯৫	সিমনোসেকির সন্ধি
	১৮৯৯—১৯০১	বক্সার বিদ্রোহ
	১৯০৪—১৯০৫	রুশ-জাপান যুদ্ধ
	১৯১২	চীনে প্রথম প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা
	১৯০২	জাপানের সঙ্গে ইংলণ্ডের সন্ধি
	১৯০৫	পোর্টস্ মাউথের সন্ধি
নবম অধ্যায়	১৭৮৯—৯৭	জর্জ ওয়াশিংটন (রাষ্ট্রপতি)
	১৭৯৭—১৮০১	জন এ্যাডমস্ (রাষ্ট্রপতি)
	১৮০১—১৮০৯	টমাস্ জেফারসন্ (রাষ্ট্রপতি)
"	১৮২৯—৩৭	এ্যাণ্ড্রু জ্যাকসন (রাষ্ট্রপতি)
"	১৮৬১—৬৫	আমেরিকার গৃহযুদ্ধ
"	১৮৬১	এব্রাহাম লিংকনের রাষ্ট্রপতিপদে নির্বাচন
"	১৮২৩	মনরো নীতি ঘোষণা
"	১৯২১	ওয়াশিংটন সম্মেলন
দশম অধ্যায়	১৯১৪—১৮	প্রথম মহাযুদ্ধ
"	১৯১৭	বলশেভিক বিদ্রোহ ও লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা

"	১৯১৮ (৯ই নভেম্বর)	কাইজার কর্তৃক জার্মানীর সিংহাসন ত্যাগ
"	১৯১৯—২০	প্যারিসের শান্তিচুক্তি
একাদশ অধ্যায়	১৯২০	লীগ অব নেশনস্
দ্বাদশ অধ্যায়	১৯১৭	রুশ বিপ্লব
	১৮১৮—৮৩	কার্ল মার্কস
ত্রয়োদশ অধ্যায়	১৯২২	মুসোলিনীর ক্ষমতালাভ
"	১৯৩৩	হিটলারের অভ্যুদয়
"	১৯৩৬—৩৯	স্পেনের গৃহযুদ্ধ
চতুর্দশ অধ্যায়	১৯৩৯—১৯৪৫	দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ
"	১৯৩৮	জার্মানী কর্তৃক অষ্ট্রিয়া দখল
"	১৯৩৮	মিউনিক চুক্তি
"	১৯৪০	জার্মানীর নিকট ফ্রান্সের আত্ম সমর্পণ
"	১৯৪০	জার্মানীর সঙ্গে ইতালীর যোগদান
"	১৯৪১	অতলান্তিক সনদ
"	১৯৪১	হিটলার কর্তৃক রাশিয়া আক্রমণ
"	১৯৪১	জাপান কর্তৃক পার্ল হারবারে বোমা বর্ষণ
"	১৯৪৩	ইঙ্গ-মার্কিন কর্তৃক সিসিলি দখল
"	১৯৪৩	মুসোলিনীর পতন
"	১৯৪৫ (এপ্রিল)	হিটলারের আত্মহত্যা
"	১৯৪৫	জাপানের আত্মসমর্পণ
"	১৯৪৫	সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উৎপত্তি
পঞ্চদশ অধ্যায়	১৯০৮	তুরস্কে নবীন তুর্কী আন্দোলন
"	১৯২১	কামাল পাশার বিদ্রোহ
"	১৯২০	সেভার্সের সন্ধি
"	১৯২৩	লুসানের সন্ধি

„	১৯৩৩	কামাল আতাতুর্ক কর্তৃক তুরস্কে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা
„	১৯৪৭	ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ
„	১৯৪৮	ব্রহ্মদেশ ও সিংহলের স্বাধীনতা লাভ
„	১৯৪৯	ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা লাভ
„	১৯৪৯	মাও সে-তুঙের নেতৃত্বে চীনে জন-গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা

প্রশ্নাবলী

ভূমিকা

1. What do you know of Italian Renaissance ? What is its significance ?

2. Give an account of the Reformation Movement. Wherein lies its importance ?

3. What do you know of Geographical Discoveries ? What were their effects ?

4. Give a brief account of the colonial expansion of the countries of Europe upto the middle of the eighteenth century.

প্রথম অধ্যায়

1. State the political conditions in Europe from 1740-1763.

2. What is meant by the age of enlightenment ?

দ্বিতীয় অধ্যায়

1. What do you know of the political ideas of Voltaire and Rousseau ? How far did they influence the French Revolution ?

2. Write a note on Stamp Act. Explain the causes of success of the Americans in their struggle for independence. [1962 H. S.]

3. Analyse the causes of the American Revolution. What were the factors responsible for its success ? [1964 H. S.]

4. What is the significance of the American Revolution ?

5. What were the political, social and economic conditions of France in the 18th century ?

6. What led to the fall of the Bastille ? What is its importance ?

7. What do you know of Robespierre and "the Reign of Terror" ?

8. Analyse the causes of the French Revolution of 1789. [1963, 1965 H. S.]

9. What led to the rise of Napoleon ?

10. Trace briefly the career of Napoleon. To what extent did he carry out the principles of the French Revolution ?

[1961 H. S.]

11. Trace the career of Napoleon from the establishment of the consulate to the beginning of the Peuinsular War.

[1964 H. S.]

12. What led to Napoleon's downfall ? [1962, 1965 H. S.]

13. What part did England play in the defeat of Napoleon ?

14. Write briefly the principal reforms of Napoleon. Is it correct to describe Napoleon as "A child of the Revolution" ?

15. What social changes were brought about by the French Revolution and Napoleon ?

16. Wherein lies the significance of the ideas of the French Revolution and of Napolean ?

তৃতীয় অধ্যায়

1. What do you mean by "Industrial Revolution" ? Give an account of the Industrial Revolution in England.

2. Why did the Industrial Revolution first start in England ? What changes came to England in the wake of this revolution ?

3. How did the Industrial Revolution bring new life to Europe ? What was the impact of the Industrial Revolution on the world with special reference to India ?

4. Discuss the economic, social and political effects of the Industrial Revolution in England. [1963 H. S.]

চতুর্থ অধ্যায়

1. What were the main achievements of the Vienna Congress ? How far did it succeed in stamping out revolutionary ideas from Europe ?

2. Explain causes of the French Revolution of 1830. What were its effects ?

3. Discuss the causes and effects of the revolutionary movements of 1848 in Europe. Why did they fail ?

4. What is meant by Metternich system ? Describe the part played by Metternich between 1815—1850.

5. Describe Metternich's policy in Europe after 1850 and account for its failure.

6. Sketch the career and achievements of Napoleon III.

পঞ্চম অধ্যায়

1. Give an account of the National Unification Movement in Italy with special reference to the part played by Napoleon III.

2. Estimate the contributions of Mazzini, Cavour, Garibaldi and Victor Emmanuel II to the unification of Italy. [1962, 1964. H. S.]

8. Give a brief account of the unification of Germany. [1963, 1965 H. S.]

4. Compare Cavour and Bismarck as makers of Italy and Germany.

5. What part did Bismarck play in the unification of Germany ? [1961. Comp. H. S.]

ষষ্ঠ অধ্যায়

1. What do you mean by "Eastern Question" ?

2. What do you know of the Greek War of Independence ?

3. Describe the causes and effects of the Crimean War.

4. What are the terms of the Treaty of Berlin ? How far did they help to solve the Eastern Question ?

5. What do you know of the first and second Balkan Wars ? What were their effects ?

6. Write an essay on the Eastern Question.

7. Write notes on :—

(I) Treaty of Katchuk—Kainardji.

(II) Treaty of San Stefano.

(III) Young Turk Movement.

সপ্তম অধ্যায়

1. What do you know of the domestic and foreign policy of Bismarck ? Why is he called one of the greatest statesmen of the 19th century ?

2. Trace the evolution of the two armed camps in Europe.

3. What is the significance of the Triple Alliance and the Triple Entente ?

4. What do you know of the international situation on the eve of the First World War ?

5. Write notes on :—

(I) Moroccan Crisis.

(II) Balkan Wars.

অষ্টম অধ্যায়

1. Trace the story of the Partition of Africa.

2. Trace briefly the story of European penetration into China.

3. Relate the story of the Westernisation of Japan.

4. Examine the causes and effects of the Russo-Japanese War (1905). [1964 H. S.]

5. Give a brief account of the progress of Japan in the latter half ef the 19th century. [1961. H. S.]

6. Trace the history of Sino—Japanese relations from 1894—1922. [1965, H. S.]

7. Trace the rise of Japan as a great Power.

8. What do you know of the Nationalist Revolution in China in 1911 ?

নবম অধ্যায়

1. (a) What were the causes of the Amerfcan Civil War ? [1965 H. S.] (b) What part did Abraham Lincoln play in it ?

2. What do you mean by "Monroe Doctrine" ? Wherein lies its significance ?

3. Glve an account of the foreign policy of U.S.A. from the period of the Civil War to the First World War.

দশম অধ্যায়

1. What were the causes of the First World War ?

2. Mention the terms of the treaty of Versailles, 1919 and point out its defects. [1962. H. S.]

3. How was Germany affected by the treaty of versailles ? Do you justify the treatment meted out to her ?

একাদশ অধ্যায়

1. Write a short essay on the League of Nations. Why did it fail to act as an effective organisation ? [1964, 1962. H. S.]

দ্বাদশ অধ্যায়

1. What were the causes of Revolution in Russia in 1917 ? [1961 H. S.]. Write a short account of it. What were the causes of its success ?

2. What part did Lenin play in the Russian Revolution ? What was Lenin's policy regarding the socialist reconstruction to Russia ?

3. Describe the progress made by U. S. S. R under Lenin and Stalin.

4. What do you know of Karl Marx ? What were his teachings ?

ত্রয়োদশ অধ্যায়

1. What led to the rise of Hitler in Germany ? Give an account of the Nazi Dictatorship in Germany under Hitler. [1965 H. S.]

2. Trace the rise of Mussolini in Italy. Enumerate the reforms introduced by him.

3. What were the causes of the Civil War in Spain ? What is its significance ?

চতুর্দশ অধ্যায়

1. What were the causes of the Second World War, 1939—1945 ?

2. Describe the story of the origin of the United Nations ? What are its objects ?

পঞ্চদশ অধ্যায়

1. Trace the story of Kamal Ataturk and the national revolution in Turkey.

2. What is Arab nationalism ? Give a brief account of the national movement in Arab countries.

3. What do you know of the national awakening in South East Asia ? What was the impact of the Indian national movement on South East Asia ?

4. Give an account of the history of China from 1919—1949.

Syllabus for Higher Secondary Examination, 1966

Paper II—100 marks

World History

(1740-1949)

Introduction—(a) The Renaissance and the Reformation—Geographical Discoveries.

(b) Colonial Empires ; Portuguese, Spanish, Dutch, English and French—Rivalries.

Chapter I—(a) Political Conditions in Europe (1740-63)

(b) The Age of Enlightenment.

Chapter II—*Age of Revolution :*

(a) American War of Independence : (b) The French Revolution ; Napoleon.

Chapter III—*Industrial Revolution* :

Industrial Revolution in England and Europe—Results.

Chapter IV—*Reconstruction of Europe 1815-1848.*

Congress in Vienna—Metternich—Two French Revolutions 1830 and 1848—Louis Napoleon Bonaparte.

Chapter V—*National Unification Movement* :

Italy and Germany—part played by Napoleon III.

Chapter VI—The Eastern Question 1763—1914.

Chapter VII—*Europe 1878—1914* :

Bismarck—The Duel and Triple Alliances—Anglo-German and Franco German rivalries—The two Armed Camps—Triple Entente—Morocco Crisis—The Balkan Wars—Outbreak of World War I.

Chapter VIII—*Expansion of Europe :*

(a) Africa—European Colonisation—Partition of Africa.

(b) China and Japan—Western penetration into China and Japan from the middle of the nineteenth century to the First World War.

Chapter IX—*America* :

From independence to the Civil War—The Civil War—Monroe Doctrine, its application (reference to be made to South America)—Events leading upto the Washington Conference, 1921.

Chapter X—*The First World War and after* :

Causes and Course of the War (without details of military history)—Peace Settlement—The Treaties—The Succession States.

Chapter XI—*League of Nations :*

Chapter XII—*The Russian Revolution* :

Karl Marx and Lenin—Causes of Russian Revolution—Russia from 1917 to 1937—internal organisation and external policy—import on the World.

Chapter XIII—Europe from 1919 to 1939

Emphasis on Germany, Italy and Western Europe

Chapter XIV—*The Second World War :*

(a) Causes and broad outline without military details.

(b) United Nations Organisation.

Chapter XV—Nationalism in Turkey, the Arab States, India and South East Asia—China from 1919 to 1949.

KABIRAJ—A WORLD HISTORY (Bengali)

1965 Rs. 4·75